

ব্যক্তিক-সত্তা নির্মাণ ও দার্শনিক তত্ত্ব : মূলস্রোত থেকে নারীবাদ

মনোজ নস্কর

নিবন্ধন ক্রম : AOOPH1200315

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Certified that the Thesis Entitled

ব্যক্তিক-সম্ভা নির্মাণ ও দাৰ্শনিক তত্ত্ব: মূলস্রোত থেকে নারীবাদ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon by own work carried out under the supervision of Professor Atashee Chatterjee Sinha and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Signature of the

Atashee Chatterjee Sinha

Manoj Naskar

Supervisor

Candidate

(ATASHEE CHATTERJEE SINHA)

(MANOJ NASKAR)

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Date: 28/02/2023

মুখবন্ধ

বহু পথ পার করেও আজও পর্যন্ত নারীবাদী চিন্তাধারা পূর্ণাঙ্গ দর্শনশাস্ত্রের রূপ পায়নি। লিঙ্গ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে নারীবাদীরা দর্শনের নানা শাখা-প্রশাখায় বিচিত্র তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনার উদ্ভাবন করলেও, সেগুলির সমন্বয়ে কোনো সুগঠিত দার্শনিক তন্ত্র নির্মাণের প্রয়াস আজও দেখতে পাওয়া যায় না। এহেন নারীবাদী চিন্তাধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যেকোনো তত্ত্বের অনুষণে তাঁরা ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, সত্তার স্বরূপ ও তত্ত্বের প্রকৃতি পরস্পর অনুসৃত। মূলস্রোতের আধুনিক ধ্রুপদী দর্শনচর্চায় সত্তার স্বরূপ সম্পর্কিত নানা আধিবিদ্যক মতের সন্ধান পাওয়া গেলেও, সত্তার গঠনগত স্বরূপ বিষয়ক কোনো অনুসন্ধান সেখানে দেখতে পাওয়া যায় না। এই গবেষণার উদ্দেশ্য নারীবাদী চিন্তাধারা সাপেক্ষে ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাব্য দার্শনিক তন্ত্র কীভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে তার আখ্যান রচনা করা; কোনো বিকল্প তাত্ত্বিক অবস্থান নির্মাণ এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়।

এই গবেষণামূলক সন্দর্ভ রচনার কাজ যাঁদের সাহচর্য ও অনুপ্রেরণা ছাড়া অসমাপ্ত থেকে যেত, সেই সকল মানুষজনকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। জীবনে চলার পথে যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সান্নিধ্যে আমার চিন্তা-ভাবনার ক্রমবিকাশ ঘটেছে তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

শিক্ষকতায় যোগদানের পর কিছুটা দায়-দায়িত্বের চাপ, এবং প্রয়োজনীয় সময়ের অভাবে গবেষণার কাজে সাময়িক প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই ব্যাপারে সহকর্মীদের সংবেদনশীল মনোভাব আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। পারিবারিক যাবতীয় সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার গবেষণার কাজের গতিকে অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আমার বাবা, মা, বোন এবং অন্যান্য পারিবারিক সদস্যরা ছিলেন বদ্ধপরিকর। পারিবারিক গণ্ডির বাইরেও যাঁরা আমার একান্ত আপন, যাঁদের শুভকামনা কাজের প্রতি আমার নিষ্ঠা বাড়িয়ে দিয়েছে, সেই সকল আত্মজনের জন্য রইল আন্তরিক ভালোবাসা।

এক সময় মনে হয়েছিল এই কাজ সমাপ্ত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধানে সেই অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠেছে, তিনি হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ অতসী চ্যাটার্জী সিনহা। তাঁর সাহচর্য ও অবিরাম উৎসাহে আমার মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ আর তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না, তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

সবশেষে যাঁর কথা না বলা হলে এই কাজ শেষ হয়েও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যাঁর হাত ধরে বর্তমান গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, তিনি হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ শেফালী মৈত্র। কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে অসম্মান করা আমার বোধেরও অতীত। তাই অঙ্গীকার করে শুধু এটুকুই বলতে পারি -

“আমি যেতে চাই তব পথপানে,...

তোমার অমৃতপথে, যে পথে তোমার আলো জ্বলে সেই অভয়পথে।”

কলকাতা

মনোজ নস্কর

২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা	১-১২
প্রথম অধ্যায়	
কান্ট-এর দর্শন ও বিচারবাদী দার্শনিক তন্ত্র	১৩-৮৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
হিউম-এর দর্শন ও অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক তন্ত্র	৮৯-১২৭
তৃতীয় অধ্যায়	
উদারপন্থী নারীবাদ ও নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র	১২৮-১৭৪
চতুর্থ অধ্যায়	
চরমপন্থী নারীবাদ ও নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র	১৭৫-২১৮
পঞ্চম অধ্যায়	
ব্যক্তিক-সত্তা নির্মাণ-এর আখ্যান ও দার্শনিক তন্ত্র	২১৯-২৩৫
গ্রন্থপঞ্জী	২৩৬-২৪২

ভূমিকা

দর্শনশাস্ত্র হলো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সমন্বয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিজ্ঞান। চিরাচরিত দর্শনচর্চার যে ধারা, সেখানে লক্ষ করা যায় যে, তত্ত্বের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তা সর্বদাই নির্মিত হয়ে এসেছে ব্যক্তিক-সত্তার বিষয়নিষ্ঠ স্বরূপের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে সত্তার বিষয়নিষ্ঠ স্বরূপ কখনোই আলোচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়নি। কারণ মনে করা হয় তত্ত্ব মাত্রই সার্বিক এবং সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং তত্ত্বের প্রেক্ষিতে কোনো বিষয়নিষ্ঠ স্বরূপ বা অনুষঙ্গ আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই সঙ্গতি কেবল যে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বগত তাই নয়, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত সমগ্র দর্শন শাস্ত্রেও সঙ্গতিপূর্ণ সার্বিক দার্শনিক তন্ত্র (philosophical system) লক্ষ করা যায়।

কালক্রমে দর্শন চর্চার জগতে মূলস্রোতের চিরাচরিত ধারাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আত্মপ্রকাশ করে নারীবাদী চিন্তাধারা, যেখানে ব্যক্তিক-সত্তার বিষয়নিষ্ঠ স্বরূপ সাপেক্ষে তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ সার্বিক তত্ত্ব নির্মাণ অপেক্ষা, তত্ত্ব এবং ব্যক্তির যাপনের অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করার বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ এই চিন্তাধারা অনুযায়ী ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপ ও তত্ত্বের প্রকৃতি পরস্পর অনুসৃত। ফলে বিষয়নিষ্ঠ স্বরূপের অনুষঙ্গকে অগ্রাহ্য করে তত্ত্ব নির্মাণ করাটা তাঁদের কাছে অনভিপ্রেত। নারীবাদী চিন্তাধারায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাবিশিষ্ট কিছু বিক্ষিপ্ত তত্ত্বের সমাবেশ থাকলেও, নেই কোনো সুনির্দিষ্ট তন্ত্র-কাঠামো, যা কিনা দর্শনচর্চার প্রেক্ষিতে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়।

দর্শনের জগতে ব্যক্তিক-সত্তার বিভিন্ন প্রকার গঠন ও স্বরূপের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল আণবিক সত্তা (atomic self) ও সম্পর্কিত সত্তা (relational self)। এক্ষেত্রে আণবিক সত্তা বলতে বোঝায় সেই সত্তা, যা যাবতীয় প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্নভাবে, সমস্ত প্রকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের অনুষঙ্গকে অস্বীকার করে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। বিমূর্ত যুক্তিপ্রয়োগের সক্ষমতাই

এর বিশেষ ধর্ম বলে মনে করা হয়। অপরদিকে সম্পর্কিত সত্তা হল সেই সত্তা, যা সর্বদাই কোনো না কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে; সম্পর্কের অনুষ্ণ ব্যতিরেকে বা প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্নভাবে কোনো অবস্থান তার থাকে না। এই সত্তা আণবিক সত্তার ন্যায় বিমূর্ত যুক্তিপ্রয়োগে অক্ষম। আবেগ-অনুভূতি-সংবেদনশীলতাই এর বিশেষ গুণ।

বর্তমান গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হল নির্বাচিত কিছু তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক আলোচনার মধ্য দিয়ে মূলস্রোত ও নারীবাদী চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে, ব্যক্তিক-সত্তার বিভিন্ন প্রকার গঠনগত স্বরূপ কীভাবে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত দর্শনশাস্ত্র তথা দার্শনিক তত্ত্বকে প্রভাবিত করে তার অনুসন্ধান।

মূলস্রোতের দর্শন যে বহুল চর্চিত এবং সর্বাধিক স্বীকৃত, সেই বিষয়ে ভিন্নমতের কোনো অবকাশ নেই। এইরূপ দর্শনচর্চার লক্ষ্য ও উপায় যথেষ্ট স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। নারীবাদের লক্ষ্য স্থির, কিন্তু তার উপায় অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট, আবার কখনোও বা অনেকান্ত। এই নারীবাদের প্রকৃত রূপ অনেকাংশেই অজ্ঞতার আড়ালে থেকে যায়। তাই মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে নারীবাদ কী, তার প্রয়োজন ও প্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যিক।

একথা সর্বজনবিদিত যে, পিতৃতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মধ্য দিয়েই ‘নারীবাদ’-এর সূচনা। সাধারণত ‘পিতৃতন্ত্র’ বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের সমাজ কাঠামোকে যা তথাকথিত পুরুষসুলভ গুণগুলিকে প্রাধান্য দেওয়ার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এইপ্রকার সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের লিঙ্গ পার্থক্যকে কেন্দ্র করে যে লিঙ্গ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তার অন্তরালে রয়েছে লিঙ্গ রাজনীতি, যা কিনা লিঙ্গ বৈষম্যের বাতাবরণ তৈরির উৎসমূল। অত্যন্ত সুক্ষভাবেই এটি চারিয়ে রয়েছে সমাজের প্রতিটি নির্মাণের রঞ্জে রঞ্জে। এই কারণে পিতৃতন্ত্রে সমাজ আরোপিত নারীসুলভ গুণগুলিকে উপেক্ষা করে অত্যন্ত সুচতুরভাবে পুরুষসুলভ গুণগুলিকে প্রাধান্য দেওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই উক্ত সমাজ ব্যবস্থায় এক বিশেষ লিঙ্গ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতার কর্তৃত্বাভিমানের পাশাপাশি, তদাপেক্ষা ভিন্ন লিঙ্গ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের শোষণের চিত্রটিও প্রকট হয়ে ওঠে। এই সমাজ ব্যবস্থায় মনে করা হয় যে, পুরুষ হল যৌক্তিক

জীব; সে গণিত, বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী। অপরপক্ষে নারী সংবেদনশীল; সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্পে তার অনায়াস বিচরণ।

সুদূর অতীত থেকে আরম্ভ করে চলমান বর্তমানেও অব্যাহত এই সমাজ প্রবাহ। প্রতিটি পুরুষ যেন এই প্রবাহের এক একটি তরঙ্গ বা ঢেউ, যার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ। বাস্তবে কোনো সমাজ ব্যবস্থাই স্বয়ম্ভু নয়, তা নিজে নিজে গড়ে উঠতে পারে না। যেকোনো সমাজ ব্যবস্থাই হলো মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নির্মিত উদ্দেশ্য সাধনমূলক কাঠামো। সুতরাং অন্তর্নিহিত অর্থ থেকেও এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ হল প্রকৃতপক্ষে পুরুষের দ্বারা, পুরুষের জন্য, পুরুষের সমাজ। অর্থাৎ পুরুষই হলো এই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তস্বরূপ। ফলত পুরুষ ও পিতৃতন্ত্র - একটিকে ছাড়া অপরটির কল্পনা অসম্ভব বলেই মনে হয়। কোনো সমাজ ব্যবস্থা যদি স্বরূপতাই পুরুষানুগত হয়, তাহলে সেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নারীর স্থান কোথায়, তা অবশ্যই ভেবে দেখার মত একটি বিষয়।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-সভ্যতায় সাধারণত 'নারী' সংক্রান্ত যেকোনো চিন্তাধারাকেই 'নারীবাদ' নামে আখ্যায়িত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কারণ, লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার চিহ্নিতকরণ শুরু হয়েছে নারী ও তার যাপনের প্রেক্ষাপটটির অবহেলা, শোষণ এবং অবদমনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে, কিন্তু তা বলে এই মতবাদ কখনোই কেবল নারীদের জন্য নয়। উক্ত লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে যে পথনির্দেশ করা হয়, তা যে শুধুমাত্র নারী-পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন নয়। বরং সেই পথ অনুসরণ করলে লিঙ্গ বৈষম্য ছাড়াও, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে যেকোনো মানুষের অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের (যেমন ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, জাতি ইত্যাদি) সামাজিক বৈষম্যেরও অবসান সম্ভব হবে বলেই মনে হয়। কাজেই 'নারীবাদ' পিতৃতন্ত্র বিরোধী হলেও, পুরুষ বিরোধী নয়। আবার এটি সকল নারীর সৌজন্যে গড়ে ওঠা কোনো একদেশদর্শী মতবাদও নয়। নারীবাদের চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা একলা চলার বার্তা যেমন দেন না, তেমনই আবার সবাইকে এই মতাদর্শে আবশ্যিকভাবে অঙ্গীভূত

হওয়ার আহ্বানও জানান না। তাই বলা যেতে পারে, নারীবাদ হলো সকল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষের সক্রিয়-তাত্ত্বিক প্রতিবাদ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে এখান থেকেই শুরু হয় মানবতাবাদের নবপর্যায়, উন্মোচিত হয় সংহতিপূর্ণ সহাবস্থানের নতুন দিগন্ত।

নারীবাদকে, নারীদের মতবাদ বলে প্রচার চালানোটা প্রকৃতপক্ষে বিরোধী লিঙ্গ রাজনীতির একটা নতুন কৌশল, যা প্রয়োগ করে পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহক ব্যক্তিগণ (বিশেষত পুরুষরা) টিকে থাকতে চাইছে ক্ষমতার শীর্ষে। তাদের ভয় হয়, পাছে যদি ক্ষমতার খেলাটা অভিমুখ পরিবর্তন করে বিপরীতমুখী স্রোতে প্রবাহিত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রের পরিবর্তে জন্ম নেবে অপর একটি ক্ষমতাতন্ত্র, যেখানে হয়তো বা নারীর পরিবর্তে নির্যাতিত হবে পুরুষ সমাজ। এইস্থলে ক্ষমতার খেলায় দলবদল হবে ঠিকই, কিন্তু খেলার ধরনের বা রীতিনীতির কোনোরূপ পরিবর্তন তো নাও হতে পারে। তাই যেমনভাবেই হোক না কেন, তারা অটুট রাখতে চায় তাদের ক্ষমতার উৎসটিকে। যদিও পিতৃতন্ত্রের রক্ষকদের এই উৎকর্ষা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কারণ পিতৃতান্ত্রিক স্বর অনুকরণের বা আত্মীকরণের মাধ্যমে নারী ক্ষমতার প্রতীক হয়ে উঠুক, এমনটা নারীবাদীদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের নির্ধারিত লক্ষ্য হলো ভিন্ন স্বরের অনুরণনের (resonance) মধ্য দিয়ে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন (empowerment)। সমাজে পুরুষের স্থান অধিগ্রহণ করার কোনো বার্তা তাঁরা নারীদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে চান না, স্ব-মর্যাদায় নারীর স্থান ও আভিজাত্য সুনিশ্চিত করাই তাঁদের একমাত্র অভিপ্রায়। সুতরাং ভেবে দেখা সমীচীন যে, নারীবাদ আসলে কী; পিতৃতন্ত্র বিরোধী, নাকি পুরুষ বিরোধী মতাদর্শ ?

পিতৃতন্ত্রের অবসান হবে কিনা ? এই প্রশ্নে সংলগ্ন হয়ে আছে নারী-পুরুষ উভয়ের সচেতনতা এবং আত্মমর্যাদা বোধ। ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, বাস্তবে সমস্ত নারী পিতৃতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না, আবার এমনও দেখা যায় যে, কিছু পুরুষও পিতৃতান্ত্রিক শোষণ ও অবদমনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কারণ ক্ষমতার থাকবন্দি বিন্যাসে নারীর মতো করে না হলেও, কখনোও না কখনোও, কোথাও না কোথাও পুরুষও নির্যাতনের শিকার

হয়ে থাকে। সেই কারণে পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে যে লড়াই, তা নেহাতই নারী বনাম পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আসলে এই বিরোধ বেধেছে, সচেতন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে – উদাসীন আত্মমর্যাদাহীন মানুষের। সবমিলিয়ে এ যেন এক অঘোষিত গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি। যদিও একথা ঠিক যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারী যেভাবে নিষ্পেষিত, পুরুষের অবস্থান ততটা সংকটাকীর্ণ নয়। তাছাড়া পড়ে পাওয়া ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করার জন্য বঞ্চনার বেদনাও তাদেরকে স্পর্শ করে না। তাই পুরুষের নিষ্পেষণ অনেক ক্ষেত্রে সহনীয়, কিন্তু নারী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তো বটেই – তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শারীরিক নিগ্রহ, অবমাননা, উপেক্ষা এবং শোষণের ইতিহাস।

বাস্তবে পুরুষদের একাংশ মনে করে যে, পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে পুরুষজাতির অস্তিত্বের বিষয়টি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত, পিতৃতন্ত্রের অবসান হলে বুঝি সমগ্র পুরুষজাতির অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে। অপর একদল মনে করে যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের স্বার্থসিদ্ধির কল্পতরু একথা ঠিক, কিন্তু সেই সমাজে কেবল নারী নয়, পুরুষও নানাভাবে নিষ্পেষিত। পিতৃতন্ত্রের অবসানে পুরুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এ কথা দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা স্বীকার করেন না। তাদের বক্তব্য হলো, এই সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ কেন্দ্রিকতা প্রাধান্য পেলেও, যেহেতু তা পুরুষের ক্ষেত্রেও অন্তরায় হতে পারে, তাই পিতৃতন্ত্রকে প্রতিহত করে নিজেদেরকে রক্ষার দায় পুরুষেরও বহন করা উচিত। এইস্থলে একপক্ষ মনে করে যে, পিতৃতন্ত্রের মধ্য দিয়েই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে, এবং ভিন্ন মতাবলম্বীরা মনে করে পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নারী-পুরুষ তথা সমগ্র মানবজাতিকে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। সুতরাং পিতৃতন্ত্র চিরস্থায়ী থাকবে কিনা সেই সিদ্ধান্তের ভার উত্তর প্রজন্মের উপরেই বর্তায়। সমস্ত সংকোচ ও সংকট কাটিয়ে উঠে নারী-পুরুষ উভয়কেই সচেতনভাবে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে। তবেই পাওয়া যাবে মুক্তির স্বাদ, উদ্ভূত আত্মশক্তি হবে নতুন পথের দিশারী।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, নারী সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নির্যাতিত বা নিষ্পেষিত তা কিন্তু নয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অতীত হোক বা বর্তমান, সামাজিক প্রেক্ষাপটে সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও, ধারণা-প্রতিষ্ঠান-চর্যা'র সংগতিপূর্ণ সহাবস্থানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোটি এমনভাবে নির্মিত হয়ে আছে যে, যেকোনো পরিস্থিতি বা অজুহাতে নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ কয়েম তথা আধিপত্য বিস্তারের একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তের সংখ্যা বহু হলেও, বাস্তবের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী প্রান্তবাসী হওয়ার প্রধানতম কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল সামাজিক দ্বিচারিতা। এই সমাজে পুরুষ সোনার আংটি, বাঁকা হলেও যার মূল্য অপরিবর্তিত থেকে যায়, অপরদিকে ধরে নেওয়া হয় যে, নারীই সকল অনিষ্টের মূল। সুতরাং নারীর লিঙ্গ ধর্মভিত্তিক ভূমিকার ক্ষেত্রটিকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে হলে, সর্বপ্রথম প্রয়োজন সামাজিক দ্বিচারিতার অবসান। সেই লক্ষ্যে সামাজিকতা রক্ষার একচ্ছত্র দায়ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নারীকে তার লিঙ্গায়িত গুণধর্ম নির্বাচন করার স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। নারীকে বুঝতে এবং বোঝাতে হবে যে, আবেগ তার দুর্বলতা নয়, তাকে যুক্তি-তর্কের নিগড়ে বেঁধে রাখা যায় না, সে শরীরসর্বস্ব নয়, তাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য হয় বলপ্রয়োগ অথবা সুচিন্তিত কৌশল অবলম্বনের প্রচেষ্টা বৃথা - এই সমাজের বুকে সে আত্মশক্তিতে বলীয়ান এক মুক্ত সত্তা।

প্রচলিত অর্থে 'নারীবাদ' বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে নারীবাদী 'দার্শনিক' চিন্তাধারার মাত্রাগত পার্থক্যের বিষয়টিতে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। সাধারণত 'নারীবাদ' হল 'নারী' সম্পর্কিত কোনো সমস্যার সমাধানকল্পে সক্রিয় আন্দোলন। কিন্তু 'নারীবাদী দর্শন' হলো নারী'র লিঙ্গ বৈষম্য ও তজ্জনিত সমস্যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। একদিকে সমস্যা দূরীকরণে সক্রিয় আন্দোলন ও অন্যদিকে সেই সমস্যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ - উভয়ই পরস্পর পরিপূরক, কিন্তু অভিন্ন নয়। একই কারণে

নারীবাদের বিভিন্ন পর্যায় এবং নারীবাদী দর্শনের প্রগতির পর্যায়গুলির মধ্যে কালগত ব্যবধান সুস্পষ্ট। এইস্থলে নারীবাদ-এর কালানুক্রমিক আলোচনা অপরিহার্য নয়, যদিও নারীবাদী চিন্তাধারার প্রগতির পরিচয় থাকা আবশ্যিক।

একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে 'নারীবাদ' ছিল মূলত নানান দাবি আদায়ের নিমিত্ত সক্রিয় আন্দোলন। সময়ান্তরে যা ছিল শুধুমাত্র আন্দোলন – তার সঙ্গে যুক্ত হলো এক নতুন মাত্রা। একদল দার্শনিক যাঁরা মূলত নারী, লক্ষ করলেন যে, নারীর সমস্যা বাস্তবে ত্রিস্তরীয় একটি সমস্যা। এর উৎস অনেক গভীরে। তাই নারীর যাপনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যাগুলির সমাধান কেবলমাত্র সক্রিয় আন্দোলনের ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়। কারণ সমস্যাটি চর্চা ও প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়ে ধারণার স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ধারণার স্তরে পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে এই সমস্যার কাঙ্ক্ষিত সমাধান অসম্ভব। উক্ত পরিবর্তনের অর্থ হল নারীর লিঙ্গ সমস্যার তাত্ত্বিক বিচার। নারীবাদ ক্রমশ তাত্ত্বিক আকার ধারণ করতে থাকলো – সূচনা হলো নারীবাদী দর্শনের। এই সময়কালকে নারীবাদের দ্বিতীয় পর্যায় বলা হয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু এটাই ছিল প্রকৃতপক্ষে নারীবাদী দর্শনের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে নারীবাদী দার্শনিকদের প্রধান কাজ ছিল মূলস্রোতের প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক তত্ত্বগুলির মধ্যে কোথাও লিঙ্গ বৈষম্যমূলক প্রেক্ষিত নিহিত আছে কিনা তার অনুসন্ধান। সেই কাজে তাঁরা খানিকটা সাফল্য লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু তা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ছিল না।

উপরোক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন নারীবাদী মূলস্রোতের তত্ত্বগুলির নারী বিদ্বেষমূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন। তাঁরা ওই বিদ্বেষের মূলে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের প্রভাব কীরূপ, তা নিরূপণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সময়টা ছিল নারীবাদী দর্শনের দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করে উদারপন্থী (liberal) নারীবাদী চিন্তাধারা। উদারপন্থী নারীবাদীরা ধ্রুপদী দর্শনের প্রেক্ষাপট থেকে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করলেও, তাঁরা দর্শনের নিজস্ব কোনো ত্রুটি বা দোষ থাকতে পারে বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে লিঙ্গ বৈষম্য বা লিঙ্গ পক্ষপাত কখনোই সচেতনভাবে দার্শনিক

অনুসন্ধানের লক্ষ্য হতে পারে না, বা সেটি কোনো তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের ফলাফলও নয়। দার্শনিক তত্ত্বের প্রেক্ষিতে এইজাতীয় ত্রুটি হল এক ধরনের অনবধান, যা তত্ত্ব প্রয়োগকারী ব্যক্তির অজ্ঞতার ফলে ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে তাঁরা ধ্রুপদী দর্শনের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি, ওই দার্শনিক তত্ত্বগুলিতে নারীর যাপনের অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি দাবি করে থাকেন।

পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি সকল নারীবাদীর কাছে সমাদৃত হয়নি। এই প্রসঙ্গে একদল নারীবাদী ভিন্নমত পোষণ করে, তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে লিঙ্গ বৈষম্যের চিহ্নিতকরণ এবং সমালোচনামূলক অবস্থান পরিহারের মধ্য দিয়ে বিকল্প তত্ত্ব নির্মাণের পথ দেখালেন। এর ফলস্বরূপ নারীবাদ খুঁজে পায় এক নতুন তাত্ত্বিক দিশা। এই নারীবাদীরা মনে করেন নারীর লিঙ্গ ধর্ম নির্বিশেষে যেকোনো সাপেক্ষ অভিজ্ঞতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সেই কারণে নিরালম্ব তাত্ত্বিক অবস্থানে পৌঁছানোর আশা ত্যাগ করে, সাপেক্ষ প্রেক্ষিত অবলম্বনে তত্ত্ব নির্মাণ একান্ত আবশ্যিক। উক্ত মতানুসারে লিঙ্গ বৈষম্য যেহেতু সর্বত্রগামী তাই দর্শনচর্চাও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। সুতরাং লিঙ্গ প্রেক্ষিতের উপস্থিতি স্বীকার করে নিয়ে তত্ত্ব রচনা করাটাই বাস্তবানুচিত পদক্ষেপ। এই মতাদর্শীরা চরমপন্থী (radical) নারীবাদী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন, এবং সময়টি নারীবাদী দর্শনের তৃতীয় পর্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এর পরবর্তী সময় থেকে নারীবাদী তত্ত্বগুলিতে লিঙ্গ প্রেক্ষিতের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক প্রেক্ষিত যেমন ধর্ম, বর্ণ, জাতি, শ্রেণী ইত্যাদিও আবশ্যিক মাত্রা হিসাবে যুক্ত হওয়ার একটা ধারা লক্ষ করা যায়। যদিও নারীবাদী দর্শনের সূচনা পর্ব থেকেই বিভিন্ন তত্ত্বের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়নি। বর্তমানে কেউ কেউ এই বিবিধ মাত্রাগুলিকে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে সহ-অবস্থানমূলক (co-existence) প্রকার হিসেবে দেখতে চান, আবার কোনো কোনো নারীবাদী এগুলিকে সহ-গঠনমূলক (co-constituent) উপাদান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তুল্যমূল্য বিচার করে অধুনা নারীবাদী দর্শনের এই পটপরিবর্তনকে চতুর্থ পর্যায় রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। সমস্যা হল তত্ত্ব নির্মাণের

পরিপ্রেক্ষিতে দর্শনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ভিন্নমত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নারীবাদীদের যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া গেলেও, দর্শনসম্মত কোনো তত্ত্ব তাঁদের কাছে আজও অধরা থেকে গেছে। নারীবাদ-এর সম্পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে দর্শনের নানা শাখা-প্রশাখায় বয়ে চলা চিন্তাধারাগুলির মধ্য থেকে নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধান অত্যাবশ্যিক হয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যিক যে, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যখন ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপ সাপেক্ষে তত্ত্ব নির্মাণের দাবি জানানো হয়, সেই সত্তা কিন্তু দ্রব্যরূপ কোনো আধিবিদ্যক পদার্থ নয়। কারণ আধিবিদ্যক সত্তা নির্মিত হয় না, তা হল পূর্ব অস্তিত্বশীল পদার্থ। নারীবাদীরা তত্ত্বের অনুষণে যে ধরনের সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সেই সত্তা নির্মিত হয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে। তাঁরা সত্তার 'হয়ে ওঠা' (becoming) স্বরূপকে তত্ত্বের প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য তথ্য বা উপাদান হিসাবে মান্যতা দিতে আগ্রহী। এইরূপ সত্তা মূলত দুইপ্রকার, আণবিক সত্তা ও সম্পর্কিত সত্তা। মূলস্রোতেও সত্তার স্বরূপ সম্পর্কিত নানা তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যদিও দার্শনিক নানা তত্ত্ব বা তত্ত্ব-কাঠামোতে সত্তার গঠনগত স্বরূপ অনুসূত হয়ে থাকে কিনা, মূলস্রোতীয় দর্শনে তা কখনোই আলোচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয় না। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিক-সত্তার নির্মিত স্বরূপের ভিত্তিতে তত্ত্বভূমি বা তত্ত্ব-কাঠামো কীভাবে অনুসূত হয়ে থাকে, সেই বিষয়ক অনুসন্ধান অবশ্যই এক নারীবাদী তাত্ত্বিক অন্বেষণের ইঙ্গিতবাহী।

আমরা জানি, যেকোনো নারীবাদী অবস্থানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নারী-পুরুষের লিঙ্গ পার্থক্যকে কেন্দ্র করে যে লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টি হয় তা দূর করে, কীভাবে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তার পথনির্দেশ করা। নারীবাদীরা নানাভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টাও করেছেন। তাঁরা সমস্যাটিকে কখনো আধিবিদ্যক, কখনোও বা জ্ঞানতাত্ত্বিক, কখনো নৈতিক বা যুক্তিবৈজ্ঞানিক বা অন্যান্য আরোও নানান প্রেক্ষাপট থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলেও, আজও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়নি। সমাজ থেকে লিঙ্গ বৈষম্য আজও দূরীভূত হয়নি - খানিকটা প্রশমিত হয়েছে

একথা অবশ্য স্বীকার্য। এইরূপ সমস্যার ক্ষেত্রে যদিও একমাত্র নয়, কিন্তু অন্যতম প্রধান কারণ হলো, লিঙ্গ বৈষম্যের পশ্চাতে বিদ্যমান ধ্রুপদী দার্শনিক তত্ত্ব-কাঠামোর বিরুদ্ধে নারীবাদীদের পক্ষ থেকে নানা প্রতিবাদী স্বর বা প্রতিস্পর্ধী তাত্ত্বিক চিন্তন কাঠামো গড়ে উঠলেও, সেগুলিকে সুগঠিত করে দর্শনসম্মত কোনো তন্ত্র নির্মাণ এয়াবৎ সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

দার্শনিকতার প্রেক্ষিতে কোনো সমস্যার সমাধান করতে হলে, সেই সমস্যাটিকে কোনো না কোনো দার্শনিক তন্ত্র অনুসারে বিচার করা একান্ত আবশ্যিক। তা না হলে সেই বিচার হয় আংশিক, সমস্যারও আংশিক সমাধান হয়, কিন্তু সামগ্রিক সমাধান সম্ভব হয় না। একথা নারীবাদীদের অজানা থাকার কথা নয় যে, মূলস্রোতের কোনো তত্ত্ব-কাঠামোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হলে তা সামগ্রিকভাবে করাটাই কাম্য, কারণ মূলস্রোতের কোনো তত্ত্বই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে না। সেগুলি সর্বদাই কোনো না কোনো সুসংবদ্ধ তন্ত্রের অংশ হিসাবেই অবস্থান করে, এবং সেই তন্ত্রের অন্তর্গত প্রতিটি তত্ত্বই অপরাপর তত্ত্বের সঙ্গে লগ্ন থেকে একে-অপরের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। এহেন তন্ত্রের অন্তর্গত কোনো তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক কাঠামোকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিহত করার অর্থ হলো কোনো সমস্যার আংশিক সমাধান, যা দার্শনিক বিচারের লক্ষ্য হতে পারে না। নারীবাদী চিন্তাধারাকে দার্শনিকতার পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে, নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র গড়ে তোলা অত্যাবশ্যিক হয়ে পড়ে। সুতরাং লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধান করতে হলে সেই সমস্যাটিকে একাধারে আধিবিদ্যক-জ্ঞানতাত্ত্বিক-নৈতিক ও যুক্তিবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে পর্যালোচনা করা অপরিহার্য।

দর্শনের জগতে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি কোনো তত্ত্ব প্রযুক্ত হয়, তাদের গঠনগত স্বরূপ যদি তত্ত্বের প্রেক্ষিতে স্থান না পায়, তাহলে সেই তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান থেকে যায়। ধ্রুপদী তত্ত্বে চিন্তার সঙ্গতি লক্ষ করা যায় ঠিকই, কিন্তু তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে কোনোপ্রকার সঙ্গতি সাধন করা সম্ভব হয় না। নারীবাদীরা তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে উদ্যোগী। তাই তাঁরা ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপ সাপেক্ষে তত্ত্ব নির্মাণে আগ্রহী। এক্ষেত্রে সাপেক্ষতা বলতে সাধারণত লিঙ্গ সাপেক্ষতাকে

বোঝানো হয়ে থাকে। নারীবাদীরা বিভিন্ন সাপেক্ষ প্রেক্ষিত তত্ত্বের অনুষণে গৃহীত হোক এমনটা চাইলেও, 'সাপেক্ষতাবাদ' প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা চান না। তাঁদের দাবি হলো তত্ত্ব যেন সর্বদাই সর্বসাধারণের উপযোগী হয়, কোনও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের অনুগামী যেন না হয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত দার্শনিক তত্ত্বের ক্ষেত্রেও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা আবশ্যিক।

সমস্যা হল মূলস্রোতে যদিও বিভিন্ন সুগঠিত দার্শনিক তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, কিন্তু ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপের সঙ্গে সেই দার্শনিক তত্ত্ব কীভাবে সম্পর্কিত হতে পারে সেই বিষয়ক কোনোপ্রকার অনুসন্ধান পরিলক্ষিত হয় না। অপরপক্ষে নারীবাদে ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ থাকলেও, নেই কোনো সুগঠিত দার্শনিক তত্ত্ব-কাঠামো। আছে কেবল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন কিছু ভিন্নধর্মী তাত্ত্বিক পর্যালোচনা।

উপরোক্ত সমস্যার সমাধানে করণীয় হল প্রথমত, মূলস্রোতের নির্বাচিত দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে অনুমান করতে হবে যে, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ কীরূপ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, নারীবাদের বিভিন্ন ধারায় ব্যক্তিক-সত্তার যে ভিন্নপ্রকার গঠনগত স্বরূপ স্বীকৃত হয়ে থাকে, তার ভিত্তিতে সৃজিত নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বের বিন্যাস কীরূপ হতে পারে তার অনুসন্ধানও অত্যাাবশ্যিক।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটিকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এই গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কান্ট-এর দর্শন। তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব কীভাবে বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে, তা অনুধাবন করার জন্য দর্শনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় কান্ট প্রবর্তিত তত্ত্বগুলির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আবশ্যিক। বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে তাঁর সমগ্র দার্শনিক তত্ত্ব বিধৃত হয়ে রয়েছে, তা তুলে ধরা এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো হিউম-এর দর্শন। একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে হিউম কীভাবে দর্শনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে নিজমত ব্যক্ত

করেছেন, তা বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর দার্শনিক তন্ত্রটিকে প্রকাশ করা এই আলোচনার প্রধান উপজীব্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো এক উদারপন্থী নারীবাদী দর্শন তন্ত্রের অন্বেষণ। উদারপন্থী নারীবাদে নানা আঙ্গিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনাগুলিকে সমন্বিত করার মধ্য দিয়ে, কীভাবে একটি তন্ত্রিত বা প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারা গঠিত হতে পারে, তার যথাযথ ব্যাখ্যা দান করাই এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে চরমপন্থী নারীবাদের কিছু বিক্ষিপ্ত, পরস্পর বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক অবস্থানকে একত্রিত করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে, তাঁদের চিন্তাধারার মধ্য থেকে দর্শন তন্ত্র গঠনের উপযোগী কোনোপ্রকার সূত্র-সম্বন্ধ উঠে আসে কিনা।

পঞ্চম তথা শেষ অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক, ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কিত ভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যা ও তার ভিত্তিতে কোন্ ধরনের দার্শনিক তন্ত্র অনুসূত হতে পারে, সেই সম্পর্কে বিচারমূলক বিশ্লেষণ করাটাই মূল লক্ষ্য।

সুতরাং দেখা গেল যে, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মূলস্রোত বলতে মূলত ধ্রুপদী আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনকেই বোঝানো হয়েছে, এবং একইভাবে নারীবাদ বলতে প্রধানত উদারপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই নারীবাদী ধারাকেই গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিক-সত্তা বলতে আণবিক ও সম্পর্কিত সত্তার স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনাই একমাত্র অভিপ্রেত, এবং দার্শনিক তন্ত্র সংক্রান্ত আলোচনার পরিসর বিশেষভাবে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিজ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নির্বাচিত ক্ষেত্রগুলিতে বিভিন্ন দার্শনিক প্রদত্ত মতবাদ বা চিন্তাধারার পুঞ্জানুপুঞ্জ নিরীক্ষণ এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য তত্ত্বগুলির পর্যাপ্ত আলোচনা ও সমালোচনার ভিত্তিতে যথাযথ বর্ণনা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং তুল্যমূল্য বিচারের মাধ্যমে, ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ ও তদুপযুক্ত দার্শনিক তন্ত্র-এর প্রকৃতি কীভাবে পরস্পর অনুসূত হতে পারে, সেই সম্পর্কটিকে ব্যক্ত করাই মূল অভিপ্রায়।

প্রথম অধ্যায়

কান্ট-এর দর্শন ও বিচারবাদী দার্শনিক তত্ত্ব

মূলস্রোতের আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant, 1724-1804)-এর মতবাদ 'বিচারবাদ' নামে খ্যাত। কান্টের পূর্ববর্তী সময়ে অধিবিদ্যাকে দর্শনের রাণী নামে অভিহিত করা হত। এই পর্বে অধিবিদ্যকে জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর অনুসন্ধান করাই ছিল দার্শনিকের প্রধান কাজ। কালক্রমে দর্শনের আধুনিক পর্বে অধিবিদ্যার উচ্চাসন দখল করে জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যালোচনা। এইসময় থেকেই দর্শনের জগতে জ্ঞানতাত্ত্বিক পটপরিবর্তন (epistemic turn) শুরু হয়। জ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা দার্শনিক মননে প্রধানতম স্থান দখল করলেও অধিবিদ্যা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় এমন নয়। প্রাধান্য অনুসারে কান্ট-এর দার্শনিক তত্ত্ব সংক্রান্ত পর্যালোচনা জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু হওয়া প্রয়োজন।

জ্ঞানতত্ত্ব :

বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভের উপায় কী ? এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে ধ্রুপদী পাশ্চাত্য দর্শনে দুটি প্রধান মতবাদ গড়ে উঠেছিল। একটি হল 'যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদ', এবং অপরটি হল 'দৃষ্টিবাদ' বা 'অভিজ্ঞতাবাদ'। কান্ট এই দুটি মতবাদকেই নির্বিচারবাদ বলে মনে করতেন। সেই কারণেই তিনি এই মতবাদ দুটিকে সমন্বিত করার মধ্য দিয়ে তাঁর 'বিচারবাদ' প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। কান্ট কেন এবং কীভাবে বিচারবাদী অবস্থান গ্রহণ করলেন, তা বোঝার জন্য বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মূল নীতির সঙ্গে কান্টের মতবাদের পার্থক্য নিরূপণ আবশ্যিক।

আমরা জানি, বুদ্ধিবাদ অনুসারে বুদ্ধিই যথার্থ জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস। এই বুদ্ধি দ্বারাই বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়। বুদ্ধিবাদীরা যথার্থ জ্ঞান বলতে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানকেই বুঝতেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বিষয়ের যে রূপ প্রত্যক্ষ করি তা ভ্রান্তিজনক। সুতরাং ইন্দ্রিয় কখনোই যথার্থ জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস হতে পারে না, বরং তা যথার্থ জ্ঞানলাভের অন্তরায়।

অপরদিকে অভিজ্ঞতাবাদে স্বীকার করা হয় যে, ইন্দ্রিয়ানুভব হল জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস। এক্ষেত্রে বুদ্ধির কাজ হল, বাহ্যবিষয়ের সংবেদনকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা। কান্ট লক্ষ করেন, এই উভয় মতবাদে যে বিশ্বাস থেকে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা হয়েছে, তা হল - মানবমন বাহ্যবিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম। কোনো মতবাদেই জ্ঞানের সম্ভাবনার দিকটিকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি। তিনি এই উভয় মতবাদের ত্রুটিগুলিকে দূর করে, তাদের গুণগুলিকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে এক নতুন মতবাদ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, যা ধ্রুপদী পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে 'বিচারবাদ' নামে খ্যাত।

কান্ট-এর মতে, বুদ্ধিবাদীরা যখন বলেন যে, আমরা যে সকল ধারণা দ্বারা জ্ঞানলাভ করি, সেগুলি কখনোই ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত হতে পারে না, সেগুলির উৎস হল বুদ্ধি - এই মত অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কারণ কোনো জ্ঞান যদি সর্বজনস্বীকার্য হতে হয়, তাহলে সেই জ্ঞানকে সার্বজনীন ও অনিবার্য হতে হবে। সাবজেক্টিবিতা ও অনিবার্যতা ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভব বা অভিজ্ঞতা এইজাতীয় জ্ঞানের উৎস হতে পারবে না। আবার অভিজ্ঞতাবাদীরা যখন বলেন যে, কোনো জ্ঞান হতে গেলে, সেই জ্ঞানের বিষয়ের ইন্দ্রিয়ানুভব হওয়া দরকার, এক্ষেত্রেও কান্ট মনে করেন যে, যা কিছু সং বা অস্তিত্বশীল তার জ্ঞানলাভের জন্য ইন্দ্রিয়ানুভব অপরিহার্য। ফলে জ্ঞানের উৎপত্তিতে হয় বুদ্ধি, না হয় অভিজ্ঞতা এককভাবে সক্ষম এমন কথা কান্ট সমর্থন করতেন না। তাঁর মতানুসারে নির্বিচারবাদীরা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন বলেই সমস্যার সূত্রপাত। আসলে জ্ঞানলাভের এই দুটি উপায়ের মধ্যে কোনো পরিমাণগত পার্থক্য নেই, আছে কেবল গুণগত পার্থক্য। অভিজ্ঞতা দেয় জ্ঞানের উপাদান, বুদ্ধি দেয় জ্ঞানের আকার। যাবতীয় জ্ঞানের উৎপত্তিতে এই উপাদান এবং আকার উভয়ই অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রদত্ত প্রত্যয় বা ধারণাগুলি তখনই জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারবে, যখন সেগুলি সম্ভাব্য বা বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিসরে প্রযুক্ত হবে। যদিও এই প্রত্যয়গুলি অভিজ্ঞতা-পূর্ব, কিন্তু এগুলির উপযোগিতা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহের যথার্থতা নিরূপণেই সীমাবদ্ধ।

কান্ট আরও লক্ষ করেন যে, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা সার্বজনীন ও অনিবার্য জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অবরোহ পদ্ধতিকে একমাত্র উপযোগী বলে মনে করে থাকেন। কারণ এই পদ্ধতিই সর্বজনস্বীকৃত জ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদীরা আরোহ পদ্ধতিকেই জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে স্বীকার করেন। অভিজ্ঞতাবাদীরা জ্ঞানের বিস্তারের পক্ষপাতী, অর্থাৎ তাঁরা জ্ঞানের পরিসরের সম্প্রসারণ চান। সেক্ষেত্রে অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে ওই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা আরোহ পদ্ধতি অবলম্বনে জ্ঞানলাভে আগ্রহী, কিন্তু সমস্যা হল আরোহ পদ্ধতি অভিজ্ঞতানির্ভর হওয়ায় তার দ্বারা সার্বজনীনতা ও অনিবার্যতা পাওয়া সম্ভব নয়, এবং অবরোহ পদ্ধতি বুদ্ধিনির্ভর হওয়ার দরুন তা জ্ঞানের বিশ্লেষণে সক্ষম হলেও, জ্ঞানের সংশ্লেষণে অপারগ। তাই এই পদ্ধতি দ্বারা জ্ঞান প্রসারিত হয় না, এবং জ্ঞানের প্রসার ও বিস্তৃতি না ঘটলে নতুন তথ্য সংযোজিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে কান্ট লক্ষ করেন যে, আমাদের কোনো কোনো অবধারণ (judgment) বিশ্লেষণাত্মক নয়, কিন্তু সার্বজনীন ও অনিবার্য, অর্থাৎ তা অভিজ্ঞতা-পূর্ব। আবার কোনো কোনো অবধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা-পূর্ব, কিন্তু তা সংশ্লেষক। ফলত জ্ঞানের বিস্তার ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ কান্ট গণিত, জ্যামিতি ও পদার্থবিজ্ঞানের অবধারণগুলিকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, সেগুলি অভিজ্ঞতা-পূর্ব, কিন্তু সংশ্লেষক।

প্রকৃতপক্ষে কান্ট-এর বক্তব্য হল যথার্থ জ্ঞান মাত্রই যুগপৎ তথ্য সংযোজনমূলক, অর্থাৎ তা জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটায়, তাই তা সংশ্লেষক, এবং একইসঙ্গে সেটি সার্বজনীন ও অনিবার্যভাবে সত্য, অর্থাৎ তা অভিজ্ঞতা-পূর্ব। সুতরাং যথার্থ জ্ঞান হল তাই, যা সংশ্লেষক ও অভিজ্ঞতা-পূর্ব। কান্টের জ্ঞানতত্ত্বে বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুখ্য প্রশ্নটি হল - কীভাবে এই অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব। এটাকেই তিনি শুদ্ধ প্রজ্ঞার সাধারণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

দর্শনের ইতিহাসে কান্ট সর্বপ্রথম উক্তপ্রকার জ্ঞানের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছিলেন। অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক জ্ঞান যে সম্ভব, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। এক্ষেত্রে তা কীভাবে হয়, এবং তার অস্তিত্বের সপক্ষে প্রমাণ দর্শানোই

ছিল কান্টের জ্ঞানতত্ত্বের মূল লক্ষ্য। তাঁর দাবি ছিল বিজ্ঞানের সব জ্ঞানই হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব এবং সংশ্লেষক। তিনি মনে করতেন বিজ্ঞান বলতে যে ধরনের জ্ঞানকে বোঝানো হয় তা কেবল ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। বিজ্ঞান এইজাতীয় জ্ঞানকে ব্যক্ত করে না। বিজ্ঞান এমন জ্ঞান প্রকাশ করতে চায় যা সবার ক্ষেত্রে সমভাবে সত্য। তাই বিজ্ঞানেও অবধারণ বা জ্ঞান সার্বজনীন হওয়া অনিবার্য। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার কান্টের দর্শনে যা সার্বজনীন তা অনিবার্য এবং যা অনিবার্য তা সার্বজনীন। এই দুটি ধারণা সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ করা সম্ভবপর নয়। আবার বিজ্ঞান উক্তপ্রকার সার্বজনীন ও অনিবার্য জ্ঞানলাভ করতে পারলেই নিজ লক্ষ্য পূরণ করে ফেলে এমনও নয়। কান্ট মনে করেন যে, সার্বজনীনতা ও অনিবার্যতার পাশাপাশি বিজ্ঞানের আরও একটি লক্ষ্য হল জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করা। তা না হলে জ্ঞানের অনুসন্ধান স্তব্ধ হয়ে যাবে, ফলত নিত্য-নতুন আবিষ্কার সম্ভবপর হবে না। যেহেতু বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান ও অবধারণে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায় না, তাই সেক্ষেত্রে সংশ্লেষক অবধারণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

এইস্থলে প্রশ্ন হল, আমাদের সকল জ্ঞান যদি অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু হয়^১, তাহলে কান্ট অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের নিশ্চিত অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কীভাবে? তিনি অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান বলতে বোঝেন সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ জ্ঞানকে। এইপ্রকার জ্ঞানের সত্যতা কোনোভাবেই কোনোরকম অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যিক যে, কান্ট অভিজ্ঞতা-পূর্ব বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা কোনো কালিক পূর্বগামিতা নয়। কালের দিক থেকে দেখলে অভিজ্ঞতার পূর্বে কোনো জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর নয়। সেক্ষেত্রে সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু হয়, এ কথার অর্থ হল, কালের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, সব জ্ঞান শুরু হয় অভিজ্ঞতা দিয়ে। তাই কান্ট যখন অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের বা অবধারণের কথা বলেন, তা কালিক পূর্বগামিতাকে নির্দেশ করে না। তা হল যুক্তিবৈজ্ঞানিক

^১“But although all our cognition commences with experience,...”, Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, trans. and eds. by Paul Guyer and Allen W. Wood, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 136.

(logical) পূর্বগামিতা। এক্ষেত্রে জ্ঞান বলতে বাহ্যজগতের জ্ঞানকেই বুঝতে হবে এবং এইজাতীয় জ্ঞান সর্বদাই অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু হয়ে থাকে বলেই তাঁর অভিমত।

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কান্ট মনে করেন বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা এককভাবে বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান উৎপাদনে অক্ষম। কারণ জ্ঞানের দুটি মাত্রা, একটি হল তার উপাদান এবং অপরটি হল আকার। অভিজ্ঞতা দেয় জ্ঞানের উপাদান এবং বুদ্ধি দেয় তার আকার। এই প্রসঙ্গে কান্ট মানব মনের অন্যতম দুটি জ্ঞানবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হল সংবেদনশক্তি (sensitivity) এবং অপরটি হল বোধশক্তি (Understanding)।^২ সংবেদনশক্তির মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের উপাদান লাভ করে থাকি, যা বহু এবং বিচ্ছিন্ন। সেগুলি বাহ্যজগৎ থেকে আমাদের মনে এসে উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে সংবেদনশক্তির কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকে না বলে এটিকে পরতঃক্রিয়া বলে। অপরদিকে বোধশক্তি এইসমস্ত বিচ্ছিন্ন বহু সাংবেদনিক উপাদানগুলিকে নির্দিষ্ট আকারে আকারিত করে জ্ঞান উৎপন্ন করে। এই বোধশক্তি বাহ্যজগৎ থেকে আসে না, মানব মন থেকে স্বতঃই উৎপন্ন এবং ক্রিয়াশীল হয়। তাই বোধশক্তির ক্রিয়াকে স্বতঃক্রিয়া বলে। সংবেদনশক্তির মাধ্যমে বাহ্যজগৎ থেকে আগত বিচ্ছিন্ন, বহু সংবেদনগুলি দেশ ও কালের আকারে গ্রথিত হয়ে আমাদের মনে উপস্থিত হয়। এটিকে ইন্দ্রিয়ানুভব বলা হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ানুভব বা অভিজ্ঞতায় আমাদের এমন কোনো বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, যা কালিক বা দৈশিক নয়। দেশ হল বাহ্য ইন্দ্রিয়ের আকার বা আকারগত শর্ত এবং কাল হল অন্তর ইন্দ্রিয়ের আকার বা আকারগত শর্ত। অভিজ্ঞতার বিষয় মাত্রই তা দেশ ও কালের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই দেশ এবং কাল হল সংবেদনশক্তির আকার। যেগুলিকে কান্ট যেকোনো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পূর্বশর্তরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও দেশ ও কাল আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না, মানুষের মনের স্বভাবের মধ্যে তা নিহিত থাকে। এগুলি হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব আকার (form of sensibility)। এই দুই অভিজ্ঞতা-পূর্ব আকারের মধ্য দিয়েই বহু ও বিচ্ছিন্ন সংবেদন বা অনুভবগুলি, সুবিন্যস্ত হয়ে আমাদের মনে উপস্থিত হয়। ফলে বাহ্যবস্তুর

^২“...there are two stems of human cognition,... namely sensibility and understanding”, Ibid, p. 152.

প্রকৃত স্বরূপ আমাদের অজানা থেকে যায়। আমরা যা জানতে পারি তা হল বাহ্যবস্তুর অবভাসিত রূপ, যেগুলি সর্বদাই কোনো না কোনো দৈশিক ও কালিক বিষয় রূপেই অনুভূত হয়ে থাকে।

কান্ট-এর মতে দেশ ও কাল যেমন সংবেদনশক্তির পূর্বতসিদ্ধ আকার, ঠিক তেমনই বোধশক্তির বারোটি পূর্বতসিদ্ধ প্রকার আছে, যেগুলি কিনা যেকোনো বিষয়জ্ঞানের পূর্বশর্ত। কান্ট মনে করেন, দেশ ও কালে আবদ্ধ বিচ্ছিন্ন, বহু সংবেদনগুলিকে সুবিন্যস্ত করতে পারলেই জ্ঞান উৎপন্ন হবে এমন নয়। কারণ সেগুলি জ্ঞানের উপাদান মাত্র, জ্ঞান পদবাচ্য নয়। জ্ঞান হতে গেলে সেগুলিকে বৌদ্ধিক প্রকার (category of understanding)-এর মাধ্যমে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে হয়। এক্ষেত্রে বৌদ্ধিক প্রকারগুলি জ্ঞানের বিষয়কে আকার দান করে থাকে। এগুলিও মানুষের মনের স্বভাব থেকেই উৎপন্ন, অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত নয়, তাই তা পূর্বতসিদ্ধ। এইভাবে সংবেদনশক্তির আকার এবং বোধশক্তির প্রকারের সম্মিলনে মানুষের জ্ঞানক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে বলেই কান্ট-এর অভিমত।

কান্টের কাছে জ্ঞান শুরু হওয়া এবং জ্ঞান পরিপূর্ণ হওয়া এক কথা নয়। তাঁর মতে জ্ঞান হতে গেলে বিষয় প্রয়োজন, সেই বিষয়কে আমরা অনুভবের মাধ্যমে লাভ করি। অনুভব দ্বারা বিষয় উপস্থিত হলে তাতে বৌদ্ধিক প্রকার যুক্ত করে আমরা জ্ঞানলাভ করি। সেই জ্ঞানই হল লৌকিক জ্ঞান (empirical knowledge)। এই লৌকিক জ্ঞানই সুসম্বন্ধ অবস্থায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পরিণত হয়ে থাকে।

এখন দেখে নেওয়া প্রয়োজন যে, উক্ত সংবেদনের আকার এবং বৌদ্ধিক প্রকারগুলির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও যথার্থতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে কান্ট কোন্ ধরনের যুক্তি প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সংবেদনের আকার, অর্থাৎ দেশ ও কাল হল শুদ্ধ অনুভব এবং একইসঙ্গে তিনি এগুলিকে অনুভবের শুদ্ধ আকার রূপেও ব্যাখ্যা করেছেন।^৩ এই দেশ ও কাল হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধারণা বা প্রত্যয়। কান্টের পর্যালোচনা থেকে এগুলির অস্তিত্বের সপক্ষে প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলিকে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যেতে

^৩ “This pure form of sensibility itself is also called pure intuition.”, Ibid, p. 156.

পারে। একটি হল আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা (metaphysical exposition) এবং অপরটি হল অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা (transcendental exposition)।

দেশ : আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা^৪

আধিবিদ্যক ব্যাখ্যার দ্বারা দেশ-এর ধারণা প্রমাণ করতে গেলে, প্রথমত, দেখাতে হবে যে, দেশ হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধারণা। দ্বিতীয়ত, এটাও দেখাতে হবে যে, দেশ কোনো সামান্য ধারণা নয়, তা আসলে ইন্দ্রিয়ানুভব। সুতরাং দেশ-এর আধিবিদ্যক ব্যাখ্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল এটা প্রমাণ করা যে, দেশ হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব অনুভব বা বিশুদ্ধ অনুভব। কান্ট এই প্রসঙ্গে চারটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম যুক্তি - 'দেশ' বাহ্য অভিজ্ঞতা (outer experience) থেকে লব্ধ কোনো লৌকিক ধারণা (empirical concept) নয়। দেশ-এর বোধ হল পূর্বতসিদ্ধ, এটি কোনো পরতঃসাধ্য সামান্য ধারণা নয়। আমাদের বাহ্য অভিজ্ঞতাগুলি সর্বদাই দেশ-এর আকারে আকারিত হয়েই গৃহীত হয়। সেক্ষেত্রে দেশ-এর অভিজ্ঞতা-পূর্ব অস্তিত্ব স্বীকার না করলে বাহ্যবস্তুর অনুভব সম্ভব হবে না। সুতরাং এমন বলা যাবে না যে, বাহ্যবস্তুসমূহের দৈশিক সম্বন্ধ থেকে দেশ-এর বোধ উপস্থাপিত হয়। বরং দেশ-এর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় বলেই বাহ্যবস্তুর অভিজ্ঞতা সম্ভব হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় যুক্তি - 'দেশ'-এর বোধ হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধারণা, কারণ তা অনিবার্য, অর্থাৎ সমস্ত বাহ্য অনুভবের অবশ্যস্বীকার্য শর্ত। আমরা জানি যা কিছু অনিবার্য তা অবশ্যই অভিজ্ঞতা-পূর্ব। দেশ-এর ধারণার অনিবার্যতা বা অভিজ্ঞতা-পূর্ব হওয়ার সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এমন কোনো বাহ্যবস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা যায় না, যা দৈশিক নয়। যদিও বস্তুহীন দেশ-এর কথা চিন্তা করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

তৃতীয় যুক্তি - 'দেশ'-এর বোধ হল একপ্রকার শুদ্ধ অনুভব। তা কোনো সামান্য ধারণা নয়। অভিজ্ঞতালব্ধ সামান্য ধারণাগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রত্যক্ষের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। দেশ-এর ধারণা বা বোধ সেইজাতীয় নয়। অনেকে মনে করেন যে, খণ্ড

^৪ Ibid, pp. 174-5.

খণ্ড দেশ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে দেশের সামান্য ধারণা গড়ে ওঠে। আসলে দেশ এক। দৈনন্দিন ব্যবহারের সুবিধার্থে তার অংশ আছে এইরূপ চিন্তা করা গেলেও, দেশ বহু এমন চিন্তা করা যায় না। সেক্ষেত্রে যা বহু নয় এক, তার কোনো সামান্য ধারণাও থাকতে পারে না। সুতরাং দেশ হল শুদ্ধ অনুভব।

চতুর্থ যুক্তি - ‘দেশ’ হল এক অনন্ত বা সীমাহীন বিস্তৃতির বোধ। আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি যে, বিশেষ বিশেষ দেশ প্রকৃতপক্ষে এক ও অখণ্ড দেশেরই অংশ, তা কখনোই বহু দেশ-এর গঠনগত উপকরণ (constituents) হতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ দেশ-এর দৃষ্টান্তের দ্বারা সামান্যীকরণের মাধ্যমে দেশ-এর সামান্য ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত কখনোই সামান্য ধারণার অংশ হতে পারে না, কিন্তু দেশবোধ-এর ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ দেশ বাস্তবে এক দেশেরই অংশ। তাই কান্ট-এর মতে দেশ হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব শুদ্ধ অনুভব বা শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভব। এটি কোনো সামান্য ধারণা নয়।

দেশ : অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা^৬

‘দেশ’-এর আধিবিদ্যক ব্যাখ্যাতে কান্ট-এর অভিপ্রায় ছিল দেশকে অভিজ্ঞতা-পূর্ব শুদ্ধ অনুভব বা সকল অনুভবের অভিজ্ঞতা-পূর্ব আকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। তার উপর ভিত্তি করে দেশ-এর অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যায় তিনি দেখাতে চান যে, উক্তপ্রকার অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধারণাকে নীতি হিসাবে স্বীকার করে নিলে, তার থেকে অন্য কোনো অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভাব্যতা বোধগম্য হতে পারে। অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ ধারণাকে পূর্ব থেকে নীতি হিসাবে মেনে না নিলে অন্য কোনো পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান যে সম্ভব তা ব্যাখ্যা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দেশকে যদি পূর্বতসিদ্ধ অনুভব বা অনুভবের পূর্বতসিদ্ধ আকার হিসাবে স্বীকার করা না হয়, তাহলে জ্যামিতিক যে সমস্ত পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান আমরা লাভ করে থাকি, তার সম্ভাব্যতার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। জ্যামিতিক বচনগুলি হল সংশ্লেষক এবং অভিজ্ঞতা-পূর্ব। সেই কারণে এগুলি একইসঙ্গে তথ্যজ্ঞাপক ও অনিবার্য। যেমন,

^৬ Ibid, p. 176.

‘সরলরেখা হল দুটি বিন্দুর মধ্যে স্বল্পতম দূরত্ব’ বা ‘ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান’- এইজাতীয় জ্যামিতিক বচনগুলি সংশ্লেষক, কারণ এই বচনগুলির উদ্দেশ্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে বিধেয়ের ধারণা পাওয়া যায় না। একইভাবে ‘দেশ হল ত্রিমাত্রিক’- এই জ্যামিতিক বচনটি দেশ-এর সংশ্লেষণাত্মক ও অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধর্মকে প্রমাণ করে, যেহেতু জ্যামিতি হল দেশ-এর ধর্ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান, তাই জ্যামিতিক বচনগুলির অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক ধর্মগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে পূর্ব থেকেই দেশকে শুদ্ধ অনুভব হিসাবে স্বীকার করাটা আবশ্যিক। দেশ শুদ্ধ অনুভব হওয়ার কারণেই জ্যামিতিক বচনগুলি সংশ্লেষক হয়ে থাকে। সামান্য ধারণা থেকে কখনোই সংশ্লেষক জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। এইভাবে দেশ-এর অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যায় কান্ট প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, দেশ হল শুদ্ধ অনুভব বা অনুভবের শুদ্ধ আকার। তা কখনোই সামান্য প্রত্যয় বা ধারণা হতে পারে না।

কাল : আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা^৬

কাল-এর ধারণার আধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় কান্ট ‘দেশ’-এর অনুরূপ যুক্তির উপস্থাপনাপূর্বক দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, কাল হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব শুদ্ধ অনুভব বা অনুভবের শুদ্ধ আকার। এই প্রসঙ্গে কান্ট প্রদত্ত যুক্তিগুলি লক্ষ করা যেতে পারে।

প্রথম যুক্তি - ‘কাল’-এর ধারণা কোনো লৌকিক ধারণা নয়, ফলত তা কোনো অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসৃত হয় না। কালের বোধ হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব অনুভব, সেটি কোনো অভিজ্ঞতালব্ধ সামান্য ধারণা নয়। কারণ এই বোধ পূর্ব থেকে না থাকলে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতাই উৎপন্ন হতে পারবে না। প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমাদের যে সহাবস্থান বা পূর্বাপর কালিক সম্বন্ধের বোধ হয়, তা ব্যাখ্যার জন্য কালের অভিজ্ঞতা-পূর্ব উপস্থাপনা একান্ত আবশ্যিক। সুতরাং ঘটনাসমূহের পারস্পরিক কালিক সম্বন্ধের দ্বারা কালের বোধ হয় না। বরং কালের বোধ পূর্ব থেকে আছে বলেই ঘটনাসমূহের অভিজ্ঞতা উপস্থাপিত হয়।

^৬ Ibid, pp. 176-9.

দ্বিতীয় যুক্তি - 'কাল'-এর বোধ হল এমন এক অনিবার্য উপস্থাপনা, যা সমস্ত অনুভবের পূর্বেই বিদ্যমান থাকে। এমন কোনো জগতের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করা যায় না, যেখানে কাল নেই। আমাদের যাবতীয় বাহ্য ও আন্তর অবভাসের মূলে আছে এই কালবোধ। সকল অনুভবই কালিক সম্বন্ধে অবভাসিত হয়। সেক্ষেত্রে যদি পূর্ব থেকে কাল-এর বোধ আমাদের না থাকে, তাহলে কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভবপর হবে না। এক্ষেত্রে সর্ব ঘটনা বর্জিত শূন্যগর্ভ কাল-এর কথা চিন্তা করা গেলেও, কালশূন্য অনুভবের কথা চিন্তা করা যায় না। কালিক আকারে আকারিত না হয়ে কোনোকিছুই আমাদের অনুভবের বিষয়রূপে অবভাসিত হতে পারে না। সুতরাং কালবোধ হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব ও অনিবার্য।

তৃতীয় যুক্তি - 'কাল' হল এক অখণ্ড ধারণা। কাল যেমন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন, খন্ডিত কালিক এককের সমষ্টি নয়, আবার এমনও নয় যে, কতকগুলি খণ্ড খণ্ড কাল প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কালের সামান্য ধারণা গঠিত হয়। কাল হল শুদ্ধ অনুভব, এবং যাবতীয় অনুভবের শুদ্ধ আকার। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয় যে, 'বিভিন্ন কাল যুগপৎ উৎপন্ন হতে পারে না' - তাহলে কাল সংক্রান্ত এই বচনটি সংশ্লেষণাত্মক হবে। কারণ এই বচনটির উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয়ের ধারণাকে পাওয়া যায় না। এটি একইসঙ্গে অনিবার্য এবং অভিজ্ঞতা-পূর্ব। উক্ত বচনটিকে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ কোনো সম্ভাব্য ধারণা থেকে লাভ করা যায় না। তাছাড়া যা এক, তাকে জানার একমাত্র উপায় হল ইন্দ্রিয়ানুভব। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কাল বোধ হল এক অভিজ্ঞতা-পূর্ব শুদ্ধ অনুভব।

চতুর্থ যুক্তি - 'কাল' হল অসীম এবং কালের বোধ হল এক অসীমতার বোধ। বিশেষ বিশেষ খণ্ডকাল প্রকৃতপক্ষে এক অখণ্ড কালের অংশ মাত্র, কিন্তু কখনোই উপাদান নয়। এক্ষেত্রে কালের অংশগুলি এক অখণ্ড কালের সীমানা নির্ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে কান্ট-এর বক্তব্য হল - সমগ্র যদি অংশের পূর্ববর্তী না হয়, অর্থাৎ অখণ্ড, অসীম কালের অভিজ্ঞতা-পূর্ব অনিবার্য ধারণা যদি স্বীকার করা না হয়, তাহলে কালিকভাবে

সীমিত কোনো ইন্দ্রিয়ানুভবের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং কাল হল এক শুদ্ধ অনুভব।

কাল : অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা^১

‘কাল’ বোধের অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যায় কান্ট দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, কাল বোধকে পূর্বতসিদ্ধ অনুভবরূপে গণ্য করে না নিলে, পাটিগণিতের পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা করা যাবে না। কাল সংক্রান্ত আলোচনায় এক্ষেত্রে এমন কতকগুলি বচনের কথা উল্লেখ করা যায়, যেগুলি একইসঙ্গে সংশ্লেষক ও পূর্বতসিদ্ধ। যেমন বলা হয় যে, ‘কালের কেবল একটি মাত্রা আছে, তা হল পরিবর্তন বা গতি’। এইস্থলে কোনোকিছুর পরিবর্তন বা গতির পূর্বশর্ত হিসাবে যদি কাল বোধকে স্বীকার করা না হয়, তাহলে পরিবর্তন বা গতির কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না। উক্ত বচনটি পূর্বতসিদ্ধ, কারণ সেটি সার্বিক এবং অনিবার্যভাবে সত্য। আবার একইসঙ্গে তা সংশ্লেষকও বটে, কারণ কালের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে একমাত্রার ধারণা লাভ করা যায় না।

কান্টের মতানুসারে কালবোধ অভিজ্ঞতা-পূর্ব এবং সংশ্লেষক হওয়ার জন্য, কাল সংক্রান্ত পাটিগণিতের বচনসমূহও আবশ্যিকভাবে সত্য এবং তথ্যজ্ঞাপক হয়ে থাকে। কালবোধ যদি সামান্য ধারণা হত, তাহলে সেটিকে বিশ্লেষণ করে কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যেত না। এটি শুদ্ধ অনুভব বলেই, কালনির্ভর পাটিগণিতের বচনগুলি পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক হয়ে থাকে। তাই কালবোধ কখনোই অভিজ্ঞতালব্ধ সামান্য ধারণা হতে পারে না, তা হল সংবেদনের অভিজ্ঞতা-পূর্ব আকার। কান্ট এটিকেও শুদ্ধ অনুভব বলেছেন।

দেশ ও কালের আধিবিদ্যক ও অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যার ভিত্তিকে কান্ট সিদ্ধান্তস্বরূপ বলেন যে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেশ ও কাল বাস্তব (real) হলেও, অতীন্দ্রিয় দিক থেকে সেগুলি মনোগত। দেশ ও কালের মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতায় যা প্রদত্ত হয় তা হল বস্তুর অবভাসিত রূপ। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার বিষয় মাত্রই তা দৈশিক এবং কালিক

^১ Ibid, pp. 179-80.

হয়ে থাকে। সেই অর্থে দেশ ও কাল হল বাস্তব। আবার অবভাস অতিরিক্তভাবে স্বগতসত্তাক বস্তুর পরিসরে এগুলি প্রযুক্ত হতে পারে না। তাই অতীন্দ্রিয় দিক থেকে দেশ ও কালের মনোগত সত্তা স্বীকার করাই সমীচীন।

সংবেদনের দুটি আকার দেশ ও কালের আধিবিদ্যক ও অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা প্রদান করার পর, কান্ট বৌদ্ধিক প্রকারগুলির আধিবিদ্যক ও অতীন্দ্রিয় প্রমাণ কীভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তা জানা প্রয়োজন। বৌদ্ধিক প্রকারের আধিবিদ্যক প্রমাণে (metaphysical deduction) কান্ট দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, সেগুলির উৎপত্তি ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা গঠন করা কীভাবে সম্ভব। অপরদিকে অতীন্দ্রিয় প্রমাণে (transcendental deduction) উক্ত বৌদ্ধিক প্রকারগুলি ইন্দ্রিয়ানুভাবে প্রাপ্ত বস্তুর উপর কীভাবে প্রযুক্ত হতে পারে সেই সম্পর্কিত যুক্তি প্রদান করাই তাঁর একমাত্র অভিপ্রায়।

বৌদ্ধিক প্রকার : আধিবিদ্যক প্রমাণ^৮

বৌদ্ধিক প্রকারের আধিবিদ্যক প্রমাণে কান্ট বোধশক্তির যাবতীয় শুদ্ধ প্রত্যয়ের সূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। এই আধিবিদ্যক প্রমাণ তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত/বিন্যস্ত। প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় হল, বোধশক্তির যুক্তিবৈজ্ঞানিক প্রয়োগ (logical use of the understanding in general)। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অবধারণে বোধশক্তির যুক্তিবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া (logical function of the understanding in judgments) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে বৌদ্ধিক প্রকারগুলি (categories) আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : বোধশক্তির যুক্তিবৈজ্ঞানিক প্রয়োগ (the logical use of the understanding)

বোধশক্তি হল জ্ঞানের এমন এক বৃত্তি বা শক্তি যা প্রত্যয়ের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়। এটি যেহেতু সংবেদনশক্তি থেকে ভিন্ন, তাই সংবেদনশক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবেদন

^৮ Ibid, pp. 204-15.

বা ইন্দ্রিয়ানুভবের উপর ভিত্তি করে বোধশক্তি কোনো ক্রিয়া করতে পারে না। এই বোধশক্তি হল অবধারণের বৃত্তি বা শক্তি। বোধশক্তির কাজ হল প্রত্যয়গুলির মাধ্যমে অবধারণ করা। সুতরাং অবধারণ হল বোধশক্তির ক্রিয়া। প্রত্যয় এইরূপ বোধশক্তির ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল এবং অবধারণের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে প্রতিটি অবধারণের জন্য আমরা এমন এক প্রত্যয় ব্যবহার করে থাকি যা বহু প্রতীতি বা উপস্থাপনা (representation) সম্পর্কে সত্য। এইরূপ প্রত্যয় আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে প্রাপ্ত যেকোনো বিষয়কে বোঝানোর জন্য নির্দিষ্ট করতে পারি। যেমন, ‘এটি হয় একটি কলম’ - এই অবধারণে ‘কলম’ প্রত্যয়টি শুধুমাত্র বর্তমান ইন্দ্রিয়ানুভব প্রসঙ্গে প্রযোজ্য - তা নয়। এটি ‘কলম’-এর অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভব সম্পর্কেও সত্য।

কান্টের মতে অবধারণ করার অর্থ হল আমাদের বিভিন্ন রকমের প্রত্যয়গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। অবধারণ আমাদের প্রত্যয়গুলিকে তার প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে, যে বিভিন্ন উপায়ে ঐক্যবদ্ধ করে, সেই উপায়গুলিই হল অবধারণের বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং অবধারণের প্রকারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেতে হলে, বোধশক্তি যে বিভিন্ন উপায়ে অবধারণের মাধ্যমে প্রত্যয়কে ঐক্যবদ্ধ করে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা গঠন করা প্রয়োজন। সেটিই হবে বোধশক্তির ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ তালিকা যা থেকে আমরা বৌদ্ধিক প্রকারের তালিকা নিরূপণ করতে সক্ষম হব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অবধারণে বোধশক্তির যুক্তিবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া (the logical function of the understanding in judgment)

কান্ট যেভাবে অবধারণ বা বচনের শ্রেণীবিভাগ করতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে তৎকালীন ধ্রুপদী আকারনিষ্ঠ যুক্তিবিজ্ঞানের বচন বা অবধারণের যে শ্রেণীবিভাগ, তা কিয়দংশে ভিন্ন। তিনি পরিমাণ, গুণ, সম্বন্ধ ও নিশ্চয়তা বা অবস্থাতেই অবধারণকে প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলির প্রতিটি আবার তিনভাগে বিভক্ত। সেই অনুযায়ী অবধারণের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা কীরূপ হতে পারে তা লক্ষ করা যেতে পারে।

পরিমাণ (quantity) অনুসারে তিনপ্রকার অবধারণ হল :

সামান্য (universal) অবধারণ - সকল মানুষ হয় বুদ্ধিমান জীব।

বিশেষ (particular) অবধারণ - কোনো কোনো দার্শনিক হয় জ্ঞানী।

ঐকিক (singular) অবধারণ - নিউটন হন একজন বিজ্ঞানী।

গুণ (quality) অনুসারে তিনপ্রকার অবধারণ হল :

সদর্থক (affirmative) অবধারণ - কাক হয় কালো।

নঞর্থক (negative) অবধারণ - পশু হয় বোকা।

অসীম (infinite) অবধারণ - পাতাটি হয় অ-সবুজ।

সম্বন্ধ (relation) অনুসারে তিনপ্রকার অবধারণ হল :

নিরপেক্ষ (categorical) অবধারণ - বরফ হয় সাদা।

সাপেক্ষ (hypothetical) অবধারণ - যদি মেঘ জমে তাহলে বৃষ্টি হবে।

বৈকল্পিক (disjunctive) অবধারণ - রাজ হয় কলতায় অথবা দিল্লীতে আছে।

অবস্থা (modality) অনুসারে তিনপ্রকার অবধারণ হল :

সম্ভাব্য (problematic) অবধারণ - সুমন হয়তো ভালো ছেলে।

ঘোষক (assertory) অবধারণ - ধীমান হয় জ্ঞানী।

অনিবার্য (apodictic) অবধারণ - মানুষ অবশ্যই ধার্মিক।

উপরোক্ত তালিকাটি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞানের অবধারণ বা বচনের যে শ্রেণীবিভাগ তার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কান্ট সহমত হলেও, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মতানৈক্য প্রদর্শন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দু-একটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞানে ঐকিক বচন, সামান্য বচনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু কান্ট এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। তাঁর মতে সামান্য বচনে বিধেয় সমগ্র শ্রেণী সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু ঐকিক বচনে বিধেয় একটি বিশেষ ব্যক্তি বা একক সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। সেই কারণে সামান্য ও ঐকিক এই দুই ধরনের বচন বা অবধারণকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। একইভাবে তিনি প্রচলিত

যুক্তিবিজ্ঞানের অসীম বচনকে সদর্থক বচন হিসাবে গ্রহণ করেননি। এই প্রসঙ্গে কান্ট-এর বক্তব্য হল আমরা অসীম বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়'র সম্পর্ককে যেভাবে প্রকাশ করতে চাই, সেক্ষেত্রে বিধেয়'র ব্যাপ্তি এতটাই প্রসারিত যে, তার মাধ্যমে উদ্দেশ্য'র যথাযথ পরিচয় ব্যক্ত হয় না। একটি অসীম বচনের উদাহরণ হল - 'পাতাটি হয় অ-সবুজ'। এক্ষেত্রে যদি বলা হয় 'পাতাটি হয় সবুজ', তাহলে উদ্দেশ্যটি সবুজের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি বলা হয় 'পাতাটি নয় সবুজ', তাহলে উদ্দেশ্য সবুজের পরিধি থেকে বহির্ভূত হয়। আমরা জানি এই দুটি বচনে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথাযথ পরিচয় প্রকাশিত হয়ে থাকে, কিন্তু যদি বলা হয় 'পাতাটি হয় অ-সবুজ', তাহলে উদ্দেশ্যটিকে সবুজের পরিধি থেকে বহিষ্কার করে অ-সবুজের পরিধিতে স্থান দেওয়া হয় ঠিকই, যদিও এক্ষেত্রে অ-সবুজের ব্যাপকতা অসীমতার তুল্য হয়ে থাকে। সেই কারণে এইজাতীয় বচন বা অবধারণে বিধেয় অসীম হওয়ার জন্য উদ্দেশ্য'র যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় না। 'অ-সবুজ' বলতে 'সবুজ' ছাড়া জগতের বাকি সব পদার্থই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যা অসীমতার নামান্তর। অসীম বচনে আমরা আসলে সদর্থক বচনের মতোই উদ্দেশ্যটি কী সেটা বলতে চাই, কিন্তু এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, অর্থাৎ বিধেয়টি এমন হয়ে থাকে যে, তা প্রকৃত অর্থেই সীমাহীনতাকে নির্দেশ করে। এই কারণে কান্ট অসীম বচনকে, সদর্থক বচনের অনুরূপ হিসাবে গ্রহণ না করে সেটিকে অনন্য হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বোধশক্তির শুদ্ধ প্রত্যয় বা বৌদ্ধিক প্রকার (the pure concepts of the understanding or categories)

কান্ট সংবেদনশক্তির মাধ্যমে পাওয়া সংবেদন বা ইন্দ্রিয়ানুভব এবং বোধশক্তির দ্বারা গঠিত প্রত্যয় উভয়কেই জ্ঞানের অপরিহার্য বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমরা জানি সংবেদন বা ইন্দ্রিয়ানুভবে যা পাওয়া যায় তা বিশৃঙ্খল, বিচ্ছিন্ন, বহুতা মাত্র। এক্ষেত্রে বোধশক্তি বা বুদ্ধির কাজ হল এইসমস্ত সংবেদনলব্ধ বহুতাকে সুসম্বন্ধ ও একত্রিত করে জ্ঞানের বিষয় গঠন করা। সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বুদ্ধি এই কাজ সম্পন্ন করে। কান্ট-এর মতে বুদ্ধির এই ক্রিয়া প্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, এবং

এটি অবধারণের ক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং বিভিন্ন অবধারণ কার্যত বিভিন্ন সংশ্লেষণ ক্রিয়াকেই নির্দেশ করে। এই কারণেই কান্ট, প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞানের অবধারণের তালিকা থেকেই সমসংখ্যক শুদ্ধ প্রত্যয় বা বৌদ্ধিক প্রকার নিঃসৃত করা সম্ভব বলে মনে করেছেন। কোন্ অবধারণ থেকে কোন্ বৌদ্ধিক প্রকার আমরা লাভ করে থাকি তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা উল্লেখ করা যেতে পারে। কান্ট এই প্রসঙ্গে বারোটি অবধারণ থেকে মোট বারোটি বৌদ্ধিক প্রকার নিঃসৃত করেছেন। তালিকাটি নিম্নে উল্লিখিত হল।

অবধারণ

বৌদ্ধিক প্রকার

পরিমাণ

সামান্য (universal)

সমগ্রত্ব (totality)

বিশেষ (particular)

বহুত্ব (plurality)

ঐকিক (singular)

একত্ব (unity)

গুণ

সদর্থক (affirmative)

সত্তা (reality)

নঞর্থক (negative)

অসত্তা (unreal)

অসীম (infinite)

সীমাবদ্ধতা (limitation)

সম্বন্ধ

নিরপেক্ষ (categorical)

দ্রব্য ও কর্ম

(substance and accident)

সাপেক্ষ (hypothetical)

কার্য ও কারণ (cause and effect)

বৈকল্পিক (disjunctive)

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া (community)

অবস্থা

সম্ভাব্য (problematic)

সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা

(possibility and impossibility)

ঘোষণক (assertory)

অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব

(existence and non-existence)

অনিবার্য (apodictic)

অনিবার্যতা ও অনিশ্চয়তা

(necessity and contingency)

এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত বারোটি বৌদ্ধিক প্রকারকে কান্ট মূলত দুটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি ভাগ হল গাণিতিক (mathematical) এবং অপরটি হল যান্ত্রিক (dynamical) বা গতিশীল। পূর্বে উল্লিখিত ওই বারোটি প্রকারের মধ্যে প্রথম ছয়টি, অর্থাৎ পরিমাণ ও গুণভিত্তিক বৌদ্ধিক প্রকার বা শুদ্ধ প্রত্যয়গুলি ইন্দ্রিয়ানুভবে পাওয়া বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং এগুলির দ্বারা বিষয়ের নিজস্ব রূপ প্রকাশিত হয়। বাকি ছয়টি, অর্থাৎ সম্বন্ধ ও অবস্থাভিত্তিক বৌদ্ধিক প্রকারগুলি বিষয়ের কোনো না কোনো সম্পর্কে প্রকাশ করে থাকে। সেই সম্পর্ক বস্তু বা বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক হতে পারে, আবার তা বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্কেও নির্দেশ করতে পারে। যাই হোক প্রথম ছয়টি বৌদ্ধিক প্রকারকে কান্ট গাণিতিক এবং অবশিষ্ট ছয়টি বৌদ্ধিক প্রকারকে যান্ত্রিক নামে অভিহিত করেছেন।

বৌদ্ধিক প্রকার : অতীন্দ্রিয় প্রমাণ

বৌদ্ধিক প্রকারের অতীন্দ্রিয় প্রমাণে প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞানের অবধারণগুলি থেকে নিঃসৃত বারোটি বৌদ্ধিক প্রকারের প্রয়োগের যথার্থতা প্রমাণ করাই হল কান্ট-এর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর মতে বৌদ্ধিক প্রকারের প্রয়োগ না হলে কোনো বিষয়ের বস্তুগত অভিজ্ঞতা অসম্ভব হয়ে পড়বে, এবং এইস্থলে এমন দাবি করাও যুক্তিসঙ্গত নয় যে, বৌদ্ধিক প্রকারের যথার্থতা তার প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত হয়ে থাকে। সুতরাং সকল বৌদ্ধিক প্রকার যেগুলি কিনা অভিজ্ঞতা-পূর্ব, সেগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় সম্পর্কে কীভাবে প্রযুক্ত হতে পারে তার প্রমাণ আবশ্যিক। এযাবৎ আমরা জানি যে, যা কিছু অভিজ্ঞতা-পূর্ব, তাকে জানার একমাত্র উপায় হল অতীন্দ্রিয় প্রমাণ।^৯

বৌদ্ধিক প্রকারের অতীন্দ্রিয় প্রমাণ দুই প্রকার, একটি হল বিষয়গত বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ (objective) এবং অপরটি হল বিষয়ীগত বা ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective)। এক্ষেত্রে ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রমাণের যুক্তি হল এই যে, যদি বৌদ্ধিক প্রকারের বস্তুগত যথার্থতা স্বীকার করা না হয়, তাহলে অভিজ্ঞতার বস্তু সম্পর্কে কোনো

^৯ “...the explanation of the way in which concepts can relate to objects *a priori* their transcendental deduction,...”, Ibid, p. 220.

চিন্তাই সম্ভবপর হবে না। কারণ অভিজ্ঞতার কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে তা শুধুমাত্র বৌদ্ধিক প্রকারের মাধ্যমেই করা সম্ভব। অন্যদিকে বিষয়ীগত বা ব্যক্তিসাপেক্ষ প্রমাণের উদ্দেশ্য হল বৌদ্ধিক প্রকারগুলি কীভাবে অভিজ্ঞতার কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে তার ব্যাখ্যা দান করা। কান্টের মতে বৌদ্ধিক প্রকারগুলি হল বোধশক্তির ধর্ম। তাই এগুলি শুধুমাত্র চিন্তনের শক্তি, সেগুলি জ্ঞানেরও শক্তি। সেই জ্ঞান অবশ্যই অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান। বৌদ্ধিক প্রকারগুলি কীভাবে এইরূপ জ্ঞানের শক্তি হতে পারে, সেই ব্যাখ্যা প্রদান করাই ব্যক্তিসাপেক্ষ প্রমাণের কাজ। যদিও এই দুই ধরনের প্রমাণ অত্যন্ত ভিন্ন নয়, বরং একটি অপরটির পরিপূরক।^{১০}

এখন দেখা প্রয়োজন যে, কীভাবে বা কোন্ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৌদ্ধিক প্রকারগুলো বাহ্যপদার্থের অনুভবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জ্ঞানের বিষয় গঠন করে। আমরা কেবল অনুভবের দ্বারা যা লাভ করি তা জ্ঞান পদবাচ্য নয়। অনুভবলব্ধ পদার্থে যখন বৌদ্ধিক প্রকার প্রযুক্ত হয় তখনই তা লৌকিক জ্ঞানের বিষয় হয়ে ওঠে। বিষয় ছাড়া জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এবং জ্ঞানের বিষয়কে অনুভবের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। যদিও বৌদ্ধিক প্রকারগুলি অনুভবগম্য বিষয়ে কী উপায়ে যুক্ত হবে তার প্রমাণ ও যথার্থতা নিরূপণ আবশ্যিক। প্রাকৃত বা লৌকিক জ্ঞানে আদৌ বৌদ্ধিক প্রকার যুক্ত হয়ে থাকে কিনা তা দেখানোটা অতীন্দ্রিয় প্রমাণের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রমাণের উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে, বৌদ্ধিক প্রকার ব্যতিরেকে লৌকিক জ্ঞানই সম্ভবপর হতে পারে না। সেক্ষেত্রে কোনো পদার্থকে লৌকিক জ্ঞানের বিষয় হতে গেলে, সেই পদার্থকে আবশ্যিকভাবে বৌদ্ধিক প্রকারে আকারিত হতেই হবে। এইরূপ বৌদ্ধিক প্রকার যেহেতু বুদ্ধি বা বোধশক্তির নিজস্ব ধর্ম, তাই সেগুলির অভিজ্ঞতা-পূর্ব অস্তিত্ব স্বীকারে কোনো বাধা থাকে না। একইভাবে কোনো বিষয়ের অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানও সার্বত্রিকভাবে সম্ভব হয়ে যায়। কারণ যেকোনো বিষয়ই বৌদ্ধিক প্রকার ধারণ না করে জ্ঞানের বিষয় হয়ে উঠতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, একথার অর্থ এমন নয় যে, বৌদ্ধিক প্রকার

^{১০} রাসবিহারী দাস, *কান্টের দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৫৯।

ধারণা না করে কোনো বস্তু অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কান্টের মতে বস্তুর অস্তিত্বশীলতা এবং তার জ্ঞান পদবাচ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ব্যাপার।

বৌদ্ধিক প্রকারগুলি জ্ঞানের বিষয়ের উপর কীভাবে ক্রিয়া করে তা বুঝতে হলে প্রথমেই জেনে নেওয়া আবশ্যিক যে জ্ঞান কী? এই প্রশ্নে কান্ট মনে করেন যে, জ্ঞান হল এক ঐক্য বা সমগ্রতা (unity or whole)। আমরা জানি লৌকিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাদান হল ইন্দ্রিয়ানুভব এবং জ্ঞানের অন্তিম উপাদান হল এইপ্রকার অনুভবলব্ধ বহুতা। এক্ষেত্রে বোধশক্তির কাজ হল এই বহুতাকে সমন্বিত করে ঐক্যবিধান করা। বোধশক্তির এইরূপ ক্রিয়াকে বলা হয় সংশ্লেষণ (synthesis)। এইজাতীয় সংশ্লেষণ বোধশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার জন্য সম্ভব হয়ে থাকে। কান্ট এই প্রশ্নে তিনপ্রকার সংশ্লেষণের উল্লেখ করেছেন।^{১১} সেগুলি হল -

- ১) অনুভবে গ্রাহনিক সংশ্লেষণ (the synthesis of apprehension in intuition)
- ২) কল্পনায় স্মারনিক সংশ্লেষণ (the synthesis of reproduction in the imagination)
- ৩) প্রত্যয়ে প্রত্যভিজ্ঞার সংশ্লেষণ (the synthesis of recognition in the concept)

উক্ত তিনপ্রকার সংশ্লেষণ প্রকৃতপক্ষে বোধশক্তির একই সংশ্লেষণাত্মক ক্রিয়ার (synthetic activity) তিনটি দিক মাত্র। বস্তুত কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হতে গেলে ওই তিনটি সংশ্লেষণই আবশ্যিক। এইপ্রকার সংশ্লেষণ লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক যেকোনো ধরনের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। কান্টকে অনুসরণ করে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। এই বর্ণনার মাধ্যমেই বুঝে নেওয়া যাবে জ্ঞানের বিষয় কীভাবে বিষয়জ্ঞানে পরিণত হয়ে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে পরিপূর্ণ করে তোলে।

^{১১} Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, 1998, pp. 228-31.

অনুভবে গ্রাহণিক সংশ্লেষণ

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, ইন্ডিয়ানুভব বা সংবেদনে যা পাওয়া যায় তা হল বহুতা। বুদ্ধি এই বহুতাকে একত্রে গ্রহণ করে ঐক্যবিধান করে বা বলা যেতে পারে এক প্রতীতি গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে এক বা সমগ্রের প্রতীতি গড়ে তোলা তখনই সম্ভব হবে, যখন তার বিভিন্ন ভাগ বা খণ্ডের অনুভব হয়ে থাকে। বুদ্ধির প্রাথমিক কাজই হল এইসমস্ত বিভিন্ন ভাগগুলিকে একত্রিত করা। এটাই হল প্রাথমিক সংশ্লেষণ। কান্ট এইপ্রকার সংশ্লেষণকে ‘অনুভবে গ্রাহণিক সংশ্লেষণ’ নামে অভিহিত করেছেন। এইস্থলে বিভিন্ন ভাগ অনুভবেই একসঙ্গে সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হয় বলেই এইপ্রকার নামকরণ করা হয়ে থাকে।

কল্পনায় স্মারণিক সংশ্লেষণ

কান্ট-এর মতে ইন্ডিয়ানুভবলব্ধ যে বহুতা তা কখনোই একসঙ্গে জ্ঞাতার মনে উপস্থিত হতে পারে না। তাহলে সেটিকে বহুতা বলাটা অর্থহীন হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাগের অনুভব একটির পর একটি হিসাবেই উপস্থাপিত হয়ে থাকে। এইস্থলে প্রশ্ন হল - যদি একটি ভাগের অনুভবের পরই অন্য আর একটি ভাগের অনুভব হয়, এবং এই পরম্পরায় যখন শেষ ভাগের অনুভব হয়, তখন যদি তার পূর্বের ভাগগুলির অনুভব আর না হয়, তাহলে এমতাবস্থায় বুদ্ধি সব ভাগগুলিকে একত্রে গ্রহণ করে কীভাবে? কারণ কালের নিয়মে সব ভাগগুলি তো কখনোই একসঙ্গে অনুভূত হতে পারে না। তাই কান্ট এই প্রসঙ্গে বুদ্ধির অপর একটি ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সেটি হল ‘কল্পনায় স্মারণিক সংশ্লেষণ’। এই প্রক্রিয়ায় বুদ্ধি পূর্বানুভূত ভাগগুলিকে অনুভবের পরেও কল্পনায় স্মরণ করতে পারে। অনুভবের সব ভাগকে যদি একত্রিত করে ঐক্যবিধান করতে হয়, তাহলে পূর্বানুভূত ভাগগুলিকে কল্পনায় পুনরুৎপাদন করে, সেটিকে বর্তমান অনুভবের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে, ইন্ডিয়ানুভূত বহুতার ঐক্যসাধন সম্ভবপর হবে না। সুতরাং অনুভবে গ্রাহণিক সংশ্লেষণের জন্য কল্পনায় স্মারণিক সংশ্লেষণও আবশ্যিক। এক্ষেত্রে স্মরণের মাধ্যমেই সব ভাগের একইসঙ্গে গ্রহণ সম্ভব হয়। ফলে বহু প্রতীতির একত্রীকরণ ঘটে।

প্রত্যয়ে প্রত্যভিজ্ঞার সংশ্লেষণ

মানুষের বোধশক্তি স্বতঃক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেগুলির মধ্যে অনুভবে গ্রাহনিক সংশ্লেষণ এবং কল্পনায় স্মরণিক সংশ্লেষণে দেখা গেল যে, ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ বহুতা কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। এখন প্রশ্ন হল, যে বিষয়ের অনুভবে গ্রহণ হয়েছে, সেই বিষয়েরই কল্পনায় স্মরণ হয় কিনা তা বোঝা যাবে কীভাবে? কারণ যে বিষয়ের অনুভব হয় সেই বিষয়ের স্মরণ হওয়াটা বিষয়জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবশ্যিক। সুতরাং কল্পনায় বা স্মৃতিতে যে বিষয়ের প্রতীতি উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়টিকে যদি পূর্বানুভূত প্রতীতি হিসাবে চিনতে পারা না যায়, তাহলে বিষয়জ্ঞান সম্ভবপর হবে না। এইস্থলে বুদ্ধি অপর এক সংশ্লেষণ ক্রিয়ার মাধ্যমে অনুভূতি ও স্মৃতির মধ্যে ঐক্যসাধন করে থাকে। কান্ট এইপ্রকার সংশ্লেষণ ক্রিয়াকে ‘প্রত্যয়ে প্রত্যভিজ্ঞার সংশ্লেষণ’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কান্টের মতানুসারে বহু প্রতীতিকে যখন এক প্রতীতিতে গ্রহণ করা হয় তখন তাকে বলে প্রত্যয়। এইরূপ প্রত্যয় আসলে ‘সামান্যজ্ঞান’-এর নামান্তর। বিষয়জ্ঞান হতে গেলে সেক্ষেত্রে গ্রহণ, স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার একত্র অধিকরণ আবশ্যিক। এক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রতিটি সংশ্লেষণ ক্রিয়াই একটি অপরটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। বুদ্ধির স্বতঃক্রিয়া জন্য যে সংশ্লেষণ, তার ফলে আমরা গ্রহণে এক প্রতীতি লাভ করি, স্মরণে বহু প্রতীতি বা প্রতীতিধারা লাভ করি, এবং তার থেকে প্রত্যভিজ্ঞায় আমরা এক প্রত্যয়ে উপনীত হই। সকল বিষয়জ্ঞানের ক্ষেত্রেই বোধশক্তির এইরূপ ক্রিয়া অপরিহার্য।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হল তা বৌদ্ধিক প্রকারের অতীন্দ্রিয় প্রমাণের বিষয়গত বা ব্যক্তিসাপেক্ষ প্রামাণ্যের অন্তর্গত। এখন দেখে নেওয়া প্রয়োজন যে, বৌদ্ধিক প্রকারের অতীন্দ্রিয় প্রমাণের বিষয়গত বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রামাণ্যের সপক্ষে কান্ট কীভাবে যুক্তি সাজিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, সর্বপ্রকার আবশ্যিকতার মূলে অতীন্দ্রিয় কোনো কারণের স্বীকৃতি অপরিহার্য। কারণ লৌকিক বা প্রাকৃত উপায়ে আমরা কোনো আবশ্যিকতা পাই না। কান্ট যে অতীন্দ্রিয় পদার্থের মাধ্যমে বৌদ্ধিক প্রকারের অতীন্দ্রিয় প্রমাণের বিষয়গত প্রামাণ্যের উৎপত্তিকে যুক্তিযুক্ত করতে সচেষ্ট

হয়েছিলেন সেটি হল ‘অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞান’ (transcendental apperception)^{১২} এটিকে আবার সান্বিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে। এই অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞানই হল কান্টের দর্শনের বিশেষত জ্ঞানতত্ত্বের মূল পরাকাষ্ঠা। এর অনিবার্য উপস্থিতির জন্যই সকল লৌকিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা দান সম্ভবপর হয়। লৌকিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতীতির বোধক যে ‘আমি’ বা ‘আত্মজ্ঞান’, সেই সকল আত্মজ্ঞানের একত্বই হল ‘অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞান’। কান্ট ‘অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞান’, ‘শুদ্ধবুদ্ধি’ বা ‘আমি’ এগুলিকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। বোধশক্তি বা বুদ্ধির বিভিন্ন সংশ্লেষণ ক্রিয়ার মাধ্যমে বহু প্রতীতির মধ্যে যে ঐক্যসাধন সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে বুদ্ধি নিজে বা বুদ্ধিস্বরূপ যে আমি, সেই আমি যদি অভিন্ন না হয়, তাহলে উক্তপ্রকার ঐক্যসাধন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

একথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে যে, বিষয়জ্ঞান হতে গেলে ইন্দ্রিয়ানুভবের গ্রহণ, স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা হল আবশ্যিক শর্ত। এইস্থলে যে ‘আমি’র অনুভবে কোনোকিছুর (বহুতা) গ্রহণ হয়েছে, সেই ‘আমি’র কল্পনায় ওই গৃহীত বিষয়ের স্মরণ এবং উক্ত একই ‘আমি’র গঠিত প্রত্যয়ে প্রত্যভিজ্ঞার উপপাদন একান্ত আবশ্যিক। এইপ্রকার ‘আমি’ হল ‘অতীন্দ্রিয় আমি’ (transcendental ego), যার একত্বের জন্য বিভিন্ন প্রতীতির ঐক্যে বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন হয়। এইরূপ অতীন্দ্রিয় আমি বা আত্মজ্ঞানকে কান্ট স্ব-সম্বিৎ (Self-consciousness) নামেও আখ্যায়িত করেছেন। বিভিন্ন প্রতীতির মধ্যে ঐক্যসাধনের দ্বারা বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন করে বলে আত্মজ্ঞানের এইপ্রকার ঐক্যকে সংশ্লেষক ঐক্য বলা হয়ে থাকে। কান্টের মতে অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞানের বাস্তবিক কোনো সত্তা নেই। সমস্ত প্রকার লৌকিক জ্ঞানের মূলে এর অস্তিত্ব অপরিহার্য হলেও, লৌকিক জ্ঞানের মতো এর কোনো বস্তুগত ভিত্তি নেই, আছে কেবল যুক্তিবৈজ্ঞানিক প্রামাণ্য।

উক্তপ্রকার অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞান হল সার্বিক ও অনিবার্য, তাই তা বিষয়গত। কান্ট মনে করেন, অবধারণের মাধ্যমেই আত্মজ্ঞানের ঐক্যের অধীনে অনুভবলব্ধ বহুতার সংশ্লেষণ ঘটে। আমরা জানি যে, বৌদ্ধিক প্রকারগুলি অবধারণের যুক্তিবৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার ভিত্তিতে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। অনুরূপভাবেই অবধারণের

^{১২} “This pure, original, unchanging consciousness I will now name transcendental apperception,” Ibid, p. 232.

যুক্তিবৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার দ্বারাই বহু প্রতীতি একই আত্মজ্ঞানের ঐক্যে ধরা পড়ে। সুতরাং বলা যেতেই পারে যে, বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক প্রকার হল প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞানের অতীন্দ্রিয় ঐক্যের প্রকারভেদ মাত্র। সেক্ষেত্রে আত্মজ্ঞানের অতীন্দ্রিয় ঐক্য যেহেতু বিষয়গত, তাই বৌদ্ধিক প্রকারের বিষয়গত প্রামাণ্য স্বীকারে কোনো অসুবিধা থাকে না। অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞান স্বীকার না করলে যেমন বিষয়জ্ঞান সম্ভব হবে না, একইসঙ্গে বোধশক্তির প্রকারগুলি বিষয়ে প্রযুক্ত না হলে বিষয়জ্ঞানের উৎপত্তি অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং বিষয়জ্ঞানের উৎপত্তিতে বৌদ্ধিক প্রকারের বিষয়গত প্রামাণ্য বা বস্তুগত যথার্থতা অবশ্য স্বীকার্য।

বৌদ্ধিক প্রকার : সাকারায়ন^{৩০} (schematism of the categories)

পূর্বোক্ত আলোচনায় বিষয়জ্ঞান গঠনে বৌদ্ধিক প্রকারের অপরিহার্যতা প্রশ্নাতীত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। বৌদ্ধিক প্রকারগুলি যেহেতু জ্ঞানের উপাদান বিবর্জিত শুদ্ধ আকার, তাই এইজাতীয় বৌদ্ধিক প্রকারগুলি জ্ঞান গঠনের জন্য কীভাবে ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিরাকার থেকে সাকারায়িত হয়, তা অবশ্য বিবেচ্য একটি বিষয়। আমরা জানি অনুভবলব্ধ বহুতাতে বৌদ্ধিক প্রকার প্রযুক্ত হলে জ্ঞানের বিষয় গঠিত হয়। এইস্থলে প্রশ্ন হল অনুভব ও বুদ্ধি নামক অত্যন্ত ভিন্ন দুটি পদার্থের একত্রীকরণ বা মিলন সম্ভব হয় কী করে? এই প্রশ্নের উত্তরে কান্টকে অনুসরণ করে এমন এক মধ্যবর্তী পদার্থের কথা স্বীকার করা যেতে পারে যার সঙ্গে অনুভব ও বুদ্ধি উভয়ই সম্পর্কযুক্ত। সেই মধ্যবর্তী পদার্থ হল কাল। কালই হল অনুভবের উপাদান বিবর্জিত শুদ্ধ আকার। অনুভব সর্বদাই এই কালিক আকারে আকারিত হয়েই উৎপন্ন হয়, যদিও এইপ্রকার শুদ্ধ আকাররূপ কালের সঙ্গে অনুভবের বিষয়ের কোনো সংমিশ্রণ হয় না।

অন্যদিকে বৌদ্ধিক প্রকারগুলি হল শুদ্ধ প্রত্যয়। বুদ্ধির কাজই হল শুদ্ধ বৌদ্ধিক প্রকার বা প্রত্যয়গুলিকে যুক্তিবৈজ্ঞানিকভাবে নির্ণয় করা। এই বৌদ্ধিক প্রকারগুলি অব্যক্ত ও নিরাকার। এক্ষেত্রে শুদ্ধ বৌদ্ধিক প্রকারগুলি শুধুমাত্র শুদ্ধ কালের সংস্পর্শে

^{৩০} Ibid, pp. 272-3.

আপেক্ষিকভাবে ব্যক্ত হয় এবং সেগুলির সাকারায়ন ঘটে। বৌদ্ধিক প্রকারগুলির এইপ্রকার কালিক রূপদানকেই ‘প্রকারের সাকারায়ন’ (schematism of categories) বলে। একইভাবে বৌদ্ধিক প্রকাররূপ যে শুদ্ধ প্রত্যয় তার কালিক রূপদানকে ‘শুদ্ধ প্রত্যয়ের সাকারায়ন’ (schematism of the pure concept of understanding) বলা হয়ে থাকে। যেহেতু বৌদ্ধিক প্রকারগুলি শুদ্ধ এবং কালও শুদ্ধ পদার্থ। তাই বুদ্ধি ও কাল উভয়ই সজাতীয়। এমতবস্থায় শুধুমাত্র কালই হল অনুভব ও বুদ্ধির মধ্যবর্তী সেই পদার্থ যার মাধ্যমে বুদ্ধির সাকারায়ন ঘটে, এবং বৌদ্ধিক প্রকার বা প্রত্যয়গুলি ইন্দ্রিয়ানুভবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জ্ঞানের বিষয় গঠন করে। আমরা জানি ইন্দ্রিয়ানুভব কখনোই শুদ্ধ নয়। কারণ তা জ্ঞানের অভিজ্ঞতালভ্য উপাদান। আবার বৌদ্ধিক প্রকারগুলি শুদ্ধ, কিন্তু এর প্রয়োগ কেবলমাত্র অভিজ্ঞতালভ্য বিষয়ের পরিসরেই সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে বৌদ্ধিক প্রকারগুলির দ্বারা ইন্দ্রিয়ানুভূতিরূপ জ্ঞানীয় উপাদানগুলি নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকারিত হয় মাত্র। যদিও এইসব বৌদ্ধিক প্রকারগুলি কখনোই সাক্ষাৎভাবে অনুভবে প্রযুক্ত হতে পারে না। সেই কারণে নির্দিষ্ট বৌদ্ধিক প্রকারগুলি প্রথমে কালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারপর অনুভবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যেহেতু অনুভব মাত্রই কালিক, তাই বৌদ্ধিক প্রকারগুলি কালাবচ্ছিন্ন হয়ে, পরোক্ষভাবে অনুভবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, জ্ঞানের বিষয় গঠন করে।

কান্ট-এর মতে কাল হল আমাদের অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়ের আকার বা আকারগত শর্ত। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এক্ষেত্রে বৌদ্ধিক প্রকারগুলি কালের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এবং অন্তঃকরণকে উক্ত বৌদ্ধিক প্রকার অনুসারে শর্তাধীন করার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। ফলত অন্তঃকরণের মাধ্যমে যে সমস্ত অনুভব হবে তার একটা কালিক আকার থাকবে, এবং যার কালিক আকার থাকবে সেই পদার্থে বৌদ্ধিক প্রকার প্রযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকে না। এইস্থলে অন্তঃকরণকে যেভাবে বৌদ্ধিক প্রকার অনুসারে শর্তাধীন করার কথা বলা হয় তা শুধুমাত্র কল্পনা (imagination) দ্বারাই সম্ভব হতে পারে বলে কান্ট-এর অভিমত। অন্তঃকরণের শর্তাধীন হওয়ার প্রক্রিয়াটি এখানে সম্পূর্ণভাবে বিষয় বা উপাদান বিবর্জিত। যেহেতু সব বিষয়জ্ঞানের

পূর্বশর্তরূপে এটি অপরিহার্য, সেহেতু অন্তঃকরণের এইরূপ শর্তাধীন হওয়াটা কোনো বিষয়ের অনুভবের দ্বারা ঘটানো সম্ভবপর নয়। একমাত্র কল্পনার দ্বারাই এইপ্রকার শর্তাধীনতা সম্ভব হতে পারে। তাই কান্টের জ্ঞানতত্ত্বে কল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। এইরূপ কল্পনা দুই প্রকার, একটি হল উদ্বোধনী কল্পনা (reproductive imagination) এবং অপরটি হল উদ্ভাবনী কল্পনা (productive imagination)।

উদ্বোধনী কল্পনা হল সেই কল্পনা, যার সাহায্যে আমরা জ্ঞাত কোনো বিষয়, যেটি আমাদের সামনে উপস্থিত না থাকলেও, তার প্রতিরূপ (image) উৎপন্ন করতে পারি। যেমন - আমরা যদি পূর্বে ঘট প্রত্যক্ষ করে থাকি, তাহলে পরবর্তীকালে সেই ঘট আমাদের সামনে না থাকলেও, কল্পনার সাহায্যে আমরা ওই ঘটের প্রতিরূপ উৎপন্ন করতে পারি। এইজাতীয় কল্পনায় পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুৎপাদন হয় মাত্র। আবার যে কল্পনার সাহায্যে অন্তঃকরণ বৌদ্ধিক প্রকারের দ্বারা শর্তাধীন হয়ে বিষয়জ্ঞানের কারণ হয়, কান্ট সেটিকে উদ্ভাবনী কল্পনা নামে অভিহিত করেছেন। এই কল্পনার দ্বারাই প্রথম বিষয়জ্ঞান সম্ভব হয়ে থাকে। তাঁর মতে উদ্বোধনী কল্পনা হল লৌকিক কল্পনা এবং উদ্ভাবনী কল্পনা হল অতীন্দ্রিয় কল্পনা। কান্ট এটিকে শুদ্ধ কল্পনা রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই অতীন্দ্রিয় শুদ্ধ কল্পনার দ্বারাই বৌদ্ধিক প্রকার কালিক আকার ধারণ করে জ্ঞানের বিষয় গঠন করে।

বৌদ্ধিক মূলসূত্র (supreme principles of understanding)

কান্টকে অনুসরণ করে বৌদ্ধিক প্রকারের সাকারায়নের প্রক্রিয়াটিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত প্রক্রিয়াটি হল আসলে এক যুক্তিবৈজ্ঞানিক বিচার। কারণ বিষয়জ্ঞানে বৌদ্ধিক প্রকার ও ইন্দ্রিয়ানুভব কখনোই বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। একথা কান্ট নিজেই বলেছেন যে, বৌদ্ধিক প্রকার বা প্রত্যয় ছাড়া অনুভব অন্ধ, এবং অনুভব ছাড়া বৌদ্ধিক প্রকারগুলি শূন্যাকার মাত্র। সুতরাং যুক্তিবৈজ্ঞানিক বিচারের প্রয়োজনে আমরা বুদ্ধি ও অনুভবকে পৃথক হিসাবে গণ্য করে, বৌদ্ধিক প্রকারগুলি অনুভবে কীভাবে প্রযুক্ত হয়, সেই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করলেও, বাস্তবে তা একটি অন্যতর অনুসন্ধানের ভিত্তিভূমি। কান্ট উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধিক প্রকারের

সাকারায়নের যে আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন তার উদ্দেশ্য হল বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলিকে আবিষ্কার করা।

বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলিকে জানার জন্য অভিজ্ঞতার কোনো প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধি নিজেই এই সূত্রগুলিকে আবিষ্কার করতে সক্ষম। যেকোনো লৌকিক জ্ঞানের ভিত্তিতে এই মূলসূত্রগুলি বিদ্যমান থাকে। তাই বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলিকে কান্ট অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ বলেছেন। এই অবধারণের উদ্দেশ্য পদকে বিশ্লেষণ করলে, সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, অর্থাৎ বিধেয়কে পাওয়া যায় না বলে, এগুলিকে সংশ্লেষক অবধারণ বলা হয়। সুতরাং বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলি হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণ। এই অবধারণ কীভাবে সম্ভব তার ব্যাখ্যা দান করাই ছিল কান্টের জ্ঞানতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

কান্টের মতে সংশ্লেষক অবধারণের ক্ষেত্রে বিধেয় পদ উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত থাকে না। সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়'র মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ 'ফুলটি হয় সাদা' এই সংশ্লেষক অবধারণে ফুলটি সত্যিই সাদা কিনা, অর্থাৎ অবধারণটির সত্যতা যাচাই করতে গেলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সেক্ষেত্রে বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলি সংশ্লেষক হলেও তা অভিজ্ঞতাভিত্তিক নয়। এমতাবস্থায় 'লৌকিক জ্ঞানের সম্ভাব্যতা' (possibility of experience) বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলির অভিজ্ঞতা-পূর্ব ভিত্তির নিয়ামক হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। কারণ লৌকিক জ্ঞানের সম্ভাবনা এই মূলসূত্রগুলির উপর নির্ভরশীল। এই মূলসূত্রগুলি সত্য হয় বলেই লৌকিক জ্ঞান সম্ভবপর হয়ে ওঠে। বৌদ্ধিক প্রকারের সাকারায়ণে আমরা আকারসর্বস্ব প্রকারের যে মূর্তরূপ লাভ করি, মূলসূত্রে ওই মূর্তরূপ বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলি, প্রকারের অনুরূপ হয়ে থাকে বলে, কান্ট প্রকারের চারটি বিভাগ অনুসারে মূলসূত্রগুলিকেও চার ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বৌদ্ধিক প্রকার

বৌদ্ধিক মূলসূত্র

পরিমাণ	অনুভবের স্বতঃসিদ্ধ (axioms of intuition)
গুণ	প্রত্যক্ষের পূর্ববোধ (anticipation of perception)
সম্বন্ধ	অভিজ্ঞতার উপমান (analogies of experience)
অবস্থা	লৌকিক জ্ঞানের সাধারণ স্বীকার্য (postulates of empirical thinking in general)

উক্ত বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলি হল যাবতীয় জাগতিক অবধারণের মূলসূত্র। এই মূলসূত্রগুলি স্বীকার না করলে অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মগুলির প্রতিপাদন সম্ভবপর হবে না বলেই কান্টের অভিমত। উক্ত সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রয়োজন।

অনুভবের স্বতঃসিদ্ধ

যে সমস্ত বৌদ্ধিক প্রকারগুলি পরিমাণ-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তার অনুরূপ মূলসূত্রগুলিকে কান্ট ‘অনুভবের স্বতঃসিদ্ধ’ নামে অভিহিত করেছেন। সূত্রটি হল - ‘সকল ইন্দ্রিয়ানুভব হয় বিস্তারযুক্ত বিশালতা’^{১৪}। অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, ‘সকল অবভাস হল তাদের অনুভবের বিস্তারযুক্ত বিশালতা’। সহজ কথায় বললে যা কিছু অনুভব হয় তার বিস্তার অবশ্যই থাকবে। এই অনুভব ব্যতীত জ্ঞান হয় না। যেহেতু দেশ ও কাল হল অনুভবের অভিজ্ঞতা-পূর্ব আকার, তাই ইন্দ্রিয়ানুভব সর্বদাই দেশ ও কালে উৎপন্ন হয়। আবার শূন্য দেশ বা শূন্য কাল বলে কোনো কিছু অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সুতরাং দেশ ও কাল মাত্রই তা বিস্তারযুক্ত এবং সেই একই কারণে অনুভবকে বিস্তারযুক্ত বলার জন্য কোনোপ্রকার যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে যা কিছু অনুভব হয়, তা সর্বদাই দৈশিক ও কালিক হয়ে থাকে। বিস্তারহীন কোনো পদার্থ কখনোই দৈশিক বা কালিক হতে পারে না। ফলত সেইজাতীয় পদার্থের অনুভবও আমাদের হয় না। অনুভবের স্বরূপই তার বিস্তারযুক্ত হওয়ার প্রমাণ। তাই এই সূত্রটিকে ‘অনুভবের স্বতঃসিদ্ধ’ বলা হয়ে থাকে। এই বিস্তার হল অংশ সহযোগে গঠিত এক সমগ্রের বোধ, যা দৈশিক ও কালিক উভয়ই হতে পারে। উক্তপ্রকার দৈশিক

^{১৪} “All intuitions are extensive magnitudes”, Ibid, p. 286.

ও কালিক বিস্তারযুক্ত পদার্থেরই প্রত্যক্ষ সম্ভব। তাই কান্ট মনে করেন যে, আমাদের প্রত্যক্ষিত সকল অবভাসই বিস্তারযুক্ত বিশালতা।

প্রত্যক্ষের পূর্ববোধ

কান্ট গুণ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৌদ্ধিক প্রকারগুলির অনুরূপ মূলসূত্রগুলিকে ‘প্রত্যক্ষের পূর্ববোধ’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। সূত্রটি হল - ‘সব অবভাসের ক্ষেত্রে যা বাস্তব, যা সংবেদনের একটি বিষয়, তার যে গভীর বিশালতা আছে, সেটি হল তারতম্য বা মাত্রাগত’^{১৫}। এক্ষেত্রে বক্তব্য হল অবভাসগুলির মধ্যে যেগুলিকে আমরা বাস্তব বা অস্তিত্বশীল বলে মনে করি, সেগুলি সর্বদাই ইন্ডিয়ানুভব বা সংবেদনের বিষয় হয়ে থাকে। সংবেদনের বিষয় না হলে তার প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে সংবেদনের বিষয়টি ঠিক কী, তা প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার পূর্বে বলা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষের পূর্বে একথা অবশ্যই বলতে পারি যে, প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে বিশালতার দিক থেকে গুণগত তারতম্য থাকবেই। যেমন সর্বাপেক্ষা ক্ষীণ শব্দ ও সর্বাপেক্ষা উচ্চ শব্দের মধ্যে যে গুণগত তারতম্য থাকে, তা শব্দ প্রত্যক্ষের পূর্ববোধ থেকেই বলা সম্ভব। এখানে শব্দ হল এক সমগ্র। এই সমগ্র থেকেই আমরা অংশের কল্পনা করি থাকি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিমাণগত বিশালতা এবং গুণগত বিশালতা এক নয়, তাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। পরিমাণগত বিশালতার ক্ষেত্রে অংশ প্রদত্ত হয়, তা থেকে বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা সমগ্রকে গঠন করে থাকি। অন্যদিকে গুণগত বিশালতায় সমগ্র প্রদত্ত হয়, এবং তা থেকে কল্পনার দ্বারা অংশের বোধ জন্মায়। কান্টের মতে লৌকিক জ্ঞানের বিষয় মাত্রেরই তার গুণগত ও পরিমাণগত - উভয়প্রকার বিশালতাই থাকবে, যদিও লৌকিক জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয়।

অভিজ্ঞতার উপমান

কান্টের মতে সম্বন্ধ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৌদ্ধিক প্রকারের অনুরূপ মূলসূত্রগুলি হল অভিজ্ঞতার উপমান। সূত্রটি হল - ‘অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের মধ্যে এক

^{১৫} “In all appearance the real, which is an object of the sensation, has intensive magnitude, i.e., a degree”, Ibid, p. 290.

অনিবার্য সম্বন্ধের প্রতীতির মাধ্যমেই সম্ভব হয়”^{১৬}। এইস্থলে ‘প্রত্যক্ষ’ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। নিছক বিষয়জ্ঞান অর্থে ‘প্রত্যক্ষ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। বৌদ্ধিক প্রকারের মূলসূত্রের অন্তর্গত ‘প্রত্যক্ষ’ শব্দটির দ্বারা এখানে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে প্রত্যক্ষসমূহের নিয়মবদ্ধ সম্বন্ধকে। যার ফলে বিষয়জ্ঞান সম্ভবপর হয়ে ওঠে। কান্ট মনে করেন, কালে আমরা যে ইন্দ্রিয়ানুভব বা সংবেদন লাভ করে থাকি তা অবভাস মাত্র। এই অবভাসগুলিকে অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে উঠতে গেলে সেগুলিকে নিয়মানুগ সম্বন্ধে আবদ্ধ করা আবশ্যিক। তা না হলে সেগুলি নিছক অবভাস হয়েই থেকে যাবে, অভিজ্ঞতা বা লৌকিক জ্ঞানের বিষয়ে উন্নীত হতে পারবে না। এক্ষেত্রে অবভাসগুলি যেহেতু কালিক, তাই সেগুলির নিয়মবদ্ধ অনিবার্য সম্বন্ধের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অনিবার্য কালিক সম্বন্ধই প্রকাশ পায়। কালের তিন ধরনের অবস্থার ভিত্তিতে উক্তপ্রকার অনিবার্য সম্বন্ধও তিন প্রকারের হয়ে থাকে। সেগুলি হল - স্থিতি (duration), পারস্পর্য (succession), এবং সহাবস্থান (co-existence)। কান্ট এই তিনপ্রকার কালিক সম্বন্ধের অনুরূপ তিনটি উপমানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলিই হল অভিজ্ঞতার উপমান। অভিজ্ঞতার উপমানের সূত্রগুলি অবভাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবভাসগুলি কীরূপে উক্ত তিন প্রকারের অনিবার্য কালিক সম্বন্ধে নিয়মানুসারে আবদ্ধ হয়ে, অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষের বিষয়ে পরিণত হয়, তার ব্যাখ্যা প্রদান করাই অভিজ্ঞতার উপমানগুলির বিশেষ কাজ। উক্ত তিনপ্রকার উপমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল -

প্রথম উপমান : দ্রব্যের স্থায়ীত্বের সূত্র (principle of the persistence of substance)

দ্রব্যের স্থায়ীত্বের সূত্রে কান্টের বক্তব্য হল - অবভাসের সকল পরিবর্তনের মধ্যে দ্রব্য হল স্থায়ী, এবং প্রকৃতিতে তার পরিমাণের কোনো হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। আমরা জানি অবভাসগুলি সর্বদাই অনিবার্যভাবে কালিক সম্বন্ধে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে প্রতিটি অবভাস হয় একইসঙ্গে অথবা পর্যায়ক্রমে জ্ঞানে ভাসমান হয়ে থাকে। অবভাসগুলির মধ্যে যখন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, সেই পরিবর্তনও কালেই সংঘটিত হয়।

^{১৬} “Experience is possible only through the representation of a necessary connection of perceptions.”, Ibid, p. 295.

কালই হল সেই স্থায়ী দ্রব্য যা সকল প্রকার পরিবর্তনের মূল, কিন্তু নিজে সর্বদাই অপরিবর্তিত থেকে যায়। যার দ্বারা সকল পরিবর্তন বোধগম্য হয় সেইপ্রকার অপরিবর্তনীয় স্থায়ী পদার্থকে কান্ট 'দ্রব্য' নামে অভিহিত করেছেন। সুতরাং অবভাসের পরিবর্তনশীলতাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এইজাতীয় কালরূপ স্থায়ী দ্রব্যের কল্পনা আবশ্যিক।

দ্বিতীয় উপমান : কার্য-কারণ নিয়মানুগ কালিক পারস্পর্যের সূত্র (principle of temporal sequence according to the law of causality)

এই সূত্রের মূল বক্তব্য হল কোনো কিছুর পরিবর্তন ঘটলে, তা কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিয়মানুসারেই ঘটে থাকে। কান্ট মনে করেন যে, কার্য-কারণ নিয়ম হল সার্বিক ও অনিবার্য। আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতার মূলে এই কার্য-কারণভাব অপরিহার্য। কার্য-কারণ সম্বন্ধ যেহেতু অনিবার্য, তাই এটি অভিজ্ঞতালব্ধ নয় বা ইন্দ্রিয়ানুভবে তা পাওয়া যায় না। এই সম্বন্ধ হল জ্ঞানের অভিজ্ঞতা-পূর্ব আকার, যার দ্বারা সকল অভিজ্ঞতা বা লৌকিক জ্ঞান সম্ভবপর হয়ে ওঠে। কান্ট এই সম্বন্ধকে কালিক সম্বন্ধ বলেছেন। কারণ কালের মধ্যে যে নির্দিষ্ট পারস্পর্য ক্রম থাকে, অনুরূপভাবে কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্যেও পারস্পর্য ক্রম বিন্যস্ত থাকে। এক্ষেত্রে যা নিয়ত পূর্ববর্তী তা হল কারণ, এবং যা নিয়ত পরবর্তী তা হল কার্য। এই সম্বন্ধের মধ্যে কোনো ফাঁক বা ছেদ থাকে না। এটি হল বিভিন্ন অবস্থার অবিরাম প্রবাহ। অনুরূপভাবে কালেরও কোনো ছেদ নেই। অনাদি, অনন্ত একই কাল প্রবাহ অবিরাম বহে চলেছে। সুতরাং কার্য-কারণ নিয়ম সর্বদাই কালিক নিয়মকে অনুসরণ করে। কোনো নির্দিষ্ট কার্য উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু কাল অবশ্যই অপেক্ষিত।

তৃতীয় উপমান : ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা সামাজিকতার নিয়মানুগ যৌগপদ্যতার সূত্র (principle of simultaneity, according to the law of interaction, or community)

এই সূত্রটিকে কান্ট পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্র বলেছেন। তাঁর মতানুসারে যে সকল দ্রব্য একযোগে থাকে তাদের মধ্যে সামাজিকতা বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অবশ্যই বর্তমান থাকে। এই মূলসূত্রের দ্বারা অভিজ্ঞতা বা লৌকিক জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে সহভাব থাকে তা নির্ধারিত হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বা লৌকিক জ্ঞানে শুধুমাত্র জ্ঞানের বিষয়ের বা বস্তুর নির্দিষ্ট পারস্পর্য গৃহীত হয় তা নয়। কখনো কখনো জ্ঞানের বিষয়সমূহের সহভাবও গৃহীত হয়ে থাকে। সহভাব যদি গৃহীত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সেক্ষেত্রে বিষয়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। বিষয়সমূহের এইপ্রকার কালিক সহভাব ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারা নিরূপিত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে বৌদ্ধিক মূলসূত্রের দ্বারাই এই সহভাব গৃহীত হয়ে থাকে। কান্ট এই মূলসূত্রটিকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা সামাজিকতার মূলসূত্র বলেছেন।

লৌকিক জ্ঞানের সাধারণ স্বীকার্য

কান্ট অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বৌদ্ধিক প্রকারের অনুরূপ মূলসূত্রগুলিকে ‘লৌকিক জ্ঞানের সাধারণ স্বীকার্য’ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই মূলসূত্রগুলির সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে, কোন্ কোন্ অবস্থায় জ্ঞানের বিষয়কে সম্ভবপর (possible), বাস্তব (actual), বা অবশ্যসম্ভব (necessarily) হিসাবে বুঝতে পারা যায়। এক্ষেত্রে ‘স্বীকার্য’ শব্দটির দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ বা প্রমাণাতীত কোনো ধারণাকে ব্যক্ত করা হয়নি। আমাদের লৌকিক জ্ঞানে সম্ভবপর, বাস্তব, বা অবশ্যসম্ভব বলতে সাধারণত আমরা কী বুঝি বা কোন্ কোন্ অবস্থায় এই প্রত্যয়গুলি প্রয়োগ করি, তা এই মূলসূত্র থেকেই জানা যায় মাত্র। কান্ট এই প্রসঙ্গে তিনটি^{১৭} স্বীকার্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম স্বীকার্য - ‘যা কিছু অভিজ্ঞতার আকারগত শর্তসম্মত হয় (অনুভব এবং প্রত্যয় অনুযায়ী) সেগুলি সম্ভাব্য হিসাবে গণ্য হয়’। অভিজ্ঞতার বিষয় মাত্রই তা ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভব। অনুভব সর্বদাই দেশ ও কালের আকারে আকারিত হয়ে থাকে। এইরূপ অনুভবের সঙ্গে নির্দিষ্ট বৌদ্ধিক প্রকার যুক্ত হলে লৌকিক জ্ঞান সম্ভবপর হয়। সুতরাং এই স্বীকার্য অনুসারে, যে পদার্থ দৈশিক ও কালিক আকারে আকারিত এবং যে

^{১৭} Ibid, p. 321.

পদার্থে বৌদ্ধিক প্রকার প্রযুক্ত হয় তাকেই সম্ভবপর হিসাবে গণ্য করতে হবে। কারণ আমরা জানি যে, দেশ ও কাল এবং বৌদ্ধিক প্রকার বা প্রত্যয়গুলি হল অভিজ্ঞতার আকারগত শর্ত।

দ্বিতীয় স্বীকার্য - ‘অভিজ্ঞতার উপাদানগত (সংবেদনের) শর্তের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কযুক্ত তাই হল বাস্তব’। এই স্বীকার্যের মূল বক্তব্য হল কোনো পদার্থকে বাস্তব হতে হলে সেটিকে সর্বদাই প্রত্যক্ষের বিষয় হতে হবে এমন নয়। যা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেটিকেও বাস্তব বলা যাবে। জগতে এমন অনেককিছুই থাকতে পারে যা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়, কিন্তু তাই বলে সেটিকে বাস্তব বলা যাবে না এমন নয়। বর্তমানে কোনোকিছু প্রত্যক্ষগোচর না হলেও, তার প্রত্যক্ষযোগ্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। এই স্বীকার্যের মধ্য দিয়ে কান্ট কার্যত ভাববাদ বিরোধী মত প্রকাশ করে বাহ্যপদার্থের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

তৃতীয় স্বীকার্য - ‘যা কিছু অভিজ্ঞতার সাধারণ শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা অনিবার্যভাবে অস্তিত্বশীল’। এই স্বীকার্যে কান্ট যে অনিবার্যতার কথা তুলে ধরতে চান, তা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বাস্তব অনিবার্যতা। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বাস্তব অনিবার্যতার জন্য অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়ানুভব একান্ত আবশ্যিক। শুধু কল্পনা বা প্রত্যক্ষের দ্বারা ইন্দ্রিয়ানুভবগ্রাহ্য পদার্থের অনিবার্যতা গৃহীত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে যে বিষয় আমরা অভিজ্ঞতায় লাভ করি, তার সঙ্গে যদি অন্য কোনো বিষয় কার্য-কারণ সম্বন্ধে যুক্ত হয়, তাহলে কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এপর্যন্ত বৌদ্ধিক প্রকার ও বৌদ্ধিক মূলসূত্র সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল যে, কান্ট কীভাবে সেগুলির যথার্থতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন। দেখা গিয়েছে, যদিও সেগুলি লৌকিক নয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে পাওয়া যায় না, কিন্তু ওইসব অভিজ্ঞতা-পূর্ব আকার বা প্রকার ব্যতীত লৌকিক জ্ঞানও সম্ভবপর হতে পারে না। সেই কারণে বৌদ্ধিক প্রকার এবং বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলির সাহায্যে কীভাবে জ্ঞানের বিষয় গঠিত হয় এবং বিষয়ের জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়ে ওঠে, তার বিবরণ কান্ট-এর জ্ঞানতত্ত্বে

এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যেহেতু বৌদ্ধিক প্রকার ও মূলসূত্রগুলি প্রযুক্ত না হলে কোনো ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ উপাদান জ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে না, তাই যেকোনো জ্ঞানের পূর্বেই সেগুলিকে অভিজ্ঞতা-পূর্ব আকার বা প্রকার হিসাবে স্বীকার করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকে না। কান্টের মতে উক্ত বৌদ্ধিক প্রকার এবং মূলসূত্রগুলি অভিজ্ঞতা-পূর্ব সূত্র মাত্র, কিন্তু তাদের উপযোগিতা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভব বা অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়েই সীমাবদ্ধ। তাই এগুলির কোনো অতীন্দ্রিয় প্রয়োগ নেই, আছে কেবল লৌকিক প্রয়োগ। সুতরাং জ্ঞানের আকাররূপ বৌদ্ধিক প্রকার এবং মূলসূত্রগুলি কীভাবে জ্ঞানের উপাদানরূপ ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ বহুতাতে প্রযুক্ত হয়ে সার্থকতা লাভ করে, সেই ব্যাখ্যার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় কান্ট অভিমত অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক জ্ঞান বা অবধারণের এক সদর্থক উত্তর।

অধিবিদ্যা :

দর্শনের জগতে অধিবিদ্যার আলোচনা সাধারণত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। যে বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা যায় না, সেই বিষয়গুলির জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যেই অধিবিদ্যক পর্যালোচনা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এইপ্রকার বিষয়গুলিকে কান্ট ইন্দ্রিয়াতীত (super sensible object) বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কান্টের সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ মনে করতেন যে আত্মা, ঈশ্বর, দ্রব্য ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞান আমরা অধিবিদ্যার দ্বারা লাভ করতে পারি। এই বিশ্বাস থেকেই অধিবিদ্যক নানান আলোচনা প্রসার লাভ করে। এক্ষেত্রে সমস্যা হল, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় বা পদার্থ ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য নয়, অথচ কান্ট-এর বিচার পদ্ধতি অনুসারে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য পদার্থ বিষয়েই জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হয়। উপরন্তু কান্ট প্রকৃত জ্ঞান বলতে বুঝাতেন পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞানকে, আরও স্পষ্ট করে বললে পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানকে। সেই কারণে কান্ট-এর দর্শনে অধিবিদ্যক আলোচনার মুখ্য প্রশ্নটি ছিল - অধিবিদ্যা সম্পর্কিত পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান কি আদৌ সম্ভব ?

বিজ্ঞান বা গণিতের পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান যে সম্ভব, সে সম্পর্কে নিজের অভিমত কান্ট স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। অপরপক্ষে আধিবিদ্যক কোনো পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞান তো বটেই, এমনকি বাস্তবিক কোনোপ্রকার জ্ঞানলাভ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন না। এতদ সত্ত্বেও কান্ট লক্ষ করেন যে, আধিবিদ্যার অমীমাংসিত সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে দর্শনের জগতে নানা বাদ-বিতন্ডা বা চাপান-উতোর চলতেই থাকে। যে বিষয়ের জ্ঞানলাভ অসম্ভব, সেই চর্চায় বৌদ্ধিক জীবের এত ব্যাকুলতার কারণ হিসাবে তিনি মানুষের বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্মের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য হল আধিবিদ্যক চর্চায় মানুষের যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, তা মানুষের বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্মের ফসল। সেক্ষেত্রে আধিবিদ্যায় আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অসম্ভব হলেও, সেগুলিকে নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। বৌদ্ধিক জীবের স্বরূপই এমন যে, সে আধিবিদ্যক প্রশ্ন উত্থাপন না করে থাকতে পারে না। কান্ট-এর মতে এইজাতীয় প্রশ্নের কারণ হল ‘অতীন্দ্রিয় ভ্রান্তি’^{১৮} (transcendental illusion)।

আমরা জানি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লৌকিক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারলেই মানুষের জ্ঞান চরিতার্থ হয় না। লৌকিক জ্ঞান মানুষের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা যদি সম্পূর্ণভাবে নিবারিত করতে পারতো, তাহলে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের চিন্তা মানুষের মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারতো না। আসলে বস্তুকে যেরূপে আমরা জানতে চাই, লৌকিক জ্ঞানে বস্তুটিকে সেইভাবে পাওয়াটা সম্ভব নয়। সেই কারণে ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই মনে জেগে ওঠে, এবং মানুষ শত চেষ্টাতেও জ্ঞানলাভের এই আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে পারে না। আমরা লৌকিক বা প্রাকৃতজ্ঞানে যা পাই তা শর্তসাপেক্ষ, সীমিত ও খণ্ডিত। শুধু এইটুকু জানলেই সবটাকে জানা হয় না। তাই মানুষ ওইসব জ্ঞানের অন্তরালে, অর্থাৎ যার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে অনুভবগম্য লৌকিক জ্ঞান - সেইসব বিষয়কেও জানতে চায়। এইভাবে জানাটাই কোনো বিষয়ের

^{১৮} Ibid, pp. 385-6.

সম্যক জ্ঞানলাভের পরিচায়ক। মানুষের জ্ঞানলাভের চরম লক্ষ্যই হল সেই শতহীন, অসীম, নিরপেক্ষ, অখণ্ড জ্ঞানের অন্বেষণ করা।

এখন প্রশ্ন হল, এইপ্রকার জ্ঞানলাভের উপায় কী? যেহেতু সংবেদন বা ইন্দ্রিয়ানুভবের যে আকার, অর্থাৎ দেশ ও কাল হল অনাদি এবং অনন্ত। ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো পদার্থ যখন দেশ ও কালের দ্বারা আকারিত হয়, তখন তা সর্বদাই দেশভাগ ও কালভাগের দ্বারা খণ্ডিত হয়ে থাকে। সুতরাং এইস্থলে কোনোপ্রকার শতহীন, অখণ্ড, সমগ্রের জ্ঞান অসম্ভব। অন্যদিকে বৌদ্ধিক প্রকারগুলির প্রয়োগ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফলত সেক্ষেত্রেও কোনো শতহীন, অখণ্ডের জ্ঞান সম্ভবপর নয়। অথচ ইন্দ্রিয়ানুভবের আকার এবং বৌদ্ধিক প্রকার অতিরিক্ত কোনো জ্ঞানলাভের উপায়ও মানুষের অজানা। এইস্থলে জ্ঞানের লক্ষ্য (end) ও উপায় (means)-এর মধ্যে বিরোধ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কারণ মানুষের মনোরাজ্যে শতহীন, অসীম, সমগ্রকে জানার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও, নেই কোনো সাধনের উপায়। এই বিরোধই মানুষের সমস্ত অসীমাসিত প্রশ্নের মূল, যা নিত্য-নতুন জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাকে উজ্জীবিত করে রাখে। আধিবিদ্যক বিষয়সমূহের জ্ঞানলাভ মানুষের সাধ্যাতীত হলেও, সামগ্রিকভাবে জ্ঞানের সম্প্রসারণে আধিবিদ্যক চর্চার উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

কান্ট মনে করেন, উপরোক্ত শতহীনতার ধারণাটাই অর্থাৎ শতহীন, অসীম, অখণ্ড সমগ্র বলে কিছু একটা আছে ধরে নিয়ে আমরা অগ্রসর হই বলেই, তা আমাদের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় না। বরং জ্ঞানের দিকদর্শক (regulative) হিসাবে এর মূল্য অপরিসীম। প্রসঙ্গত জানা আবশ্যিক যে, উক্ত শতহীনতার ধারণা আমাদের মনে এসে উপস্থিত হয় কোথা থেকে, বা আমাদের কোন্ জ্ঞানশক্তি থেকে এটি উদ্ভূত হয়। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সংবেদনশক্তি ও বোধশক্তির দ্বারা শতহীন, অসীম সমগ্রের জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কান্ট শতহীনতার ধারণাটিকে শুধুমাত্র জ্ঞানের দিকদর্শক হিসাবে উল্লেখ করেছেন মাত্র, কিন্তু কখনোই জ্ঞান পদবাচ্য হিসাবে স্বীকার করেন নি। এই প্রসঙ্গে কান্ট সংবেদন ও বোধশক্তি

ব্যতীত অপর একটি জ্ঞানশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, তা হল প্রজ্ঞা (reason)। এই প্রজ্ঞার দ্বারা মানুষ জ্ঞানের দিকদর্শনের ধারণা লাভ করে থাকে বলেই তাঁর অভিমত। সুতরাং কান্টকে অনুসরণ করে মোটামুটি তিন প্রকার জ্ঞানশক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যথা - সংবেদনশক্তি, বোধশক্তি এবং প্রজ্ঞা। আমরা জানি সংবেদন দেয় জ্ঞানের উপাদান, যা ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে প্রাপ্ত। বুদ্ধি দেয় জ্ঞানের আকার, যা কোনো একটি অনুভবকে বিশেষ বৌদ্ধিক প্রকারে অন্তর্ভুক্ত করে। আর প্রজ্ঞা দেয় শর্তহীনতার ধারণা, যা জ্ঞানের দিকদর্শন করে মাত্র। প্রজ্ঞা কখনোই ইন্দ্রিয়ানুভূত পদার্থের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত হতে পারে না। কান্ট যে অতীন্দ্রিয় ভ্রম-এর কথা উল্লেখ করেছেন, সেই ভ্রমের উৎপত্তি এইস্থলেই। কারণ যে শর্তহীনতার ধারণাটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে দিকদর্শক অতিরিক্ত আর কিছুই নয়, তাকে যদি জ্ঞানীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এইপ্রকার ভ্রম অনিবার্য। সুতরাং শর্তহীন সমগ্রের ধারণাটির সৌজন্যে কোনো বিষয়ের জ্ঞানলাভ সুসম্পন্ন হলেও, উক্ত ধারণা বাস্তবিকভাবে অস্তিত্বশীল এমন মনে করাটা অবাঞ্ছিত। যে সমস্ত দার্শনিকরা অধিবিদ্যার চর্চায় আগ্রহী, তাঁরা মনে করেন যে, এইরূপ শর্তহীন সমগ্রকে জানতে পারাটা সম্ভব। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তাঁরা ভ্রমে পতিত হন, এবং অন্তহীন আধিবিদ্যক চর্চা চলতে থাকে। যদিও কান্ট মনে করেন যে, শর্তহীন সমগ্রের জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা নিরর্থক হলেও, আধিবিদ্যক চর্চা অর্থহীন নয়। জ্ঞানের দিকদর্শনে তার মূল্য অপরিমিত।

কান্ট মানববুদ্ধির অতীন্দ্রিয় ভ্রমকে অপরিহার্য বলে দাবি করেছেন। এই কারণে তিনি অধিবিদ্যার আলোচনাকেও অপরিহার্য হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। কান্টের অভিপ্রায় হল এটা দেখানো যে, বিজ্ঞানের মতো করে আধিবিদ্যক চর্চা সম্ভবপর না হলেও, বা অধিবিদ্যার দ্বারা বাস্তবিক কোনোপ্রকার জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা না থাকলেও, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল এর চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা, এবং এটাই মানববুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম। তাঁর মতে বাহ্যজগতে ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য শর্তহীন খণ্ডিত বিষয়ের দিকদর্শক হিসাবে যেমন অতীন্দ্রিয় শর্তহীন সমগ্রের ধারণা অপরিহার্য, তেমনই মনোজগতের শর্তহীন, খণ্ডিত যাবতীয় আন্তর অবভাসের মূলেও এইপ্রকার শর্তহীন

সমগ্রের ধারণা অনস্বীকার্য। মনোজগতের সেই ইন্দ্রিয়াতীত শর্তহীন সমগ্র হল বিষয়ী বা আত্মা। অনুরূপভাবে বাহ্যজগতের ক্ষেত্রে তা হল বিশ্ব বা জগৎ। উক্ত মনোজগৎ ও বাহ্যজগৎ নির্বিশেষে যাবতীয় সত্তার মূল হিসাবে যে শর্তহীন সমগ্রের চিন্তা আমরা করে থাকি, তিনি হলেন ঈশ্বর।

অনুভব ব্যতিরেকে শুধুমাত্র যুক্তির সাহায্যেই উক্ত তিনপ্রকার শর্তহীন, সমগ্রের বিচারের ক্ষেত্র ছিল আধিবিদ্যা। দর্শনের এই শাখার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা আত্মা, বিশ্ব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান প্রদান করা। বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করে কান্ট দেখিয়েছেন যে, এই সমস্ত আধিবিদ্যক বিষয়গুলি সম্বন্ধে বাস্তবিক কোনো জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। দেখা প্রয়োজন যে, কীভাবে তিনি আত্মা, বিশ্ব ও ঈশ্বর তথাকথিত এই আধিবিদ্যক বিষয়গুলির ব্যাখ্যা দান করার চেষ্টা করেছেন^{১৯}।

আত্মা

আধিবিদ্যার যে বিভাগ আত্মা'র অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে তা 'যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান' (rational psychology) নামে পরিচিত। মনোজগতের যাবতীয় অস্তিত্বের মূল হিসাবে আমরা যে শর্তহীন সমগ্রের কথা চিন্তা করি, তা হল আত্মা। যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করতে চায় যে, আত্মা হল দ্রব্য। কারণ তা অবস্থার শত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। আমরা প্রত্যেকেই সমস্ত জড় পদার্থ এমনকি নিজের দেহকেও আত্মা থেকে পৃথক হিসাবে বুঝতে পারি। এই আত্মা অজড় ও অমর। এই প্রসঙ্গে কান্ট-এর বক্তব্য হল যৌক্তিক মনোবিজ্ঞানে আত্মা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাখ্যা নিঃসৃত হয় আমাদের সমস্ত লৌকিক বা প্রাকৃত জ্ঞানের মূলীভূত এক জ্ঞানাকার থেকে, তা হল আমাদের 'স্ব-চেতনা' বা 'আমি জানি' - এইরূপ জ্ঞানাকার থেকেই আত্মার দ্রব্যত্ব, অজড়ত্ব, অমরত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয়ে যায়। এই 'আমি' জ্ঞানকে কান্টের পূর্ববর্তী আধিবিদ্যক দার্শনিকগণ বাস্তবিক জ্ঞানরূপেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যদিও কান্ট মনে করেন যে, যেকোনো জ্ঞানের সঙ্গেই এই 'আমি' জ্ঞান যুক্ত

^{১৯} Ibid, p. 406.

হয়েই থাকে। কারণ ‘আমি’ জ্ঞান ব্যতীত কোনো জ্ঞানই সম্ভবপর নয়, কিন্তু এই ‘আমি’ জ্ঞান বা ‘আমি জানি’ দ্বারা আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের একটি যুক্তিবৈজ্ঞানিক আকার (logical form) নির্দেশিত হলেও, বাস্তবে কোনো জ্ঞান প্রকাশ পায় না বলেই কান্ট-এর অভিমত। ফলত আমাদের যাবতীয় জ্ঞান ‘আমি জানি’ আকারেই আমাদের কাছে আসে, কিন্তু ‘আমি জানি’-এটা স্বয়ং জ্ঞান পদবাচ্য নয়।

কান্টের মতানুসারে কোনো বিষয়ের জ্ঞান হতে গেলে তা অনুভবসিদ্ধ হতে হবে। যেহেতু উক্তপ্রকার ‘আমি’র কোনো অনুভব আমাদের হয় না, সুতরাং আধিবিদ্যকের সিদ্ধান্তস্বরূপ তথাকথিত ‘আমি জ্ঞান’ বা ‘স্ব-চেতনা’ আসলে জ্ঞানাকার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। সেই কারণে কান্ট মনে করেন যে, যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান যুক্তির দ্বারা আত্মা সম্পর্কে যে মত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা প্রকৃতপক্ষে ভ্রম। এই ভ্রমকেই কান্ট যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান-এর যুক্ত্যাভাস^{২০} (paralogism) বলেছেন। বিচারের মাধ্যমে তিনি এই ভ্রম বা যুক্ত্যাভাসগুলিকে তুলে ধরতে চান।

প্রথম যুক্ত্যাভাস - আত্মা সম্বন্ধীয় প্রথম ভ্রম বা যুক্ত্যাভাস, আত্মা হল দ্রব্য। কারণ তা কখনোই কোনো বাক্যের বিধেয় পদের স্থানে বসে না, সর্বদাই উদ্দেশ্যের স্থানে প্রযুক্ত হয়। বাক্যের উদ্দেশ্য সর্বদাই কোনো না কোনো দ্রব্য হয়, এবং গুণ ও ক্রিয়া হল বিধেয়। এই গুণ, ক্রিয়া, ইত্যাদি যেহেতু দ্রব্যশ্রিত, তাই তা দ্রব্যের পদার্থ। আবার গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি পরিবর্তনশীল হলেও, এদের আশ্রয়রূপ যে দ্রব্য, অর্থাৎ আত্মা অপরিবর্তনীয় সত্তা।

কান্ট মনে করেন, ‘দ্রব্যত্ব’-রূপ যে প্রকার, তা অনুভবগম্য পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে। যা অনুভবে পাওয়া যায় না, তার উপর দ্রব্যত্ব প্রকার আরোপিত হতেই পারে না। সুতরাং আত্মা সম্পর্কে আমরা চিন্তা করতে পারি, কিন্তু তাই বলে আত্মা বাস্তবে অস্তিত্বশীল, এবং তা একটি দ্রব্য বিশেষ এমন দাবি যুক্তিসিদ্ধ নয়।

^{২০} Ibid, pp. 415-25.

দ্বিতীয় যুক্ত্যাভাস - যৌক্তিক মনোবিজ্ঞানের দ্বিতীয় যুক্ত্যাভাসে আত্মার অবিমিশ্র (simple) রূপের দাবি জানানো হয়। আমাদের জ্ঞান, চিন্তা বা মননের ঐক্য থেকে এটা বুঝতে পারা যায় যে, আত্মা একাধিক পদার্থের মিশ্রণ নয়। যেমন 'আমি গান গাইব' একথা আমরা অনায়াসে চিন্তা করতে পারি। এইস্থলে 'আমি', 'গান', 'গাইব'- এগুলি যদি তিনটি পৃথক আমি বা আত্মার বোধে ভাসমান হয়, তাহলে 'আমি গান গাইব'- এই জ্ঞান কখনোই উৎপন্ন হতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান, চিন্তা বা মননের ঐক্যের প্রয়োজন, এবং এইপ্রকার ঐক্যের মূলীভূত আত্মাকেও এক হতে হবে।

কান্টও একথা স্বীকার করেন যে, আত্মা সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে তা এক হিসাবেই চিন্তা করতে হয়, কিন্তু তার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ অনুভব ছাড়া কেবল চিন্তার দ্বারা কোনো পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ঐক্য ছাড়া যেহেতু চিন্তা বা মনন সম্ভব হয় না, তাই ঐক্য হল আমাদের জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য আকার, কিন্তু তার ভিত্তিতে আত্মারূপ অবিমিশ্র পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

তৃতীয় যুক্ত্যাভাস - যৌক্তিক মনোবিজ্ঞানের তৃতীয় যুক্ত্যাভাসে বলা হয় অবস্থাভেদে আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় না। সব অবস্থাতেই এক অপরিবর্তনীয় আত্মা বিদ্যমান থাকে, এবং এটাই আত্মার ব্যক্তিত্বের (personality) পরিচয়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কান্ট-এর বক্তব্য হল, 'আমি জানি' রূপে জ্ঞানের এই এক আকার সর্বপ্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রত্যেক জ্ঞানের ক্ষেত্রেই 'আমি জানি' রূপেই জ্ঞান প্রকাশ পায়। যেহেতু এর দ্বারা কখনোই বস্তুস্থিতির জ্ঞান হয় না, তাই এমনটা বলা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, বাস্তবিকভাবে এক 'আমি' বা এক 'আত্মা' সর্ব অবস্থায় একইভাবে বিদ্যমান থাকে।

চতুর্থ যুক্ত্যাভাস - যৌক্তিক মনোবিজ্ঞানের চতুর্থ এবং শেষ যুক্ত্যাভাসে 'আত্মা'- এর অজড়ত্বের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শিত হয়। আত্মা যেহেতু বাহ্যপদার্থ থেকে ভিন্ন, এমনকি আমরা নিজেদের শরীরকেও আত্মা থেকে পৃথক হিসাবে জানি, এই যুক্তির

উপর নির্ভর করে যৌক্তিক মনোবিজ্ঞানে আত্মার অজড়ত্বকে প্রমাণ করা হয়। ফলস্বরূপ আত্মার অমরত্বও সিদ্ধ হয়ে যায়।

কান্ট মনে করেন, আমাদের শরীর জড় পদার্থ বলেই, আমরা শরীরের সঙ্গে অজড় আত্মার পার্থক্য বুঝতে পারি। আত্মা হল জ্ঞাতা, বাকি সবকিছুই জ্ঞেয়। সুতরাং শরীরও জ্ঞেয় বস্তু। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যেহেতু এক পদার্থ হতে পারে না, তাই শরীর ও আত্মা যে এক নয় তা অবশ্য স্বীকার্য। এক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ভিন্ন পদার্থ হলেও, তার অর্থ এটা নয় যে, জ্ঞেয় পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ অসম্বন্ধ অবস্থাতেও জ্ঞাতারূপ স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব আছে। অনুরূপভাবে আমরা তথাকথিত ‘আমি’ বা আত্মাকে শরীরভিন্ন পদার্থরূপে বুঝতে পারলেও, একথা যুক্তিগ্রাহ্য নয় যে, তা শরীর ব্যতিরেকেও বিদ্যমান থাকতে পারে।

কান্টের বক্তব্য হল বৌদ্ধিক প্রকার মাত্রই তা অনুভবসিদ্ধ পদার্থে প্রযুক্ত হয়। এই মতানুসারে আত্মার দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ অনুভব শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সম্ভব, এবং আত্মা যে ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ - আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী সকল ব্যক্তিই তা স্বীকার করে থাকেন। এই নিয়ে কোনও বিরোধ নেই। আত্মার অনুভবই যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আত্মার অস্তিত্ব আছে এমন দাবিও অবাস্তব। যৌক্তিক মনোবিজ্ঞানে আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদনে যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া হয়েছে, যেখানে আত্মাকে দ্রব্য, অজড়, অমর ইত্যাদি রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলতে থাকে, তার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি কান্ট খুঁজে পান না। যদিও তিনি এমন কথা বলেন না যে, আত্মা সম্পর্কে কোনো চিন্তা করা যায় না, বা এমন দাবিও জানান না যে, আত্মা বলে কিছুই নেই। বরং তাঁর মত হল আত্মা সম্পর্কিত কোনো কিছু আমরা যুক্তিযুক্তভাবে জানতে না পারলেও, সেই সম্পর্কে চিন্তা করতে বা বিশ্বাস করতে কোনো অসুবিধা নেই।

বিশ্বজগৎ

অধিবিদ্যার যে বিভাগ জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করে তা হল ‘যৌক্তিক বিশ্ববিজ্ঞান’ (rational cosmology)। বাহ্যজগতের যাবতীয় সত্ত্বার অস্তিত্বের

মূল হিসাবে আমরা যে অতীন্দ্রিয় শর্তহীন সমগ্রের কথা চিন্তা করি তা হল বিশ্বজগৎ। কান্ট বিশ্ব বা জগৎ বলতে বুঝিয়েছেন বাহ্যজগৎ বা বাহ্যবিষয়সমূহের সমষ্টিকে। আমরা বাহ্যেন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভব করি সেগুলি সবই কোনো না কোনোভাবে শর্তাধীন। যখন শর্তহীনতার ধারণাটি বাহ্যবিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন আমরা যাবতীয় বাহ্যবিষয়ের সমষ্টিক্রমে সমগ্র জগৎকে লাভ করি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাগতিক বস্তুসমূহ অন্য কোনো পদার্থ বা বস্তু দ্বারা শর্তাধীন হলেও, জগৎ স্বয়ং কোনোকিছুর দ্বারা শর্তাধীন হয় না, তা সর্বদাই শর্তহীন ধারণা। কান্টের মতে বাহ্যজগতের নানা শর্তাধীন ঘটনাবলী আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও, শর্তহীন সমগ্ররূপে এক জগৎ কখনোই অনুভবে ধরা পড়ে না। বাহ্যজগতের যে সমগ্র এক পদার্থকে আমরা জগৎ হিসাবে চিন্তা করি, তা প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞার ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের বুদ্ধি এইপ্রকার ধারণাকে জ্ঞান পদবাচ্য হিসাবে মনে করে জগৎ সম্পর্কে নানা পরস্পর বিরুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন করে চলে। জগৎ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচার করতে গিয়ে মানব বুদ্ধির এইপ্রকার স্ব-বিরোধে পতিত হওয়াকে কান্ট ‘শুদ্ধ প্রজ্ঞার স্ব-বিরোধ’ (the antinomies of pure reason) নামে অভিহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে কান্ট চারটি স্ব-বিরোধ-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এই স্ব-বিরোধগুলিকে বাদী-প্রতিবাদী প্রেক্ষিত রূপে উপস্থাপিত করে দেখিয়েছেন যে, প্রতিটি স্ব-বিরোধস্থলে বাদীপক্ষ যেমন যুক্তি দ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, একইভাবে তূল্যবলশালী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিবাদী পক্ষও স্বমত প্রতিষ্ঠায় সমর্থ। কান্ট মনে করেন যে, বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে এই স্ব-বিরোধ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আর তা না হলে শুধুমাত্র সাধারণ বিচারের দৃষ্টিতে উভয়পক্ষের যুক্তি অকাট্য হিসাবেই থেকে যাবে, এবং এই অন্তহীন বিরোধ চলতে থাকবে। কান্টকে অনুসরণ করে জগৎ বিষয়ক বিরোধগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম বিরোধ^{২১} : বাদীপক্ষ - জগতের আদি ও অন্ত আছে। অর্থাৎ জগৎ কোনো একটি কালে উৎপন্ন হয়েছে এবং দেশে কোথাও তার একটি সীমা আছে। যদি ধরে নেওয়া

^{২১} Ibid, pp. 470-1.

হয় যে, জগৎ অনাদি, অর্থাৎ তা কোনো কালে উৎপন্ন হয়নি, তাহলে বর্তমান মুহূর্তের পূর্বে জগৎ অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। অথবা একটি অসীম ঘটনা প্রবাহ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে। আমরা জানি, যা অনন্ত তা সমাপ্ত হতে পারে না, এবং যা অসীম তা কখনোই সম্পূর্ণতা লাভ করে না। সুতরাং জগৎ অবশ্যই কোনো না কোনো কালে উৎপন্ন হয়েছে, অর্থাৎ তার আদি আছে। একইভাবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, জগৎ দেশে কোথাও সীমাবদ্ধ নয়, তাহলে অসীম জগতের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে, অসীম দৈশিক বিভাগের সংশ্লেষণ (synthesis) স্বীকার করতে হবে। সেক্ষেত্রে অসীমের সংশ্লেষণের ফলে যে সমগ্র এক জগৎ উৎপন্ন হওয়া উচিত, তা কখনোই পাওয়া যাবে না। কারণ অসীমের সংশ্লেষণ কখনোই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সুতরাং জগৎ সসীম।

প্রতিবাদী - জগৎ অনাদি ও অনন্ত। অর্থাৎ তা কোনো কালে উৎপন্ন হয়নি, এবং দেশে কোথাও তার কোনো সীমা নেই। এক্ষেত্রে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, জগৎ কোনো একটি কালে উৎপন্ন হয়েছে, তাহলে জগতের উৎপত্তির পূর্বেও কালের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, যেখানে জগতের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ সেই কাল ছিল শূন্যগর্ভ। সেক্ষেত্রে শূন্যগর্ভ যে কাল, সেই কালে কোনোকিছুর আরম্ভ বা সূচনা অসম্ভব। কারণ শূন্যকালে কোনো কিছু ঘটেছে এমন কথা অর্থহীন। সুতরাং জগৎ অনাদি। একইভাবে যদি ধরে নেওয়া হয়ে যে, জগৎ সসীম, তাহলে জগতের বাইরেও দেশ-এর অস্তিত্ব আছে বলে মেনে নিতে হবে। জগতের বাইরে যদি দেশ আছে বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে সে দেশ হবে শূন্য। ফলত আমাদের এটাও মেনে নিতে হবে যে, শূন্যদেশের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক আছে, এবং এইধরনের সম্পর্কই জগৎকে সীমিত করে তোলে। যদিও বাস্তবে শূন্যদেশের অস্তিত্ব কখনোই সম্ভবপর হতে পারে না। কাজেই উক্তপ্রকার শূন্যদেশের সঙ্গে জগতের কোনো সম্পর্কও থাকা সম্ভবপর নয়। অতএব বলতে হয় জগৎ যেহেতু দেশের দ্বারা সীমিত নয়, তাই তা অসীম।

দ্বিতীয় বিরোধ^{২২} : বাদীপক্ষ - জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ গঠিত হয় মৌলিক বা সরল কতকগুলি অংশের সংমিশ্রনে। এই সরল, মৌলিক পদার্থ এবং সেগুলির সংমিশ্রনের ফলে গঠিত হয়েছে এমন যৌগিক পদার্থ ছাড়া আর কোনোকিছুই জগতে অস্তিত্বশীল নয়। এখন ধরে নেওয়া যাক যে, জগতের যৌগিক পদার্থগুলি মৌলিক অংশের দ্বারা গঠিত হয় না, বা আদৌ মৌলিক পদার্থ বলে কোনোকিছুই জগতে অস্তিত্বশীল নয়। সেক্ষেত্রে মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা না হয়, তাহলে যৌগিক পদার্থও অস্বীকৃত হয়ে পড়বে। কারণ অবয়বসমূহকে নিয়েই অবয়বী গঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা হয়, তাহলে তার মূলে মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যিক। তাছাড়াও মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব যদি স্বীকৃত না হয়, তাহলে যৌগিক পদার্থের অনন্ত বিভাগ সম্ভবপর হতো, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সুতরাং জগৎ গঠনের মূলে সরল, মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য, এবং সেইসঙ্গে মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রনের দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থের উপস্থিতিও সিদ্ধ হয়ে যায়।

প্রতিবাদী - জগতে মৌলিক পদার্থ বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই, এবং মৌলিক পদার্থসমূহের সংমিশ্রনের ফলে গঠিত হয়েছে এমন কোনো যৌগিক পদার্থও জগতে অস্তিত্বশীল নয়। ধরে নেওয়া যাক যে, জগতে মৌলিক পদার্থ বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব আছে, যেগুলি কিনা জগতে অস্তিত্বশীল যৌগিক পদার্থের অবিভাজ্য মূল অংশ। আমরা জানি যৌগিক পদার্থগুলি সর্বদাই দেশ ও কালে অবস্থান করে। সেক্ষেত্রে যদি যৌগিক পদার্থগুলিকে ভাগ করা হয়, তাহলে সেই যৌগিক পদার্থের ভাগের দ্বারা দেশের বিভাগও স্বীকার করতে হবে। যদিও দেশকে যতই ভাগ করা হোক না কেন, তার কোনো অবিভাজ্য অংশ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ দেশ ও কালের বিভাগ নিরবচ্ছিন্ন, ফলে যত ক্ষুদ্র কণাই থাকুক না কেন তারও বিভাগ সম্ভব। সুতরাং দেশ ও কালস্থিত যৌগিক পদার্থের কোনো অবিভাজ্য, সরল, মৌলিক অংশ থাকতে পারে না। তাই

^{২২} Ibid, pp. 476-7.

স্বীকার করতে হবে জগৎ গঠনের যাবতীয় উপাদান যৌগিক, এর মূলে কোনো মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব নেই।

তৃতীয় বিরোধ^{২০} : বাদীপক্ষ - জাগতিক পদার্থগুলির উৎপত্তির পিছনে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্বীকার করাটাই যথেষ্ট নয়। জাগতিক পদার্থের অস্তিত্বের সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনে স্বতন্ত্র কারণ স্বীকার করাটাও আবশ্যিক। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যাক যে, স্বতন্ত্র কারণ বলে কিছু নেই, আছে কেবল প্রাকৃতিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ। এইস্থলে জাগতিক পদার্থসমূহের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় যদি কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কার্য-কারণ নিয়ম স্বীকার করা হয়, তাহলে প্রতিটি ঘটনার কারণ, এবং সেই কারণেরও আবার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। প্রতিটি কার্যই তার পূর্ববর্তী ঘটনার (কারণের) শর্তাধীন। সুতরাং সেই পূর্ববর্তী ঘটনার কারণস্বরূপ অপর একটি ঘটনাকে স্বীকার করতে হবে। এইভাবে চলতে থাকলে কার্য-কারণ পরম্পরার কোনো শেষ অবস্থা পাওয়া যাবে না, এবং কোনো কার্যের উৎপত্তির পিছনে যে পর্যাপ্ত কারণগুলি বিদ্যমান থাকে, তার তালিকাটিও কখনোই সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং প্রাকৃতিক কার্য-কারণ নিয়মের সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এমন এক স্বতন্ত্র কারণ স্বীকার করা আবশ্যিক, যার আর কোনো কারণ নেই, যা অন্য কোনো কিছুর দ্বারা শর্তাধীন নয়। সেটিই হল সমস্ত কারণের মূল কারণ।

প্রতিবাদী - জগতে স্বতন্ত্র কারণ বলে কিছু নেই। আছে কেবল প্রাকৃতিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ। ধরে নেওয়া যাক জগতে স্বতন্ত্র কারণ আছে, যা কোনো কিছুর দ্বারা শর্তাধীন নয়। এক্ষেত্রে এটাও স্বীকার করে নিতে হবে যে, ওই শর্তহীন মূল কারণের দ্বারা যে কার্যের উৎপত্তি হবে, সেই কার্যের কোনো কারণ থাকবে না। কার্য-কারণ সম্পর্ক যেহেতু শর্তাধীন, তাই প্রতিটি কার্যের কারণ স্বীকার আবশ্যিক। এইস্থলে স্বতন্ত্র কোনো কারণ স্বীকার করলে এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। সুতরাং কার্য-কারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বারণের জন্য, স্বতন্ত্র মূল কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কার্য-কারণ নিয়মই জাগতিক পদার্থের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় একমাত্র স্বীকার্য।

^{২০} Ibid, pp. 484-5.

চতুর্থ বিরোধ^{২৪} : বাদীপক্ষ - জগতের অংশ অথবা কারণস্বরূপ এক চরম আবশ্যিক সত্তা অস্তিত্বশীল। এক্ষেত্রে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, জগতের অংশ বা কারণস্বরূপ কোনো চরম আবশ্যিক সত্তার অস্তিত্ব নেই, তাহলে জাগতিক পদার্থসমূহের পরিবর্তনশীলতাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমরা জানি পরিদৃশ্যমান জগৎ কালে বর্তমান থাকে। বর্তমানকালীন কোনো পদার্থের উৎপত্তি যেহেতু তার পূর্ববর্তী কোনো ঘটনার দ্বারা নিয়মিত হয়ে থাকে, এবং পরবর্তী কোনো ঘটনার উৎপত্তি বর্তমান ঘটনা দ্বারা নিয়মিত হয়, তাই বর্তমানকালীন কোনো ঘটনার উৎপত্তিতে তার পূর্ববর্তী ঘটনার উপস্থিতি অবশ্য স্বীকার্য। সমস্যা হল প্রতিটি পূর্ববর্তী ঘটনাই যেহেতু শর্তাধীন, তাই শুধুমাত্র পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারা বর্তমানকালীন কোনো ঘটনার ব্যাখ্যাদান সম্ভব হবে না। কারণ যা স্বয়ং শর্তাধীন, তার দ্বারা সেটি যে পদার্থকে উৎপন্ন করছে, সেই পদার্থটির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। এইস্থলে এক শর্তহীন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যিক, যার দ্বারা জাগতিক পদার্থসমূহের পরিবর্তনশীলতাকে ব্যাখ্যা করা যাবে। সুতরাং বলা যেতেই পারে যে, জগতের অংশ বা কারণস্বরূপ এক চরম অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব আছে।

প্রতিবাদী - জগতের বাইরে বা ভিতরে, জগতের অংশ বা কারণস্বরূপ কোনোপ্রকার চরম আবশ্যিক সত্তা অস্তিত্বশীল নয়। ধরে নেওয়া যাক যে, জগতে শর্তহীন চরম আবশ্যিক সত্তার অস্তিত্ব আছে। এইরূপ সত্তা অবশ্যই জাগতিক পদার্থ সমূহের পরিবর্তনশীল ধারা বা ক্রমের অংশ হবে, অথবা তা সমগ্র ক্রম জুড়েই অবস্থান করবে। এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প অবস্থা অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত, অনুমান করা যেতে পারে যে, জাগতিক পদার্থসমূহের পরিবর্তন ক্রমের প্রথম অবস্থাটি শর্তহীন এবং অনিবার্য, যার দ্বারা পরবর্তী সব অবস্থা বা ঘটনা পরম্পরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এটাও অনুমান করা যায় যে, জাগতিক পদার্থসমূহের পরিবর্তন ধারার প্রতিটি ক্রম বা অবস্থা যেহেতু অন্য ক্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই তা শর্তাধীন, কিন্তু ক্রমসমগ্রটি অন্য কোনোকিছুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়, ফলত তা শর্তহীন। সুতরাং এক্ষেত্রে এক একটি ক্রম শর্তাধীন হওয়ার জন্য তা সম্ভাব্য হলেও, ক্রমসমগ্র যেহেতু শর্তহীন, তাই তা অনিবার্য।

^{২৪} Ibid, pp. 490-1.

যদিও উক্ত দুটি বিকল্পের কোনোটিও এইস্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম বিকল্পটির বক্তব্য হল পরিবর্তনশীল জগতের প্রথম অবস্থা কালিক, কিন্তু তা অন্য কোনোকিছুর দ্বারা শর্তাধীন নয়। এমনটা স্বীকার করা সম্ভব নয়। কারণ যা কিছু কালিক তা অবশ্যই শর্তাধীন। দ্বিতীয় বিকল্পটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল, পরিবর্তনশীল জাগতিক পদার্থসমূহের প্রতিটি ক্রম সম্ভাব্য, কিন্তু ক্রমসমগ্র অনিবার্য, এটাও অসম্ভব। কারণ অংশ যদি অনিবার্য না হয়, তাহলে সেই অংশের সমষ্টিও অনিবার্য হতে পারবে না। সুতরাং জগতে কোনোপ্রকার চরম অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব নেই।

এখন ধরে নেওয়া যাক যে, জগতের বাইরে চরম অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব আছে। আমরা জেনেছি যে, এইপ্রকার অনিবার্য সত্তা জাগতিক পরিবর্তনশীলতার চরম কারণ। সুতরাং জাগতিক পরিবর্তন এইপ্রকার অনিবার্য সত্তাকে নিয়েই আরম্ভ হবে। এই পরিবর্তন যেহেতু কালিক পরিবর্তন, তাই তা সর্বদাই জগতের অন্তর্ভুক্ত, ফলত সেক্ষেত্রে চরম অনিবার্য সত্তাকেও জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। কাজেই জগতের বাইরে কোনো শর্তহীন চরম অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

উপরোক্ত বিরোধগুলিকে পর্যালোচনা করে বোঝা গেল যে, বাদী এবং প্রতিবাদী উভয় পক্ষই স্ব স্ব সিদ্ধান্তের সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। কান্ট এই বিরোধগুলিতে উভয়পক্ষ প্রদত্ত যুক্তিগুলির মধ্যে কোনোপ্রকার ভ্রম আছে বলে মনে করেন না। তাঁর মতে মানুষের বুদ্ধি স্ব-বিরোধ দূর করতে সদা আগ্রহী। তাই তিনি এইপ্রকার বিরোধের প্রকৃত কারণ দর্শনোর চেষ্টা করেছেন। কান্টের মতানুসারে এইপ্রকার বিরোধের মূল কারণ হল ‘অবভাস’-কে ‘স্বগতসত্তা’ হিসাবে মনে করার ভুল। এটি হল এক ধরনের ‘অতীন্দ্রিয় ভ্রম’। আমরা মনে করি যে, অবভাসসমগ্রই হল জগৎ। সেক্ষেত্রে অবভাস অতিরিক্তভাবে যদি অবভাসসমগ্র বলে বাস্তবিক অস্তিত্বশীল কোনো পদার্থ থাকতো, তাহলে তা হয় অন্তর্বিশিষ্ট হত, নাহলে অনন্ত হত। অবভাস আমাদের অনুভবগম্য, কিন্তু অবভাসসমগ্রকে আমরা অনুভবে পাই না। যা কিছু শর্তাধীন তা আমাদের অনুভবে গৃহীত হয়। যা শর্তহীন তা আমাদের অনুভবে ধরা দেয় না, তা হল প্রজ্ঞার ধারণা। যা প্রজ্ঞার ধারণা মাত্র, তাতে বস্তুগত সত্তা আরোপিত হতে পারে না। তাছাড়া আমাদের

অবভাসিক জ্ঞানের কোনো শেষ নেই। তাই তা কখনোই সম্পূর্ণতা লাভ করে না। সুতরাং অবভাসসমগ্র রূপে কোনোকিছুকে লাভ করাই যখন সম্ভবপর নয়, ফলত সেক্ষেত্রে অবভাসসমগ্র অন্তবিশিষ্ট নাকি অনন্ত - এই অনুসন্ধান অর্থহীন।

কান্ট এইপ্রসঙ্গে আরও বলেন যে, অবভাসিক জগতে স্বতন্ত্র কারণ বা অনিবার্য সত্তারূপে কোনো কিছু অস্তিত্বশীল নয় একথা সত্য, কিন্তু অবভাসিক সত্তাকেও আমরা যাবতীয় সত্তা হিসাবে ধরে নিতে পারি না। কারণ অবভাসের মূলে কোনো স্বগতসত্তাক পদার্থ স্বীকার না করলে অবভাসকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। এইরূপ স্বগতসত্তাক পদার্থ বাস্তবে অবভাসিক জগতে না থাকতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত জগতে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে কোনো বাধা নেই। জ্ঞানের দিকদর্শনে এইজাতীয় প্রজ্ঞাপ্রসূত ধারণাগুলির মূল্য অপরিসীম। এইভাবে কান্ট জগৎ সম্পর্কিত বিরোধগুলিকে দূর করার চেষ্টা করেছেন।

ঈশ্বর

আধিবিদ্যার যে বিভাগ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে, তা হল 'যৌক্তিক ধর্মবিজ্ঞান' (rational theology)। কান্টের মতে বাহ্যজগৎ ও মনোজগৎ, এই উভয় জগতের যাবতীয় সত্তার অস্তিত্বের মূলে আমরা যে অতীন্দ্রিয় শর্তহীন সমগ্রের কথা চিন্তা করি, তা হল ঈশ্বর। আধিবিদ্যক অন্যান্য বিষয়ের মতো ঈশ্বরও প্রজ্ঞার ধারণা মাত্র। সুতরাং কান্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে, এই বিষয়ে আর কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, যা কেবল প্রজ্ঞাপ্রসূত ধারণা, তার সম্পর্কে কোনোপ্রকার বাস্তব জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। সমস্যা হল, যৌক্তিক ধর্মবিজ্ঞান এই শর্তহীন ধারণাটিকে আমাদের জ্ঞানের দিকদর্শক হিসাবে না ধরে, এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে মনে করে, এবং এই পদার্থে ব্যক্তিত্বের আরোপ করে তাতে ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের নিমিত্ত যৌক্তিক ধর্মবিজ্ঞানে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, সেগুলি হল - সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তি (ontological argument), জগৎ কর্তৃত্বের যুক্তি (cosmological argument) এবং উদ্দেশ্যমূলক

যুক্তি (teleological argument)। এই যুক্তিগুলি সম্পর্কে কান্টের অভিমত ব্যক্ত করা যেতে পারে^{২৫}।

সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তি - এই যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর হলেন পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ সত্তা। এইরূপ পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য হয়ে পড়ি। কারণ ঈশ্বর যেহেতু পূর্ণ সত্তা, সেহেতু তিনি সর্বগুণের অধিকারী। এহেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে তাঁর পূর্ণতার হানি হয়। কোনোকিছুর সত্তা আছে, অথচ তা অস্তিত্বশীল নয়, এমন ভাবটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কান্টের বক্তব্য হল, পূর্ণ সত্তার অস্তিত্ব আছে এরূপ চিন্তা করা গেলেও, তার অস্তিত্বের সপক্ষে কোনো প্রমাণ দর্শনো সম্ভব নয়। তাঁর মতে অস্তিত্বশীল হওয়া বা না হওয়ার সঙ্গে, ধারণা থাকা বা না থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং পূর্ণ সত্তার অস্তিত্ব আছে একথা না মানলে তার ধারণা অপূর্ণ থেকে যাবে, এমন যুক্তির কোনো বাস্তব ভিত্তি কান্ট খুঁজে পান না। তাই তিনি যৌক্তিক ধর্মবিজ্ঞানের সত্তাতাত্ত্বিক যুক্তির ভিত্তিকে ভ্রমাত্মক বলে মনে করেছেন।

জগৎ কর্তৃত্বের যুক্তি - এই যুক্তিতে বলা হয়ে থাকে যে, জাগতিক বস্তুসমূহের মূলে কোনো এক কর্তার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। আমরা জানি যাবতীয় জাগতিক বস্তুসমূহ শর্তাধীন ও সম্ভাব্য। এর মূল কারণ হিসাবে এক শর্তহীন অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করাটা অপরিহার্য। সেই জগৎকর্তারূপ সত্তাই হল ঈশ্বর। যদিও কান্ট মনে করেন, জগতের কর্তারূপে যদি ঈশ্বরকে স্বীকার করতেই হয়, তাহলে সেই ঈশ্বর জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। তাঁর স্থান হবে জগতের বাইরে। সেক্ষেত্রে জগতের বাইরেও কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে বলে মনে নিতে হবে, কিন্তু এমনটা সম্ভব নয়। কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনুভবগম্য পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, জগতের বাইরে যার অবস্থান তা অনুভব অগম্য। ফলত সেই পদার্থের সঙ্গে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। সুতরাং জগতের মূল কারণস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনোপ্রকার জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব।

^{২৫} Ibid, pp. 563-78.

উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি - এই যুক্তিতে দাবি করা হয় যে, জগৎ কোনো এক সচেতন কর্তার উদ্দেশ্যমূলক কর্ম বা সৃষ্টি। জাগতিক বস্তুসমূহের যে গঠনগত বিন্যাস, তার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, এইরূপ সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ রচনা কৌশল কোনো এক সর্বাধিক বৌদ্ধিক ক্ষমতাসম্পন্ন স্রষ্টার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। যেকোনো শিল্পকর্ম থেকে যেমন শিল্পীর অস্তিত্বের অনুমান হয়, ঠিক তেমনই মানুষ, উদ্ভিদ ইত্যাদি জাগতিক পদার্থসমূহের সৃষ্টিকর্তারূপে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুমান হয়ে থাকে। কান্ট এইপ্রকার যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। যদিও তিনি একথা স্বীকার করে নেন যে, এই যুক্তি সাধারণ জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কান্টের মতে এইপ্রকার যুক্তি ভ্রমাত্মক, কারণ এর দ্বারা ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করা গেলেও, তা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। তিনি দু'ভাবে উক্ত যুক্তির অসাড়া প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমত, কান্ট মনে করেন, উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে জগতের নির্মাতা বা রচয়িতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু কখনোই জগতের স্রষ্টা হিসাবে প্রমাণ করা যায় না^{২৬}। এক্ষেত্রে রচয়িতা ও স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্যটা একটু বোঝা দরকার। আমরা যখন বলি যে, কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্মাণ করেন, তখন কুম্ভকারের রচনা কৌশল ওই ঘট উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। লক্ষণীয় যে, কুম্ভকার তার রচনা কৌশল দ্বারা ঘট উৎপাদন করলেও, তিনি কিন্তু মৃত্তিকা সৃষ্টি করেন না। মৃত্তিকার উপর নিজের রচনা কৌশল ব্যক্ত করেন মাত্র। একইভাবে ঈশ্বরও জগৎ গঠনের উপাদানের স্রষ্টা নন। তিনি জাগতিক উপাদানসমূহের দ্বারা আপন রচনা কৌশল অবলম্বন করে জগৎ গঠন করে থাকেন। এক্ষেত্রে ঈশ্বর হলেন জগতের রচয়িতা, তিনি কখনোই সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন না। সুতরাং জগতের স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, তা একটি বিভ্রান্তিকর প্রয়াস মাত্র।

দ্বিতীয়ত, জগৎ রচনার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে অসামান্য শক্তির অধিকারী এবং সর্বাধিক বৌদ্ধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পদার্থ হিসাবে স্বীকার করা হলেও, তাঁকে সর্বজ্ঞ বা

^{২৬} “Thus the proof could at most establish a highest architect of the world,... but not a creator of the world,...”, Ibid, p. 581.

সর্বশক্তিমানরূপে চিন্তা করা যায় না। যেহেতু জগৎ এক মহৎ পদার্থ, তাই এহেন পদার্থের রচয়িতাকেও সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। সেক্ষেত্রে সর্বাধিক জ্ঞানী বা সর্বাধিক শক্তির অধিকারী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাঁকে সর্বজ্ঞ বা সর্বশক্তিমানরূপে স্বীকার করে নিতে হবে। সুতরাং উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির দ্বারাও ধর্মবিজ্ঞান স্বীকৃত ঈশ্বরের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না।

কান্ট ঈশ্বরের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানলাভের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ঈশ্বর চিন্তায় তাঁর কোনো অসুবিধা ছিল না, কিন্তু মানববুদ্ধিকে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে অসমর্থ হিসাবে মনে করেছেন। শুধুমাত্র যৌক্তিক বিচারের মাধ্যমে ঈশ্বর আছেন কি নেই, এমন জ্ঞানলাভ করতে পারা অসম্ভব বলেই তাঁর অভিমত।

অধিবিদ্যা সম্ভব কী সম্ভব নয়, সেই সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা গেলো যে, অধিবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ, যেমন যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান আত্মা সম্বন্ধে, যৌক্তিক বিশ্ববিজ্ঞান জগৎ সম্বন্ধে এবং যৌক্তিক ধর্মবিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের দাবিটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানা যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করলেও কান্ট মনে করেন যে, ওইসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করাটা মানুষের সাধ্যাতীত। তাঁর মতে বিজ্ঞান হিসাবে আধিবিদ্যক জ্ঞানলাভ সম্ভব না হলেও, মানুষের বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে অধিবিদ্যার চর্চা ফলপ্রসূ। তথাকথিত আধিবিদ্যক বিষয়গুলিকে কান্ট মানুষের প্রজ্ঞাপ্রসূত ধারণা হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এইরূপ শর্তহীনতার ধারণা মানুষের প্রজ্ঞার সুস্থতার লক্ষণ। সেক্ষেত্রে এই শর্তহীন ধারণাগুলিকে শুধুমাত্র ধারণা হিসাবে গ্রহণ না করে যদি এগুলিকে জ্ঞান পদবাচ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়, তাহলে মানুষ ভ্রমে পতিত হয়। যদিও কান্ট মনে করেন যে, আধিবিদ্যক চর্চায় আমরা যে শর্তহীন ধারণার অনুসন্ধান করি, তার দ্বারাই আমাদের জ্ঞানের আদর্শ নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সেগুলি জ্ঞানের আদর্শ, কিন্তু জ্ঞান নয়। মানববুদ্ধি তার জ্ঞানে সর্বদা শর্তহীন সমগ্ররূপ আদর্শকেই উপলব্ধি করতে চায়, এবং এটাই হল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। এই আদর্শের কারণেই মানুষের মধ্যে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং জ্ঞানলাভের

প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তাই জ্ঞানের আদর্শ ও দিকদর্শকরূপে^{২৭} আধিবিদ্যক বিষয়গুলির চর্চা একান্ত প্রয়োজনীয়। যদিও বিজ্ঞান হিসাবে অধিবিদ্যা সম্ভব নয়। আমরা জানি বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কান্ট পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেক্ষেত্রেও অধিবিদ্যায় সাধারণত যে বিষয়গুলি নিয়ে চর্চা করা হয়, সেগুলি সংশ্লেষক হতে পারে না, কারণ তা অনুভবযোগ্য নয়। অর্থাৎ সেগুলির কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না। আবার সেগুলিকে পূর্বতসিদ্ধও বলা যায় না, কারণ যদিও আধিবিদ্যক বিষয়গুলির ধারণা প্রজ্ঞাপ্রসূত, কিন্তু তা সার্বজনীন নয়। এই বিষয়গুলিকে নিয়ে মতবিরোধ সর্বদাই লক্ষ করা যায়। কান্টের মতে বিজ্ঞানের পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞান সম্পর্কে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। সেগুলি সর্বকালে, সর্বদেশে, সবার ক্ষেত্রে একইভাবে গৃহীত হয়ে থাকে, তাই তা সার্বজনীন। অপরদিকে আধিবিদ্যক বিষয়গুলিকে নিয়ে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যায়। উপরন্তু সেগুলি যে কখনোই জ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে না, সেকথা পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং কান্টকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞান হিসাবে অধিবিদ্যা সম্ভব না হলেও, মানুষের বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে অধিবিদ্যা সম্ভব এবং আধিবিদ্যক বচনগুলিও অর্থহীন নয়।

কান্ট মনে করতেন বিজ্ঞানের জ্ঞানটাই সব নয়। বিজ্ঞান ছাড়াও মানুষ ধর্ম বা নৈতিক বিষয়েও জ্ঞানলাভ করতে আগ্রহী। যদিও ধর্ম বিশ্বাস হল কেবল বিশ্বাস, তা কখনোই জ্ঞান পদবাচ্য নয়। আবার নৈতিকতার আলোচনায় কিছু স্বীকার্য সত্য অত্যাৱশ্যক। এই সমস্ত ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক স্বীকার্য সত্যগুলিকে আমরা আধিবিদ্যক অনুসন্ধানের ফলেই লাভ করে থাকি। তাই আধিবিদ্যক আলোচনা অর্থহীন নয়। ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরতা, বা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা চিন্তা না করলে মানুষের ব্যবহারিক তথা নৈতিক জীবন অচল হয়ে পড়বে।

^{২৭} Ibid, pp. 614-5.

নীতিবিদ্যা :

শুদ্ধ প্রজ্ঞার দ্বারা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে গেলে অতীন্দ্রিয় ভ্রান্তির স্বীকার হতে হয়, সেই একই বিষয় ব্যবহারিক প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির দ্বারা নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই ব্যবহারিক প্রজ্ঞাই হল নৈতিকতার উৎসস্থল।

ধ্রুপদী ধ্যান-ধারণাকে অনুসরণের মধ্য দিয়ে কান্টের নৈতিক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটটিও রচিত হয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করেই। কান্টের মতে প্রত্যেকের বুদ্ধি এক হলেও, ক্রিয়াভেদে ওই একই বুদ্ধিকে দুটি ভিন্ন প্রকারে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একটি হল ‘তাত্ত্বিক বুদ্ধি’ (theoretical reason) এবং অপরটি হল ‘ব্যবহারিক বুদ্ধি’^{২৮} (practical reason)। তাঁর মতে উক্ত ব্যবহারিক বুদ্ধির আবার এক শুদ্ধ রূপ আছে, সেই শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি (pure practical reason) হল নৈতিকতার উৎসস্থল। নৈতিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দুই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হল নিখুঁত শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা (ঈশ্বর), এবং অপরটি হল শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা (সাধারণ মানুষ)। নিখুঁত শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা বলতে কান্ট সেই সত্তাকেই বুঝিয়েছেন যাঁর কোনো ইন্দ্রিয়বৃত্তিজনিত কামনা-বাসনা থাকে না, আছে কেবল শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি। ফলত এইরূপ সত্তার কোনো বিষয়নিষ্ঠ কর্মনীতিও থাকে না, এঁরা শুধুমাত্র বিষয়নিষ্ঠ নৈতিক নিয়মের অধিকারী। কান্টের মতে ঈশ্বরই হল একমাত্র নিখুঁত বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা; যাঁর অবস্থান সকল প্রকার কামনা বাসনার উর্দে। কোনোপ্রকার ফললাভের আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

অপরপক্ষে শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা বলতে কান্ট সাধারণ মানুষের কথাই বুঝিয়েছেন। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিও আছে আবার ইন্দ্রিয়বৃত্তিজনিত কামনা-বাসনাও আছে। তাই একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়বৃত্তিজনিত বিষয়ীগত কামনা-বাসনাগুলি তাকে নৈতিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়, তেমনি আবার বুদ্ধি তার কাছে নৈতিক

^{২৮} Lewis White Beck, *A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason*, Chicago University Press, Chicago, 1966, pp. 37-41.

নীতির প্রতি আনুগত্য দাবি করে। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে বুদ্ধির সঙ্গে কামনা-বাসনার দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে। কান্টের মতে সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনোই এই দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো সম্ভবপর নয়, কিন্তু দ্বন্দ্ব নিরসনের অবিরাম প্রচেষ্টা সবাইকে চালিয়ে যেতে হবে। মানুষ যে সর্বদাই শুধুমাত্র বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় এমন নয়। সে কখনো কখনো ভালোবাসা, লোভ, মোহ, রাগ প্রভৃতি আবেগের বশবর্তী হয়ে পড়ে, ফলে আশা-আকাঙ্ক্ষার জগতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে কান্টের বক্তব্য হল - কোনো মানুষ যত বেশী তার ব্যবহারিক বুদ্ধির অনুশীলন করবে, সে ততই নৈতিকতার উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হতে পারবে। এইভাবে ব্যবহারিক বুদ্ধির অধিক থেকে অধিকতর চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ তার বিষয়ীগত আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ‘সৎ ইচ্ছা’ দ্বারা পরিচালিত হতে পারবে, এবং প্রশস্ত হবে নৈতিকতার পথ। তাঁর মতে আবেগ মানুষের যেকোনো কাজের অনুষ্ণ হলেও সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে, তা যেন প্রধান পরিচালিকা শক্তিরূপে সক্রিয় না হতে পারে। নতুবা কাজটি নৈতিক ক্রিয়ারূপে পরিগণিত হবে না।

কান্টের মতে ‘সৎ ইচ্ছা’ (good will) দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ যখন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কেবলমাত্র কর্তব্য সাধনের উদ্দেশ্যেই কর্তব্য করে, তখনই তার সেই কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। তাঁর মতে এই জগতে এমনকি জগতের বাইরেও সৎ ইচ্ছা ব্যতীত নিঃশর্ত ভালো আর কিছু নেই।

এপ্রসঙ্গে কান্ট সৎ ইচ্ছাকেই একমাত্র বিষয়রূপে চিহ্নিত করেছেন, যা শর্তহীন বা নিরপেক্ষভাবে সৎ^{২৯}। তাঁর মতানুসারে যে ইচ্ছা ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়াই আমাদের কর্তব্যবোধে উদ্ভূত করে সেই ইচ্ছাই হল সৎ ইচ্ছা। এই সৎ ইচ্ছা ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রকার প্রবণতা, যেগুলিকে আমরা ভালো বলে মনে করি, যেমন সম্পদ, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদিকে কান্ট শর্তাধীন বা ব্যক্তিসাপেক্ষ অর্থে ভালো বলেছেন। অর্থাৎ যেগুলি কিনা কোনো না কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ভালো। এইজাতীয়

^{২৯} “...a good will alone is good in all circumstances and in that sense is an absolute or unconditioned good.”, Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, trans. by H.J.Paton, as *The Moral Law*, Hutchinson and Co. Ltd. London, 1976, p. 17.

শর্তাধীন বা ব্যক্তিসাপেক্ষ ভালো বিষয়গুলি পরিস্থিতি বা ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপন্ন করে থাকে। সেক্ষেত্রে এগুলি যদি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সং ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে তা ভালো বা কল্যাণকর ফল উৎপন্ন করে, কিন্তু যদি এগুলি অশুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে তা মন্দ বা হানিকর ফল উৎপন্ন করবে। এই কারণেই কান্ট বলেছেন যে, সং ইচ্ছাই হল একমাত্র স্বতঃমূল্যবান অর্থাৎ নিজ মূল্যে মূল্যবান। এইপ্রকার সং ইচ্ছার সঙ্গে যদি অন্য কোনো গুণাবলী বা প্রেক্ষিত যুক্ত নাও হয়, অথবা সং ইচ্ছাবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি শত চেষ্টাতেও আশানুরূপ ফল উৎপাদনে সমর্থ না হয়, তাহলেও ‘সং ইচ্ছা’ স্বতঃমূল্যবান বস্তুরূপে নিজপ্রভায় আলোকিত হয়ে থাকবে।

কান্টকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, উক্তপ্রকার সং ইচ্ছা, ব্যবহারিক বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, সং ইচ্ছা এবং ব্যবহারিক বুদ্ধির মধ্যে একপ্রকার অবিভাব সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ একটি অপরটিকে ছাড়া থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল, বুদ্ধি যদি অভ্রান্তভাবে ইচ্ছাকে নির্ধারণ করতে পারে, তাহলে সেই ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত কার্য বা আচরণের ক্ষেত্রে যেমন বিষয়গত আবশ্যিকতার দাবি জানানো যাবে, একইভাবে বিষয়গত আবশ্যিকতার দাবিও করা সম্ভব হবে। এইস্থলে উক্ত ইচ্ছাটি হবে সং ইচ্ছা, যা হল একপ্রকার শক্তি বা ক্ষমতা। ওই সং ইচ্ছার দ্বারা মানুষ তার ব্যক্তিগত কামনা-বাসনাগুলির মধ্যে কোন্গুলির বিষয়গত আবশ্যিকতা আছে তা নির্বাচন করতে সক্ষম, এবং সেটাই হবে শুভ বা ভালো। সেক্ষেত্রে বুদ্ধি যদি সঠিক ইচ্ছা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত না হয়, অর্থাৎ ইচ্ছাটি যদি এমন হয় যা কেবলমাত্র বিষয়গত শর্ত বা অবস্থাগুলিকেই প্রকাশ করে, এবং সেগুলি যদি সর্বদা বিষয়গতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে সেই ইচ্ছাপ্রসূত কর্ম বা আচরণগুলি বিষয়গতভাবেও অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে^{৩০}। এই কারণেই কান্ট সং ইচ্ছা এবং ব্যবহারিক বুদ্ধিকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল সাধারণ মানুষ তার ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা সং ইচ্ছাকে সঠিকভাবে নির্বাচন করে নৈতিক

^{৩০} Ibid, pp. 76-7.

নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখেই কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করে থাকে। সব মানুষ যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী, তাই কেউই নৈতিক নিয়মের বাধ্যতামূলক শক্তিকে অস্বীকার করতে পারে না। প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যিক যে, কান্ট নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে যে ব্যবহারিক বুদ্ধির কথা বলেছেন, সেই ব্যবহারিক বুদ্ধি নেহাতই দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ বুদ্ধি নয়। এই বুদ্ধি হল শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি যা শুদ্ধ বুদ্ধির একপ্রকার ব্যবহারিক রূপ।

নৈতিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে কান্ট সাধারণ মানুষের বিষয়ীগত নীতির (maxim) প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষই তার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতে গিয়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তিজনিত কামনা-বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপ বা আচরণের অনুষ্ঠান করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিভেদে কামনা-বাসনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ফলে তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ীগত নীতি অনুসরণ করে কাজ করে। সেই সমস্ত বিষয়ীগত নীতিগুলিকে যদি সঙ্গতিপূর্ণভাবে শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা সার্বিকীকরণ করা যায়, তাহলে সেটি একটি বিষয়গত নীতিতে পরিণত হবে। কান্ট এই ধরনের বিষয়গত নীতিগুলিকে আকারগত এবং উপাদানবর্জিত নীতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত উপাদানবর্জিত আকারগত নীতিগুলিই নৈতিক নিয়ম হওয়ার সম্ভাবনায়ুক্ত হয়। নিখুঁত শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর এই নিয়মের প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধাশীল হন বলে এগুলি তাঁর কাছে নৈতিক (moral law) নিয়ম হিসাবেই আসে। অপরপক্ষে মানুষ সাধারণত ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিকারী হওয়ার ফলে সে নৈতিক নিয়মের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধাশীল নয়। তাই নৈতিক নিয়মগুলি তাদের কাছে নৈতিক আদেশ হিসাবেই আসে। এই নৈতিক আদেশগুলি বাহ্য-আরোপিত নয়, এগুলি স্ব-আরোপিত আদেশ। বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় এই আদেশ মেনে চলে। এইপ্রকার নৈতিক আদেশকে কান্ট পারিভাষিক অর্থে নৈতিক ‘অনুজ্ঞা’ (imperative) বলেছেন। এই অনুজ্ঞা অভিজ্ঞতা-পূর্ব কারণ তা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে না, কিন্তু এর প্রয়োগ সংশ্লেষণাত্মক, যেহেতু এই অনুজ্ঞার ভিত্তিতে দৈনন্দিন জীবনের বিষয়ীনিষ্ঠ

কর্মনীতির গ্রহণযোগ্যতার বিচার চলতে থাকে। তাঁর মতে নৈতিক অনুজ্ঞাগুলি হল এমন একপ্রকার কর্মনীতি (principle of action) যা আমাদের বুদ্ধির আদেশের দ্বারা আমাদের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে। ‘উচিত’ বা ‘ought’ শব্দের দ্বারা এই অনুজ্ঞাগুলিকে বোঝানো হয়ে থাকে।

কান্ট দুই ধরনের অনুজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন, একটি হল ‘শর্তাধীন অনুজ্ঞা’ (hypothetical imperative) এবং অপরটি হল ‘শর্তহীন অনুজ্ঞা’^{৩১} (categorical imperative)। তাঁর মতে শর্তাধীন অনুজ্ঞার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ যখন কোনো কার্য সম্পাদন করতে চায়, সেই কার্য সম্পাদনের পিছনে সর্বদাই তার নিজের কোনো না কোনো বিষয়ীগত ফললাভ বা অভিস্টিসিদ্ধির পরিকল্পনা যুক্ত হয়ে থাকে। এইপ্রকার অনুজ্ঞা সর্বদাই কোনো না কোনো উদ্দেশ্যাত্মিক কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়। সাধারণত ‘যদি-তাহলে’ আকারের বাক্যগুলির দ্বারা এইজাতীয় অনুজ্ঞা প্রকাশ পায়। যেমন ধরা যাক, কোনো মানুষকে বলা হল যে, ‘তুমি যদি জীবনে সাফল্য অর্জন করতে চাও, তাহলে তোমার অবশ্যই কঠিন পরিশ্রম করা প্রয়োজন’, - এই বাক্যটিতে যে উক্তি বা আদেশের পরিচয় পাওয়া গেল সেখানে শর্ত ও ফলাকাজ্ঞার উপস্থিতি খুবই স্পষ্ট। এক্ষেত্রে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারাটা হল কাজিফল এবং তৎপ্রযুক্ত কঠিন পরিশ্রম করাটা হল ওই ফলাফলের শর্ত। ফলত নিঃশর্ত বা শর্তহীনভাবে কর্ম সম্পাদনের আদেশ এখানে দেওয়া হয়নি। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি শর্তসাপেক্ষ আদেশ, অর্থাৎ শর্তাধীন অনুজ্ঞা। এইপ্রকার অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে ফলাফল বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং তার উপায় বা শর্তের মধ্যে একপ্রকার কার্য-কারণ সম্পর্ক সর্বদাই নিহিত থাকে।

অপরপক্ষে শর্তহীন অনুজ্ঞাগুলি হল নিঃশর্ত আদেশ। এইপ্রকার আদেশ পালনের ক্ষেত্রে কোনো ফলাফল বা উদ্দেশ্যলাভের বিষয়টি যুক্ত থাকে না। এই আদেশ মানুষের উপর শর্তহীনভাবে আরোপিত হয়। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ‘উচিত’ শব্দের দ্বারা এইপ্রকার আদেশ বা অনুজ্ঞাকে বোঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং এই অনুজ্ঞার আকারটি হল - ‘তোমার এই কাজ করা উচিত’। এখানে উচিত শব্দটির দ্বারা

^{৩১} “All imperatives command either hypothetically or categorically.”, Ibid, p. 78.

মানুষের নৈতিক দায়বদ্ধতাকে সূচিত করা হয়েছে, কোনোপ্রকার অভীষ্টলাভের প্রসঙ্গ এখানে অনুপস্থিত।

প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যিক যে, কোনো অনুজ্ঞা 'যদি-তাহলে' আকারে থাকলেই তা শর্তাধীন অনুজ্ঞা হবে, এবং 'উচিত' শব্দের দ্বারা প্রযুক্ত অনুজ্ঞা আবশ্যিকভাবেই শর্তহীন অনুজ্ঞা হবে এমন নয়। সাধারণত 'যদি-তাহলে' শব্দগুলি শর্তাধীন অনুজ্ঞার এবং 'উচিত' শব্দটি শর্তহীন অনুজ্ঞার জ্ঞাপক হলেও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। পূর্বের উদাহরণ দুটিকে আশ্রয় করেই বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

পূর্বে শর্তাধীন অনুজ্ঞার উদাহরণ হিসাবে যে বাক্যটি গৃহীত হয়েছে তা হল - 'তুমি যদি জীবনে সাফল্য অর্জন করতে চাও, তাহলে তোমার অবশ্যই কঠিন পরিশ্রম করা প্রয়োজন'। এই বাক্যটির আকারের সামান্য পরিবর্তন করে এটিকে যদি 'উচিত' শব্দযোগে পরিবেশন করা হয়, তাহলে যা দাঁড়ায় তা হল - 'তুমি যদি জীবনে সাফল্য অর্জন করতে চাও, তাহলে তোমার অবশ্যই কঠিন পরিশ্রম করা উচিত। এক্ষেত্রে 'উচিত' শব্দযোগে পরিবেশিত হওয়া বাক্যটি আপাতভাবে নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি নিঃশর্ত অনুজ্ঞা নয়। কারণ কান্ট-এর মতে নিঃশর্ত অনুজ্ঞা হল তাই, যা অপর কোনো লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো একটি কাজকে অবশ্যকরণীয় রূপে গণ্য না করে, কেবলমাত্র কাজটির জন্য কাজটিকে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে অবশ্যকরণীয় বলে মনে করে। এইস্থলে দেখা যাচ্ছে যে, স্পষ্টভাবেই একটি বিষয়নিষ্ঠ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যপূরণের নিমিত্তই কাজটিকে অবশ্যকরণীয় রূপে গণ্য করা হয়েছে। কেবলমাত্র কাজটি করার জন্য কাজটি করা উচিত, বা কাজটি করা কর্তব্য তাই কাজটি করা উচিত, এইজাতীয় কোনো আদেশের সন্ধান এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। এইপ্রকার শর্তাধীন অনুজ্ঞাগুলি যেহেতু ফললাভের সঙ্গে যুক্ত, তাই এই অনুজ্ঞার সঙ্গে সার্বিকভাবে আবশ্যিকতার ধারণার কোনো যোগাযোগ নেই। যে ব্যক্তি ফললাভে ইচ্ছুক, সে এই অনুজ্ঞা মানবে, এবং যে ব্যক্তি ফললাভে ইচ্ছুক নয়, সেই ব্যক্তি এই অনুজ্ঞা মেনে চলবে না। ফলে এই অনুজ্ঞার মধ্যে এমন কোনো বাধ্যতামূলক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, যা সকল মানুষকে উক্ত আদেশ পালনে বাধ্য করবে। সেই কারণে কান্ট

এইজাতীয় অনুজ্ঞাকে আপাতিক বলেছেন। ব্যক্তিসাপেক্ষতাই এইপ্রকার অনুজ্ঞার আপাতিক হওয়ার সপক্ষে জোরাল ভিত্তিস্বরূপ।

একইভাবে শর্তহীন অনুজ্ঞার ক্ষেত্রেও এই ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। আমরা দেখেছি যে, শর্তহীন অনুজ্ঞা সাধারণত 'উচিত' শব্দের দ্বারা প্রকাশ পায়। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে 'উচিত' শব্দযোগে কোনো আদেশ প্রকাশিত হলেও তা আক্ষরিক অর্থে শর্তহীন অনুজ্ঞা না হয়ে শর্তাধীন অনুজ্ঞাও হতে পারে। অনুরূপভাবে 'যদি-তাহলে' আকারের বাক্যগুলির মাধ্যমেও শর্তহীন অনুজ্ঞা প্রকাশ পেতে পারে। সেক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, শর্তহীন অনুজ্ঞার প্রতিপাদ্য মূল নীতিটি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা। অর্থাৎ কার্যটি ফলাকাজক্ষা বর্জিতভাবে কর্তব্যবোধের তাড়নায় সংঘটিত হচ্ছে, নাকি প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তার মধ্যে কোনো না কোনো ফলাকাজক্ষা থেকে গেছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক কোনো ব্যক্তিকে বলা হল - 'তুমি যদি কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দাও, তাহলে তুমি অবশ্যই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে'। উক্ত বাক্যটি 'যদি-তাহলে' আকারের হলেও, এই আদিষ্ট বাক্যটির মধ্যে কোনোপ্রকার বিষয়ীগত ফললাভের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। বরং বাক্যটির মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে একপ্রকার ঔচিত্যজ্ঞাপক কর্তব্যবোধ, যে কর্তব্যবোধ মানুষকে নিঃশর্ত কর্ম সম্পাদনে উজ্জীবিত করবে। ফলে এটি অবশ্যই শর্তহীন অনুজ্ঞার উদাহরণরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।

কান্ট-এর মতে যেখানে ঔচিত্যের বিষয়টি শর্তহীনভাবে আরোপিত হয়, সেখানে আমরা বিষয়ীগত ইচ্ছার পরিবর্তে বুদ্ধির আদেশের দ্বারা পরিচালিত হই। যেহেতু বুদ্ধির আদেশ প্রতিটি ব্যক্তি মেনে চলতে চায়, সেহেতু এর বাধ্যতামূলক শক্তিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই কান্ট নিঃশর্ত অনুজ্ঞার আবশ্যিকতার সপক্ষে জোরাল দাবি জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে নিঃশর্ত অনুজ্ঞার দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা কান্ট উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নিঃশর্ত অনুজ্ঞা সার্বিক হবে অর্থাৎ তা সবার ক্ষেত্রে বিধিরূপে প্রযোজ্য হবে। এবং দ্বিতীয়ত, তা আবশ্যিক হবে অর্থাৎ এর কোনো ব্যতিক্রম থাকলে চলবে না। কান্ট

যেহেতু ফলমুখী নৈতিকতার সমর্থক নন, তাই ফললাভের সঙ্গে জড়িত কোনো বিষয়কেই তিনি নৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব দিতে চাননি। এই কারণেই তিনি নৈতিক নিয়ম বা নীতি হিসাবে কেবলমাত্র শর্তহীন অনুজ্ঞাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে কোনো বিষয়ীগত নীতি, নৈতিক নিয়ম হতে পারে কিনা তা নির্ধারিত হবে শর্তহীন অনুজ্ঞা দ্বারা। এই শর্তহীন অনুজ্ঞাগুলি কোনো যথোচিত কর্মের মানদণ্ড নয়, এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিষয়ীগত কর্মনীতিগুলির গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে মাত্র। আমরা শর্তহীন অনুজ্ঞা বলতে ঠিক কী বুঝবো, সেই প্রসঙ্গে কান্ট কতকগুলি সূত্র প্রদান করেছেন। তিনি শর্তহীন অনুজ্ঞার প্রকৃতি সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের উপস্থাপনা করলেও, তাঁর ভাষ্যকাররা মনে করেন যে, ওই সমস্ত সূত্রগুলির মূল বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন।

কান্টীয় নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে নিঃশর্ত অনুজ্ঞার পাঁচ প্রকার সূত্র-এর পরিচয় পাওয়া যায়। কান্টকে অনুসরণ করে উক্ত সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা যেতে পারে। সেগুলি হল-

১) সার্বিক নিয়মের সূত্র^{৩২} (The Formula of the Universal Law) : এই সূত্র প্রসঙ্গে কান্ট তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের উচিত এমন এক কর্মনীতি অনুসারে কাজ করা, যে কর্মনীতিকে সে একইসময়ে একটি সার্বিক নিয়মে পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারবে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন কোনো এক বিষয়িনিষ্ঠ কর্মনীতি অনুসরণ করে কাজ করে, তখন একইসঙ্গে সে যেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করতে পারে যে, তাঁর ওই বিষয়িনিষ্ঠ কর্মনীতিটি একটি সার্বিক নিয়মে পরিণত হোক। এইভাবে কোনো একটি বিষয়িনিষ্ঠ কর্মনীতিকে সার্বিক নিয়মে পরিণত করার অভিপ্রায়ের মধ্যে দিয়ে ওই নীতিটির বিষয়নিষ্ঠতা এবং নৈতিক নিয়ম হওয়ার যোগ্যতা প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে কোনো একটি বিষয়িনিষ্ঠ কর্মনীতির অভিপ্রায়মূলক সার্বিকীকরণ সম্ভব হলেই যে তা একটি শর্তহীন অনুজ্ঞায় পরিণত হবে এমন নয়। সেক্ষেত্রে ওই কর্মনীতির স্ব-বিরোধহীন সার্বিকীকরণ সম্ভব হচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টিপাত

^{৩২} Ibid, pp. 83-4.

করতে হবে। সুতরাং যদি কোনো বিষয়ীগত কর্মনীতিকে স্ব-বিরোধহীনভাবে সার্বিক নিয়মে পরিণত করা না যায়, তাহলে তা শর্তহীন অনুজ্ঞা হতে পারবে না। শর্তহীন অনুজ্ঞার পর্যায়ে উন্নীত হতে গেলে বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতির স্ব-বিরোধহীন সার্বিকীকরণ আবশ্যিক।

বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, এক ব্যক্তি জীবনে চরম দুঃখ পেয়েছে বলে সে আত্মহত্যা করতে চায়। ওই ব্যক্তি যদি তার এই বিষয়ীগত কর্মনীতিটিকে সার্বিকীকরণ করতে চায়, তাহলে সেই সার্বিক নীতির আকারটি হবে এইরকম যে - ‘যদি কোনো ব্যক্তি জীবনে চরম দুঃখ পেয়ে থাকে, তাহলে তার আত্মহত্যা করা উচিত’। এই নীতিটি আপাতভাবে সার্বিক হলেও, তা নিঃশর্ত অনুজ্ঞা হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ এই নীতিটি স্ব-বিরোধ দোষে দুষ্ট। আত্মমুখী কর্তব্য অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ ও দীর্ঘায়িত করা কর্তব্য। ফলে জীবনে চরম দুঃখের সম্মুখীন হলেই যে জীবন বিসর্জন দিতে হবে, এমন কর্মনীতি অনুসরণ করাটা প্রত্যেকের কাছে কাম্য নাও হতে পারে। সুতরাং এইস্থলে আত্মপ্রেমের সঙ্গে আত্মহত্যার নীতির একটি সরাসরি সংঘাত সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে কেউ কেউ মনে করবে যে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করা উচিত। আবার একইসঙ্গে কেউ কেউ মনে করবে যে, কোনো পরিস্থিতিতেই আত্মহত্যা করা উচিত নয়। ফলত একই সময়ে ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের দ্বন্দ্ব নীতিটি স্ব-বিরোধী হয়ে পড়বে, এবং সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। এইস্থলে স্ব-বিরোধহীনভাবে যথাযথ সার্বিকীকরণ করতে না পারার ফলে, নীতিটি নিঃশর্ত অনুজ্ঞা হতে পারবে না।

২) প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্র^{১০০} (The Formula of the Law of Nature) : এই সূত্র প্রসঙ্গে কান্ট-এর বক্তব্য হল, নৈতিক নিয়মগুলির কেবলমাত্র সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা থাকলেই তা শর্তহীন অনুজ্ঞা হবে এমন নয়। শর্তহীন অনুজ্ঞা হতে গেলে নৈতিক নিয়মগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় সার্বিক গ্রহণযোগ্য হতে হবে। প্রাকৃতিক নিয়মের বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, তা সম-অবস্থায় সম-আচরণ করে, এর কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ

^{১০০} Ibid, pp. 84-6.

করা যায় না। কান্ট-এর মতে প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে মানুষ যেভাবে ধ্রুবসত্য বলে স্বীকার করে নেয়, ঠিক সেইভাবে যদি নৈতিক নিয়মগুলিও গৃহীত হয়, তাহলে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, এক ব্যক্তির কিছু অর্থের প্রয়োজন, তাই সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থঋণ নিতে চাইছে। যদিও সে এটা জানে যে, আর্থিক ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করার মত সামর্থ্য তার নেই, এবং একইসঙ্গে সে এও জানে যে, যদি আর্থিক ঋণ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি না দেয়, তাহলে তার পক্ষে কারোর কাছ থেকে অর্থঋণ আদায় করা সম্ভবপর হবে না।

উক্ত পরিস্থিতিতে ওই ব্যক্তিটি যে বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতি অনুসরণ করে কাজ করবে তা হল - ‘আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এটা জেনে যে, আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবো না’। এই বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতিটি সার্বিক নিয়মে পরিণত হোক, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করা সেই ব্যক্তির নিজের পক্ষেই সম্ভব হবে না। ফলে উক্ত বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতিটি সার্বিক গ্রহণযোগ্যতার অভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুরূপ নৈতিক নিয়মে পরিণত হতে পারবে না। কারণ কোনো বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতিকে যদি প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় নৈতিক নিয়মে পরিণত করতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথমত, আমাদের দেখতে হবে যে, গৃহীত বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতিটিকে সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে পারছি কিনা, এবং দ্বিতীয়ত, আমি সর্বদাই এই ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারছি কিনা যে, আমার বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতিটি সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হোক। উপরোক্ত উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাবে যে, ওই ব্যক্তি নিজে সর্বদাই এমন ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারবে না যে - কোনো ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে না জেনেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিক। কারণ সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি নিজেও একদিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পড়ে প্রতারিত হতে পারে। ফলে তার কর্মনীতিটি আত্মধ্বংসী হয়ে পড়বে। সর্বোপরি কোনো ব্যক্তি অন্যকে ঠকাতে চাইলেও, সে নিজে ঠকতে চায় না। তাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা না করতে পারার নীতিটি কখনোই সার্বজনীন নিয়মে পরিণত হতে পারবে না, এবং ধ্রুব

না হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্যও হতে পারবে না। সুতরাং এইজাতীয় বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতি কখনোই নিঃশর্ত অনুজ্ঞা হওয়ার যোগ্য নয়।

কান্ট এই প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সর্বদা -

ক) সার্বিক (universal), অর্থাৎ সর্বত্র পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে এগুলি প্রযোজ্য হয়।

খ) অলঙ্ঘনীয় (inviolable), অর্থাৎ এগুলিকে লঙ্ঘন করা যায় না।

গ) অপরিহার্য (inescapable), অর্থাৎ এগুলিকে অস্বীকার করা বা অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর নয়।

ঘ) বাধ্যতামূলক (compelling), অর্থাৎ এর বাধ্যতামূলক শক্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

কান্ট-এর মতে আমরা যেহেতু সাধারণ মানুষ, তাই আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার (reason) সঙ্গে কামনা-বাসনার (inclination) দ্বন্দ্ব অনিবার্য। ফলে নৈতিক হওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমরা কখনো কখনো সার্বিক গ্রহণযোগ্য নৈতিক নীতিগুলিকে লঙ্ঘন বা অগ্রাহ্য করতে পারি, এবং সেই সঙ্গে অনৈতিক হওয়ার পথও প্রশস্ত হয়। তাই কান্ট-এর বক্তব্য হল, আমরা যদি নৈতিক নিয়মগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়মের মতো করে গ্রহণ করি, তাহলে সেগুলি আমাদের বিষয়ীনিষ্ঠ কামনা-বাসনার প্রভাবে লঙ্ঘিত বা অগ্রহীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, এবং অনৈতিক হওয়ার সম্ভাবনাও হ্রাস পায়।

৩) স্বতঃলক্ষ্য্যভিমুখী সূত্র^{৩৪} (The Formula of End in Itself) : শর্তহীন অনুজ্ঞার এই সূত্র প্রসঙ্গে কান্ট বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের এমনভাবে কাজ করা উচিত, যার ফলে সে নিজেকে বা অন্য কোনো মানুষকে শুধুমাত্র সাধন হিসাবে গ্রহণ না করে সকল সময়ই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষেরই যেহেতু স্বতঃমূল্য আছে তাই কোনো মানুষকে কখনোই নিছক লক্ষ্যপূরণের বা উদ্দেশ্যসাধনের

^{৩৪} Ibid, pp. 90-3.

উপায় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। মানুষ মাত্রই সে যৌক্তিক জীব। তাই কান্ট মনে করেন যে, প্রত্যেক মানুষ নিজেই নিজের লক্ষ্য হওয়া উচিত, অন্য কেউ নয়।

কান্ট-এর মতে আমরা যদি কখনোও কোনো মানুষকে নিছক নিজের লক্ষ্যপূরণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করি, তাহলে প্রত্যেক মানুষের যে স্বতঃমূল্য আছে তা অন্যসাপেক্ষ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ আমরা যখন সেই মানুষকে নিজের লক্ষ্যপূরণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করি তখন তার মূল্য থাকে, এবং যখন ব্যবহার করি না তখন সে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কান্ট মনে করেন যে, মানবতার (humanity) স্বতঃমূল্যকে আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। তাঁর মতে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো একটি কর্মনীতি অনুসরণ করে কর্ম সম্পাদন করে, তখন তার সেই কাজের পিছনে কোনো না কোনো লক্ষ্য অবশ্যই যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যটি যদি বিষয়নিষ্ঠ হয়, তাহলে সেই লক্ষ্যটির সঙ্গে ওই ব্যক্তির কামনা-বাসনাও জড়িত থাকে। ফলে তা অন্যের উপর আরোপ করা উচিত নয়। অর্থাৎ অন্য কোনো ব্যক্তিকে নিজের বিষয়নিষ্ঠ লক্ষ্যপূরণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা অনুচিত কাজ, এটাই কান্ট-এর অভিমত। এক্ষেত্রে লক্ষ্যটি যদি বিষয়নিষ্ঠ হয়, তাহলে তার সঙ্গে কোনো ব্যক্তির বিষয়নিষ্ঠ কামনা-বাসনা যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফলত তা অন্যের উপর আরোপিত হওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, এক ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে টাকা ধার করে তা পরিশোধ করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে প্রতারিত করল। এক্ষেত্রে সে ওই ব্যক্তিটিকে নিজের লক্ষ্যপূরণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করল। যেহেতু সে নিজের প্রয়োজনে টাকা ধার করেছিল তাই এখানে লক্ষ্যটি বিষয়নিষ্ঠ। এই লক্ষ্যটি কখনোই বিষয়নিষ্ঠ হতে পারবে না। কারণ অন্য কোনো ব্যক্তি যখন জানতে পারবে যে, ওই ব্যক্তি কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তখন প্রতারণাকারী ব্যক্তির কর্মনীতিটিকে কেউই সমর্থন করবে না। উক্ত কর্মনীতিটি যেহেতু প্রত্যেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারছে না, তাই তা বিষয়নিষ্ঠ লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হবে না।

কান্ট এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন কোনো ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাকে কোনো লক্ষ্যপূরণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন ওই ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্বিত হয়, এবং তাকে অবমূল্যায়িত করা হয়। মানুষ যেহেতু যৌক্তিক জীব, তাই সে স্বরূপত মূল্যবান এবং স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন। সেই কারণে কোনো মানুষকে কখনোই লক্ষ্যপূরণের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। কান্টের বক্তব্য হল কোনো মানুষ যদি নিজেকে বা অন্য কাউকে উপায় হিসাবে গ্রহণ না করে, কেবলমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে কোনো নীতি অনুসরণ করে কর্ম করে, তাহলে সেই কর্মনীতিটিই একটি সার্বিক নৈতিক নিয়মে পরিণত হওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে, এবং নিঃশর্ত অনুজ্ঞারূপে গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।

8) স্বাতন্ত্র্যের সূত্র^{৩৫} (The Formula of Autonomy) : নিঃশর্ত অনুজ্ঞার এই সূত্র প্রসঙ্গে কান্ট বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের উচিত এমন একটি কর্মনীতি অনুসরণ করে কাজ করা, যা তার স্বাধীন ইচ্ছা (free will) প্রসূত। তাঁর মতে ইচ্ছার স্বাধীনতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোনো মানুষ যখন ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কেবলমাত্র কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করে, তখন তার সেই কর্মনীতিটি সার্বিক নিয়মে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনায়ুক্ত হয়, এবং নিঃশর্ত অনুজ্ঞার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে থাকে।

কান্টের পূর্ববর্তী প্রায় সকল দার্শনিক এই বিষয়ে সহমত ছিলেন যে, নৈতিক কর্তার স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত কর্মই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু। কান্ট চেয়েছিলেন পূর্ববর্তী ধারণা অতিরিক্তভাবে স্বাধীনতার এক চরম পর্যায়ের কথা প্রচার করতে। দৈনন্দিন কথ্য ভাষায় আমরা ‘স্বাধীনতা’ বলতে যা বুঝি কান্ট সেটিকে ‘মনোস্বাতন্ত্রিক স্বাধীনতা’ নামে অভিহিত করেছেন। এইজাতীয় স্বাধীনতার বিশেষত্ব হল এক্ষেত্রে প্রতিটি স্বাধীন ব্যক্তিকৃত আচরণের অনুষঙ্গে আন্তর এবং বাহ্যিক উভয়প্রকার বাধাই অনুপস্থিত। স্বাধীনতার এই ধারণাটিকে তিনি নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে পর্যাণ্ড বলে মনে করেননি। নৈতিক প্রেক্ষাপটে কান্ট স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছেন বুদ্ধির অতিক্রমণ বা উত্তরণের ধারণাকে, যা সমস্তপ্রকার সম্ভাব্য ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা-পূর্ব এক ধারণা। অর্থাৎ এটি

^{৩৫} Ibid, pp. 93-5.

সম্পূর্ণভাবেই আমাদের স্বীয় বুদ্ধিজাত। এক্ষেত্রে একজন নৈতিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির স্বাধীনতা বলতে বোঝায়, স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়ে নৈতিক নিয়ম-নীতি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতাকে। কান্ট মনে করেন একটি স্বাধীন ইচ্ছা এবং নৈতিক নিয়মানুগ ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে এক এবং অভিন্ন। এইপ্রসঙ্গে তিনি স্বাধীন ইচ্ছা নির্ধারণের নীতিকেই নৈতিক মূল্যায়নের চরমনীতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

কান্টের নৈতিক তত্ত্বের পরিসরে ‘স্বাধীনতা’ এবং ‘স্বাতন্ত্র্য’ উভয় শব্দই সমব্যাপক, এবং সমার্থজ্ঞাপক। তাই এক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে অন্যটির প্রতিস্থাপন অনায়াসেই সম্ভব হয়ে থাকে। তাঁর নৈতিক তত্ত্বে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হল সেই ব্যক্তি, যে অন্য কোনো সহযোগী মাত্রা অপেক্ষাভাবে কেবলমাত্র বৌদ্ধিক নীতির দ্বারাই, ‘সদর্থক’ এবং ‘নঞর্থক’ এই উভয় অর্থেই স্বাধীনভাবে কোনো ক্রিয়াকলাপ বা বিচারকার্য সংঘটিত করতে সক্ষম। এইস্থলে কান্ট ‘নঞর্থক’ অর্থে স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছেন, নৈতিক কর্তার ইচ্ছা বা ব্যবহারিক বুদ্ধি অতিরিক্ত অন্য কোনো পূর্ববর্তী বা আনুষঙ্গিক কারণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করার যোগ্যতাকে। অন্যদিকে ‘সদর্থক’ অর্থে স্বাধীনতা বলতে তিনি একপ্রকার চরম কার্য-কারণমূলক স্ব-নির্ধারণের ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন, যার সাহায্যে নৈতিক কর্তা স্বকীয় বৌদ্ধিকতা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে কোনো কর্ম বা বিচারকার্য সম্পাদনের সামর্থ্য অর্জন করে থাকে।

কান্ট প্রদত্ত নৈতিকতার অনুশ্রেণী শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি এবং স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাঁর মতানুসারে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য হল - স্বাধীনতা এবং বৌদ্ধিকতার সমন্বয়। অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। এক্ষেত্রে কান্ট ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যের মুখোমুখি ইচ্ছার নানার্থকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, যা নৈতিক নীতির গ্রাহক নয়, কিন্তু বৌদ্ধিক ইচ্ছার ফসল। কান্টের অভিমত হল ইচ্ছা মাত্রেরই তা আবশ্যিকভাবে স্বাধীন নাও হতে পারে। কারণ ব্যবহারিক জীবনে আমরা এমন অনেক কর্মানুষ্ঠান করে থাকি যা আমাদেরই বুদ্ধিজাত ইচ্ছার ফসল, কিন্তু নৈতিক নিয়মের অনুগামী নয়। সেগুলি শুধুমাত্র কতকগুলি বিষয়ীনিষ্ঠ কামনা-বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এইজাতীয় ইচ্ছাগুলিকে

কান্ট পরনিয়ন্ত্রিত বা পরাধীন ইচ্ছা নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্বাধীন ইচ্ছা হতে গেলে সেই ইচ্ছা কেবল বুদ্ধিজাত হলেই চলবে না, তাকে শুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিজাত এবং স্ব-নির্ধারিত নৈতিক নিয়মের অনুগামী হতে হবে। ফলত কান্টের অভিপ্রায় থেকে বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে সৎ ইচ্ছাই হল একমাত্র স্বাধীন ইচ্ছা যা উক্তপ্রকার ধর্মান্বিত। এই কারণেই কান্টের নৈতিক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে সৎ ইচ্ছা = স্বাধীন ইচ্ছা = নৈতিক নিয়ম। নিঃশর্ত অনুজ্ঞার মতো উক্ত স্বাধীন ইচ্ছাও আকারসর্বস্ব এবং উপাদান বিবর্জিত।

(৫) লক্ষ্যের সাম্রাজ্যের সূত্র^{৩৩} (The Formula of the Kingdom of Ends) : এই সূত্র প্রসঙ্গে কান্ট প্রতিটি মানুষকে এমন এক সাম্রাজ্য গঠন করার উপদেশ দিয়েছেন, যে সাম্রাজ্যটি হবে কেবলমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের একটি আবশ্যিক মাত্রা হল এই যে, এক্ষেত্রে প্রতিটি সদস্য নিজেকে এবং একে-অপরকে কখনোই নিছক উপায় হিসাবে ব্যবহার না করে সর্বদাই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবে। ‘লক্ষ্যের সাম্রাজ্য’ বলতে এখানে সেই সাম্রাজ্যের কথাই বলা হয়েছে যেখানে বসবাসকারী প্রতিটি সদস্যই নৈতিক নিয়মানুবর্তিতার ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদন করে। সকলেই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সার্বিক নিয়ম গঠনের উপযোগী কর্মানুষ্ঠানে ব্রতী হয়, এবং তারা নিজেও সেই নৈতিক নিয়মের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এই সাম্রাজ্যের সকল সদস্য স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন, তাই তারা নৈতিক নিয়মের প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধাশীল, এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিবেশে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে থাকে।

সাধারণত ‘সাম্রাজ্য’ বলতে বোঝায় এমন এক অবস্থাকে যেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দ্বারা ঐক্যবদ্ধ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট মানুষজনের ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলির পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে যে জগতের উদ্ভব সম্ভব, সেই বিশেষ জগতকেই কান্ট লক্ষ্যের জগৎ বা ‘লক্ষ্যের সাম্রাজ্য’ নামে অভিহিত করেছেন। সকল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা এই সাম্রাজ্যের সদস্য হলেও তারা

^{৩৩} Ibid, pp. 95-7.

সবাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন। একমাত্র কামনা-বাসনা বিরহিত স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তাই লক্ষ্যের সাম্রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার যোগ্য।

কান্টীয় নীতিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিত বলা যেতে পারে যে, বিশুদ্ধ যুক্তিই হল অনুগত সামান্য ধর্ম, যা সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। সুতরাং নৈতিক কর্তা কর্তৃক গৃহীত নৈতিক সিদ্ধান্তে যদি যৌক্তিকতার প্রতিফলন দেখা যায়, তাহলে সেই সিদ্ধান্তের সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকতে পারে না। কারণ সব মানুষই যুক্তির ভাষা বোঝে, ফলে যৌক্তিক অবস্থানের ভিত্তিতে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যেকের কাছেই সমাদৃত হওয়া উচিত।

যুক্তিবিজ্ঞান :

যুক্তিবিজ্ঞান সম্পর্কিত কান্টের অভিমত ব্যক্ত করতে হলে তাঁর ‘অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞান’-এর আলোচনা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। কান্ট ধ্রুপদী আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানকে অস্বীকার করেননি, বরং যুক্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত এক নতুন ধারণা উদ্ভাবন করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কান্টের এইরূপ অভিপ্রায়ের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে ধ্রুপদী আকারনিষ্ঠ যুক্তিবিজ্ঞানের সঙ্গে কান্ট প্রবর্তিত অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞানের পার্থক্য অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যিক। বোধশক্তির যে সমস্ত প্রকার অনুভবগম্য উপাদানের প্রতি প্রযুক্ত হলে জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে, সেই অভিজ্ঞতা-পূর্ব প্রকারগুলির প্রকৃতি, সেগুলির ক্রিয়াক্রম এবং যথার্থতা সংক্রান্ত আলোচনাকে কান্ট ‘অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞান’ (transcendental logic) নামে অভিহিত করেছেন।

ধ্রুপদী আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল চিন্তার শুদ্ধ অনিবার্য নিয়ম বা আকার। এটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের চিন্তন এবং বুদ্ধিলব্ধ বিমূর্ত ধারণা গঠন, উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো চিন্তা, বিশ্লেষক বা সংশ্লেষক এবং অভিজ্ঞতা-পূর্ব বা পরতঃসাধ্য যাই হোক না কেন, তা সর্বদাই চিন্তন নিয়মের অনুগত। এইপ্রকার যুক্তিবিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যেকোনো জ্ঞানের আকারকে, উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার বিমূর্ত রূপটিকে আবিষ্কার করা।

কান্ট বোধশক্তির অভিজ্ঞতা-পূর্ব প্রকার বা প্রত্যয়গুলিকে ধ্রুপদী আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের বিভিন্ন অবধারণ বা বচন সাপেক্ষে গড়ে তুলেছেন বলে দাবি জানিয়েছেন, যেগুলি কিনা আমাদের সমস্তপ্রকার চিন্তা বা জ্ঞানের অভিজ্ঞতা-পূর্ব বচন বা অবধারণ। পার্থক্য হল এই যে, আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল অনুভব নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ চিন্তনের আকার বা নিয়ম, কিন্তু কান্টের অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞানে, বৌদ্ধিক প্রকাররূপ চিন্তনের শুদ্ধ নিয়ম বা আকারের সঙ্গে অনুভবের বিষয়ও যুক্ত হয়ে থাকে। কারণ তাঁর মতে বৌদ্ধিক প্রকারগুলি শুধুমাত্র অনুভবগম্য পদার্থেই প্রযুক্ত হতে পারে, অন্যথা নয়। এক্ষেত্রে বোধশক্তির অভিজ্ঞতা-পূর্ব প্রত্যয় বা অবধারণের সঙ্গে অনুভবলব্ধ পদার্থের সংযোগ ঘটে থাকে বলে, আমরা এমন জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হই যা যুগপৎ অভিজ্ঞতা-পূর্ব এবং সংশ্লেষক।

কান্টের দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। কারণ জ্ঞানতত্ত্বে কান্ট যে অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েছেন, যুক্তিবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁর উদ্দেশ্য হল কীভাবে ওই অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব তার ব্যাখ্যা দেওয়া। ফলত অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞানের পরিসরে কান্ট প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগুলি জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচিত হওয়ায় পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। বরং এইস্থলে কান্ট প্রবর্তিত বিভিন্ন প্রকার অবধারণ বা বচনের আলোচনা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে কান্টই একমাত্র দার্শনিক যিনি অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। এইপ্রকার অবধারণকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে তিনি দুটি ভিন্ন উপায়ে অবধারণের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার মনে করেন, ওই দুই ধরনের শ্রেণীবিভাগ-এর মধ্যে একটি হল জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং অপরটি হল যুক্তিবৈজ্ঞানিক। জ্ঞানের ভিত্তিতে যখন বচন বা অবধারণের শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তখন আমরা পাই অভিজ্ঞতা-পূর্ব বা পূর্বতসিদ্ধ অবধারণ, এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত বা পরতঃসাধ্য অবধারণকে। অন্যদিকে যুক্তিবৈজ্ঞানিক

ভিত্তিতে বচন বা অবধারণের শ্রেণীবিভাগ করলে পাওয়া যায় বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচন বা অবধারণকে।

পূর্বতসিদ্ধ বা অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ³⁷ : যে অবধারণ সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ, অর্থাৎ যে অবধারণের সত্যতা যাচাই করার জন্য কোনোভাবে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয় না, সেই অবধারণকে বলে পূর্বতসিদ্ধ বা অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা-পূর্ব বলতে কান্ট কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তিতাকে বোঝাতে চাননি। কোনোপ্রকার কালিক পূর্বগামিতা এইস্থলে বিবেচ্য নয়। এখানে অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ বলতে বুঝতে হবে যা অভিজ্ঞতা মাত্রই পূর্ববর্তী। যেহেতু অভিজ্ঞতা হওয়ার পূর্ব থেকেই তা মনের মধ্যে নিহিত থাকে, তাই এটি যাবতীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পূর্ব শর্ত। কান্টের মতে এইজাতীয় অবধারণের বৈশিষ্ট্য হল তা অনিবার্য ও কঠোরভাবে সার্বজনীন। এটি অনিবার্য কারণ তা দেশ ও কাল নির্বিশেষে সত্য, এবং একইসঙ্গে এটি কঠোরভাবে সার্বজনীন কারণ এইজাতীয় বচনের সত্যতা সম্পর্কে সবাই সহমত, এর কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না। অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণগুলিকে কঠোরভাবে সার্বজনীন বলার মধ্য দিয়ে কান্ট বোঝাতে চেয়েছেন যে, এগুলি অভিজ্ঞতাভিত্তিক আরোহ যুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সার্বজনীন অবধারণ নয়। যেগুলিকে কান্ট তুলনামূলক সার্বজনীনতা নামে অভিহিত করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে ‘কঠোর সার্বজনীন’ ও ‘তুলনামূলক সার্বজনীন’-এর দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তাঁর মতে কঠোর সার্বজনীন হল তাই যার ব্যতিক্রম দর্শানো সম্ভব নয় এবং যা ত্রিকাল অবাধিত। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা এইজাতীয় সার্বজনীনতা লাভ করতে পারি না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা কী ঘটে তা জানতে পারি, কিন্তু সেটি যে অনিবার্যভাবে ঘটবেই এবং এর কোনোরকম ব্যভিচার ঘটবে না এমন দাবি করা যায় না। এক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, এযাবৎ প্রাপ্ত অভিজ্ঞতায় কোনো নিয়মের অন্যথা হয়েছে কি হয়নি? যেমন ‘আকারযুক্ত বস্তু হয় আয়তনবিশিষ্ট’ – এটি একটি অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণের উদাহরণ। কারণ বস্তু মাত্রই তার আকার থাকবে এবং

³⁷ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, 1998, pp. 137-8.

আকার থাকলে তার আয়তনও থাকবে। অর্থাৎ তা কোনো না কোনো স্থান অধিকার করে থাকে, এই সত্যতায় উপনীত হওয়ার জন্য কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই আমরা এইজাতীয় অবধারণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারি। এই কারণে কান্ট কঠোর সার্বজনীনতা ও অনিবার্যতাকে অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের সুনিশ্চিত লক্ষণ হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন, যা কোনোভাবেই অভিজ্ঞতাপ্রসূত বা পরতঃসাধ্য নয়।

পরতঃসাধ্য বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত অবধারণ^{৩৬} : যে অবধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ অর্থাৎ যে অবধারণের সত্যতা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই যাচাই করা সম্ভব, সেই অবধারণ হল পরতঃসাধ্য বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত অবধারণ। এইজাতীয় অবধারণের ক্ষেত্রে অনিবার্যতা বা কঠোর সার্বজনীনতার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তা সর্বদাই আপেক্ষিক এবং আপাতিক, অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোনোরকম নিশ্চয়তার সন্ধান পাওয়া যায় না। এগুলি সর্বদাই সম্ভাব্য হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে অভিজ্ঞতালব্ধ অবধারণের মধ্যে দিয়ে যে ধরনের সার্বজনীনতা ব্যক্ত হওয়া সম্ভব, সেগুলিকে কান্ট তুলনামূলক সার্বজনীনতা নামে আখ্যায়িত করেছেন। যার ভিত্তিতে আমরা বড়জোর এইটুকু বলতে পারি যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই অবধারণগুলি সত্য বা যথার্থ, কিন্তু এইপ্রকার সত্যতা বা যথার্থতা সর্বকালীন নয়। এইজাতীয় অবধারণের ক্ষেত্রে বিকল্প, বিপরীত বা ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তের সম্ভাবনা থেকেই যায়। যেমন ‘গাছের পাতার রং সবুজ’- এটি একটি পরতঃসাধ্য অবধারণের উদাহরণ, যেহেতু এর সত্যতা যাচাই করার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়ে। প্রত্যক্ষ না করে গাছের পাতা সবুজ কিনা তা বলা সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে এমন ধারণা করা সম্ভব নয় যে, পাতা মাত্রই তা সবুজ। সুতরাং কোনো অবধারণের সত্যতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারা সম্ভব কিনা, তার ভিত্তিতেই চিনে নেওয়া যাবে অভিজ্ঞতা-পূর্ব ও পরতঃসাধ্য অবধারণকে।

কান্ট অপর একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও অবধারণের শ্রেণীবিভাগ করেছেন যা অবধারণের যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামো এবং চিন্তার নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা জানি

^{৩৬} Ibid, p. 136.

যেকোনো অবধারণের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ, এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ। এগুলিকে অবধারণের উপাদানও বলা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল কোনো অবধারণের অন্তর্গত উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সম্বন্ধটি কীরূপ, অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদের ধারণাটির মধ্যে বিধেয় পদের ধারণাটি কি নিহিত হয়ে আছে, অথবা নেই? তার ভিত্তিতে অবধারণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল বিশ্লেষক অবধারণ এবং অপরটি হল সংশ্লেষক অবধারণ।

বিশ্লেষক অবধারণ^{৩৯} : এই অবধারণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করলেই বিধেয় পদের ধারণাটিকে লাভ করা যায়। এইজাতীয় অবধারণের বিধেয় পদটি অন্তত প্রচ্ছন্নভাবে হলেও উদ্দেশ্য পদের মধ্যে নিহিত থাকে। ফলে বিধেয়টি উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য সংযোজন করে না। তাই বিশ্লেষক অবধারণ তথ্য সম্প্রসারণমূলক নয়, যদিও এই অবধারণ সার্বিক এবং অনিবার্যভাবে সত্য। এর সত্যতা নির্ধারিত হয় বিরোধ-বাধক নিয়মের দ্বারা। অর্থাৎ বিশ্লেষক অবধারণ-এর বিরোধী অবধারণ স্ব-বিরোধী, ফলত তা সর্বদাই মিথ্যা। এক্ষেত্রে বিধেয়টি উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাই এই অবধারণ যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। যেমন ‘সকল জড়বস্তু হয় বিস্তারযুক্ত’ – এটি একটি বিশ্লেষক অবধারণের দৃষ্টান্ত। অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র যুক্তির সাহায্যেই আমরা জড়বস্তু অর্থাৎ উদ্দেশ্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে, বিধেয় অর্থাৎ বিস্তৃতির ধারণা লাভ করে থাকি। কারণ জড়বস্তু মাত্রই তা বিস্তারযুক্ত। শুধুমাত্র ধারণার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি, অভিজ্ঞতাভিত্তিক যাচাইকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না।

সংশ্লেষক অবধারণ^{৪০} : এই অবধারণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয় পদের ধারণাটিকে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের মধ্যে নিহিত থাকে না। সেই কারণে এইজাতীয় অবধারণে বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য সংযোজিত করে থাকে। তাই এই অবধারণ তথ্য সম্প্রসারণমূলক।

^{৩৯} Ibid, p. 141.

^{৪০} Ibid, p. 142.

এইরূপ অবধারণের ক্ষেত্রে সার্বিকতা ও অনিবার্যতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এদের সত্যমান অনির্দিষ্ট। সংশ্লেষক অবধারণের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে কোনো তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকে না বলে বিরোধ-বাধক নিয়ম এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই অবধারণের বিরোধী অবধারণ স্ব-বিরোধী হয় না, সেগুলি সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। যেমন ‘সকল জড়বস্তু হয় ভারী’ – এই সংশ্লেষক অবধারণের উদ্দেশ্য অর্থাৎ জড়বস্তুর ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে, বিধেয় অর্থাৎ ভারী হওয়ার ধারণাটিকে পাওয়া যায় না। কারণ জড়বস্তু মাত্রই তা ভারী হবে এমন নাও হতে পারে। সুতরাং এই অবধারণের সত্যতা জানতে হলে অভিজ্ঞতাভিত্তিক যাচাইকরণের প্রয়োজন।

প্রাণ্ডক্ত দুই ধরনের শ্রেণীবিভাগের সংমিশ্রণে এইস্থলে মোট চারপ্রকার অবধারণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে –

১. অভিজ্ঞতা-পূর্ব বিশ্লেষক অবধারণ। ২. অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণ।

৩. পরতঃসাধ্য বিশ্লেষক অবধারণ। ৪. পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক অবধারণ।

উক্ত চারপ্রকার অবধারণের মধ্যে তৃতীয় প্রকার অবধারণ অর্থাৎ পরতঃসাধ্য বিশ্লেষক অবধারণের সম্ভাবনা কোনো দার্শনিক স্বীকার করেন না। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন অভিজ্ঞতা-পূর্ব বিশ্লেষক অবধারণই হল প্রকৃষ্ট অবধারণ। অপরপক্ষে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক অবধারণকেই যথার্থ অবধারণ হিসাবে স্বীকার করেন। কান্টই একমাত্র দার্শনিক যিনি বিচারবাদী তথা সমন্বয়বাদী হিসাবে সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে এই অবধারণই হল প্রকৃত অবধারণ, যার মাধ্যমে আমরা এমন জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হই, যা যুগপৎ অনিবার্য তথা সার্বিক এবং তথ্য সম্প্রসারণমূলক। যেমন ‘সব ঘটনার কারণ আছে’ - এই অবধারণটি অভিজ্ঞতা-পূর্ব, আবার সংশ্লেষকও বটে। এটি সংশ্লেষক, কারণ এর উদ্দেশ্য ‘ঘটনা’ পদের ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয় ‘কারণ’ পদটির ধারণা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বিধেয় পদের ধারণা, উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত নয়। এক্ষেত্রে বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য জ্ঞাপন করে থাকে বলে এটি

তথ্য সম্প্রসারণমূলক হয়ে থাকে। একইসঙ্গে এটিকে একটি অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণও বলা যেতে পারে, কারণ কোনোরকম অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই কেবলমাত্র বুদ্ধির মাধ্যমেই আমরা এই অবধারণ সম্পর্কিত সত্যতায় উপনীত হতে পারি। বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই বলা যায়, যেকোনো ঘটনা অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ থেকে উদ্ভূত। সুতরাং এটি অনিবার্য, যেহেতু এর কোনো ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত সম্ভব নয়। আবার কঠোরভাবে সার্বজনীন, কারণ এই অবধারণের সত্যতা সম্পর্কে সবাই সহমত।

কান্ট যে শুধুমাত্র জ্ঞানতাত্ত্বিক তথা যুক্তিবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তা নয়, তাঁর সমগ্র দর্শনতন্ত্র রচিত হয়েছে এইরূপ অবধারণের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে। তাই লক্ষ করা যায় যে, নীতিবিদ্যায় নৈতিক নিয়ম প্রকাশক অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণ কীভাবে সম্ভব কান্ট তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আবার এইরূপ অবধারণের সম্ভাবনা না থাকার কারণে তিনি আধিবিদ্যক বিষয়সমূহের জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন। সুতরাং দেখা গেল যে, জ্ঞানতত্ত্ব-অধিবিদ্যা-নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিজ্ঞান সহযোগে গঠিত কান্টের সমগ্র দার্শনিক তন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণের অনুসন্ধান তথা আবিষ্কার।

আমরা জানি শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার করতে গিয়ে কান্ট তাঁর দার্শনিক তন্ত্রে, জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল জ্ঞানের সীমানা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে। শুদ্ধ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ, তা বিচার না করে পূর্ব থেকেই কতকগুলো বিষয়ের অস্তিত্ব আছে বলে ধরে নেওয়াটাকে তিনি দর্শনচর্চার সঠিক পদ্ধতি বলে মনে করতেন না। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে থেকে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শুদ্ধ প্রজ্ঞার সাধারণ সমস্যা হল কীভাবে অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষণ অবধারণ সম্ভব তাঁর যথার্থতা প্রতিপাদন করা। সেই লক্ষ্যে কান্ট দর্শনের জগতে ‘কোপার্নিকান রেভলিউশন’^{৪১} তুল্য এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করলেন।

^{৪১} Ibid, p. 110.

বিজ্ঞানের জগতে কোপার্নিকাস যখন প্রচলিত ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের অসাড়াতা প্রমাণ করে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের সূচনা করেছিলেন, তখন তা ছিল যুগান্তকারী এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। একইভাবে কান্টও দর্শনের জগতে জ্ঞানতত্ত্বের চিরাচরিত ধারাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে জ্ঞান গঠনে মনের সক্রিয়তা স্বীকার করে নিলেন, এবং দাবি করলেন যে, জ্ঞান বিষয়সাপেক্ষ হয় না বরং বিষয় জ্ঞানসাপেক্ষ। চিন্তাধারার এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেন আক্ষরিক অর্থে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হল। জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে এইরূপ পরিবর্তনকে কোপার্নিকান রেভলিউশন সদৃশ বলে মনে করা হয়।

কান্টের পূর্ববর্তী বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণের বক্তব্য ছিল, জ্ঞান গঠনের ব্যাপারে মানবমন নিষ্ক্রিয়। বুদ্ধিবাদীদের মতানুসারে সহজাত ধারণা জন্মের সময় থেকেই মনের মধ্যে নিহিত থাকে এবং জাগতিক বিষয়সমূহের মননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন। তাঁরা মনে করতেন যে, অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতিরেকেই জাগতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে সহজাত ধারণার সাহায্যে বুদ্ধির মাধ্যমেই আমরা কোনো বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে পারি। বাহ্যবিষয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি একে - অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত নয়, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে একপ্রকার পূর্ব-নির্ধারিত সামঞ্জস্য থাকার দরুন আমরা বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেই বাহ্যবিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সমর্থ হই। কান্ট মনে করেন, বুদ্ধিবাদীরা যেভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে থাকেন, তা গ্রহণ করলে জ্ঞানে কোনো নতুন তথ্য সংযোজন এর সম্ভাবনা থাকে না।

অপরপক্ষে অভিজ্ঞতাবাদীরা জাগতিক বিষয়ের মননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলেও, তাঁরা বুদ্ধিবাদীদের মত সহজাত ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে জন্মের সময় মন থাকে অলিখিত সাদা কাগজের মত। সুতরাং বাহ্যবিষয়ের স্বরূপ কোনোভাবেই মনের ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়। একমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা বিষয়জ্ঞান লাভ করি। বাহ্যবিষয়গুলি জগতে যেভাবে অস্তিত্বশীল আমরা তাকে ঠিক সেইভাবেই জেনে থাকি। ফলত জ্ঞান সর্বদাই তার বিষয়ের মুখাপেক্ষী, জ্ঞানের

বিষয় যে ধর্মবিশিষ্ট, আমরা তাকে সেই ধর্মবিশিষ্ট রূপেই প্রত্যক্ষ করি। এক্ষেত্রে বিষয়, জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত নয়, বরং জ্ঞান, বিষয়সাপেক্ষ হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে কান্ট মনে করেন যে, যদি অভিজ্ঞতাবাদীদের মতানুসারে অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। তাহলে সেই জ্ঞানে সার্বিকতা ও অনিবার্যতা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ জ্ঞানের এই ধর্মগুলি শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, কোনোভাবেই অভিজ্ঞতালব্ধ নয়।

জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত উপরোক্ত বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তাধারা প্রসঙ্গে কান্ট ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, জ্ঞান ও বাহ্যবিষয় পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। আবার জ্ঞান, বিষয় সাপেক্ষও নয়। তাঁর মতে বিষয় সর্বদাই জ্ঞানসাপেক্ষ হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। কারণ যে বিষয়ের জ্ঞান আমরা লাভ করি তার স্বরূপ সর্বদাই জ্ঞানবৃত্তি দ্বারা নিয়মিত। এইরূপ জ্ঞানবৃত্তিগুলি হল মনের স্বাভাবিক ধর্ম। এইস্থলে কান্ট স্পষ্টতই জ্ঞান গঠনে মানব মনের সক্রিয়তা স্বীকার করে থাকেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মনের দ্বারা জ্ঞানের বিষয় সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে কোনো ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না।

কান্টের মতে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহে মনের স্বভাবের মধ্যে নিহিত জ্ঞানবৃত্তি প্রযুক্ত হলে তবেই জ্ঞানের বিষয় গঠিত হয়। এক্ষেত্রে বাহ্যবস্তুকে আমরা যে রূপে প্রত্যক্ষ করি, তা তার স্বগতসত্তাক রূপ নয়। সেটি হল বস্তুর অবভাসিত রূপ। কান্টের মতে জগতে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব। আমরা শুধুমাত্র বস্তুর যে রূপ জ্ঞানে ভাসমান হয় সেটুকুই জানতে পারি। কান্ট জ্ঞান গঠনে মানব মনের সক্রিয়তা স্বীকারের মাধ্যমে, জ্ঞানের বিষয় সর্বদা জ্ঞানবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হয় এমন দাবি জানালেও, এইস্থলে মনের সক্রিয়তা বলতে আসলে স্বয়ংক্রিয়তাকে বুঝতে হবে। কারণ মন কখনোই সচেতনভাবে তার জ্ঞানবৃত্তিগুলিকে আরোপ করে না। মনের এইরূপ সক্রিয়তা স্বীকারের কারণে কান্টের দর্শনে বাহ্যবিষয় এবং জ্ঞানের বিষয়ের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। বাহ্যবিষয় হল স্বতন্ত্র এবং স্বগতসত্তাক, এর প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারা সম্ভব নয়। অন্যদিকে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ে মনের

স্বভাবের মধ্যে নিহিত জ্ঞানশক্তির দ্বারা, অর্থাৎ সংবেদনের আকার এবং বৌদ্ধিক প্রকারের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ উপাদানগুলি আকারিত ও প্রকারিত হলে জ্ঞানের বিষয় গঠিত হয়। এইরূপ জ্ঞানের বিষয় অবভাস মাত্র। এটি কখনোই স্বগতসত্তাক, স্বতন্ত্র বিষয় নয়।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, কান্ট জ্ঞানের উপাদান গ্রহণে মনের সক্রিয়তা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং জ্ঞানের বিষয়কে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞানসাপেক্ষ বলার মধ্য দিয়ে পূর্বসূরী দার্শনিকদের বিরুদ্ধাচরণ করে, পাশ্চাত্য দর্শনের জগতে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। এই পরিবর্তনের মূল সুরটি বাঁধা আছে অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষক অবধারণ সংক্রান্ত পর্যালোচনায়, যা পরিব্যপ্ত হয়ে আছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত তাঁর সমগ্র দার্শনিক তন্ত্রের পরিসরে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিউমের দর্শন ও অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক তত্ত্ব

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম (David Hume, 1711 - 1776) মনে করেন, দার্শনিক আলোচনা হল মানবপ্রকৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। সেই কারণে যেকোনো আলোচনার পূর্বে মানবপ্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে মানবপ্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটনের অর্থ হল তার বোধশক্তির সীমানা ও সামর্থ্য নির্ধারণ করা। হিউমের ভাষায় এটি হল 'মানসিক মানচিত্র' গঠন। তাঁর মতে জ্ঞান সামর্থ্যের সীমানা নির্ধারণ না করলে মানুষ কোনো বিষয় সম্পর্কে কতদূর পর্যন্ত জ্ঞানলাভে সমর্থ তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। মানুষের জ্ঞান সামর্থ্যের সীমানা নির্দেশের মধ্য দিয়ে হিউম অযথার্থ অধিবিদ্যাকে বর্জন করে যথার্থ অধিবিদ্যার চর্চায় মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই হিউমের দার্শনিক তত্ত্বের বিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনায় জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।

জ্ঞানতত্ত্ব

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে হিউম মনে করেন যে, বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়ানুভব বা অভিজ্ঞতা। ইন্দ্রিয়ানুভবে আমরা সরাসরি যা লাভ করি তা হল 'মুদ্রণ' (impression)।^১ এই মুদ্রণের প্রতিক্রম হল 'ধারণা' (idea)। হিউমের জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান উপকরণ হল এই মুদ্রণ ও ধারণা। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা মানস উপকরণ বলতে আমরা যা বুদ্ধি সেটিকে উক্ত দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। হিউমের মতানুসারে আমরা যখন কোনো কিছু শ্রবণ বা দর্শন করি, অনুভব করি বা ভালোবাসি অথবা ঘৃণা করি বা কামনা করি তখন আমাদের সেই বিষয়ের যে সজীবতর প্রত্যক্ষণ হয়ে থাকে সেটিই হল মুদ্রণ। ধারণা হল এইরূপ মুদ্রণের প্রতিক্রম। সুতরাং মুদ্রণ হল ধারণার আবশ্যিক শর্ত, কারণ যে বিষয়ের মুদ্রণ হয়নি তার ধারণা উৎপন্ন

^১ "By the term impression, then, I mean all our more lively perceptions when we hear, or see, or feel, or love, or hate, or desire, or will.", David Hume, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, Intro. by J.N. Mohanty, Progressive Publishers, Calcutta, 1999, p. 11.

হতে পারে না। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে, ধরা যাক আমরা চোখ দিয়ে একটি নীল রঙের বস্তু দেখছি, এক্ষেত্রে আমাদের মনে নীল রঙের যে ইন্দ্রিয় উপাত্ত উপস্থিত হয় তা হল মুদ্রণ। অতঃপর ওই নীল রঙের বস্তুটি অপসারিত হলে বা চোখ বন্ধ করার পর, উক্ত নীল রঙের যে কল্পনা বা স্মরণ হয় সেটিই হল ধারণা। হিউমের মতে যে বিষয়ের মুদ্রণ হয়নি তার ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, নীল রঙের ধারণা তখনই করা সম্ভব হবে যদি পূর্ব থেকে তার ইন্দ্রিয়ানুভব থাকে। এই নিয়মটি যেমন বাহ্যদর্শন সম্পর্কে প্রযোজ্য, একইভাবে অন্তরদর্শন সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কারণ যে ব্যক্তির ব্যথার অনুভূতি হয়নি সে কখনোই ব্যথার ধারণা গঠন করতে পারবে না।

ধারণার উৎপত্তি কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করার পূর্বে হিউম ধারণা ও মুদ্রণের পার্থক্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে মুদ্রণ হল স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সজীবতর প্রত্যক্ষ। অপরপক্ষে ধারণা হল মুদ্রণের তুলনায় অধিক অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল, দুর্বল প্রতিরূপ। সেক্ষেত্রে মুদ্রণ ও ধারণার পার্থক্য এতোটাই স্পষ্ট যে, আমাদের দুর্বলতর মুদ্রণকে কখনোই ধারণা হিসাবে ভুল হয় না। আবার অতি সজীবতর ধারণাকে কখনোই মুদ্রণ বলে ভুল হয় না। সর্বাপেক্ষা সজীবতর চিন্তা (ধারণা) নিতান্ত অস্পষ্ট সংবেদনের (মুদ্রণ) থেকেও হীন।^২

হিউম মনে করেন, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের চিন্তন ক্ষমতার স্বাধীনতাকে সীমাহীন বা বন্ধন মুক্ত বলে মনে হলেও, একটু পরীক্ষা করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা বস্তুতপক্ষে ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদানসমূহকে মিশ্রণ, স্থানান্তর বা হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। যেমন আমরা যখন একটা সোনার পাহাড়ের কথা চিন্তা করি তখন আমরা আসলে পূর্বজাত দুটি ধারণাকে সংযুক্ত করি মাত্র। দুটি ধারণার একটি হল সোনা এবং অপরটি হল পাহাড়। এক্ষেত্রে আমাদের যাবতীয় চিন্তার উপাদান নিঃসৃত হয় বাহ্য অথবা আন্তর অনুভব থেকে। এই উপাদান গ্রহণের ক্ষেত্রে

^২ “The most lively thought is still inferior to the dullest sensation.”, Ibid, p. 10.

আমাদের মন থাকে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু উপাদানের বিন্যাসকরণে মন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

মুদ্রণ ও ধারণার পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে একটি বিষয় পরিস্ফুট হল যে, ধারণা মাত্রই মুদ্রণ নির্ভর, এবং ধারণা যেহেতু মুদ্রণের প্রতিক্রম তাই যে বিষয়ের মুদ্রণ সম্ভব নয় বা মুদ্রণ হয়নি, তার ধারণাও সম্ভবপর হতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে হিউম দুটি যুক্তি প্রদান করেছেন।

প্রথম যুক্তি

আমরা যখন আমাদের চিন্তা বা ধারণাসমূহকে বিশ্লেষণ করি, তখন সেগুলি যতই যৌগিক বা মহৎ হোক না কেন, সর্বদাই কতকগুলি সরল ধারণায় বিশ্লেষিত হয়। এই সরল ধারণাগুলি হল পূর্ববর্তী অনুভব বা মুদ্রণের প্রতিক্রম। এমনকি যে ধারণাগুলি আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রণ থেকে উৎপন্ন হয়নি বলে মনে করা হয়, অনুসন্ধান করলে সেগুলির পশ্চাতেও মুদ্রণের সন্ধান পাওয়া যাবে। উদাহরণ হিসাবে হিউম ঈশ্বরের ধারণার উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরের ধারণা হল এক অসীম বুদ্ধিমান, প্রাজ্ঞ এবং শুভ সত্তার ধারণা। আপাতভাবে এই ধারণার কোনো মুদ্রণ হয় না বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা নিজেদের স্মরণ ক্রিয়ায় শুভ, প্রাজ্ঞ ইত্যাদি গুণাবলী সীমাহীনভাবে পরিবর্ধিত করে ঈশ্বরের ধারণা গঠন করে থাকি। তাই তাঁর মতে আমাদের পরীক্ষিত প্রতিটি ধারণা হল সদৃশ মুদ্রণের প্রতিক্রম।^৩ হিউমের এই দাবিটিকে যদি কেউ সার্বিক বা ব্যতিক্রমহীন হিসাবে মেনে নিতে না পারেন, তাহলে তাঁর পক্ষে একমাত্র করণীয় বিষয় হল এমন এক বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা, যেখানে কোনো একটি ধারণা মুদ্রণ থেকে নিঃসৃত হয়নি। যদিও হিউম মনে করেন, এমন কোনো বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যাবে না, যেখানে মুদ্রণ ছাড়াই ধারণা গঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় যুক্তি

^৩ Ibid, p. 12.

হিউমের মতে যদি কোনো ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের কোনো ক্রটির জন্য কোনো বিশেষ ধরনের সংবেদন লাভ করতে অসমর্থ্য হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে ওই সংবেদনের অনুরূপ ধারণা গঠন করতে পারা সম্ভব হবে না। যেমন কোনো অন্ধ ব্যক্তি বর্ণের ধারণা গঠন করতে পারে না, বা কোনো বধির ব্যক্তি শব্দের ধারণা গঠনে অপরাগ। এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, যদি ওই ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জনিত ক্রটি দূর করা যায়, তাহলে সে সেই ইন্দ্রিয়জনিত সংবেদন বা মুদ্রণ লাভ করতে পারবে, এবং সেই মুদ্রণের অনুরূপ ধারণাও গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। একইভাবে কোনো বস্তু বা বিষয় যদি যথাযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কখনোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়ে থাকে, তাহলেও তার মুদ্রণের অভাবে ধারণা গঠন অসম্ভব হয়ে পড়বে। মানুষের আবেগের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না। যেমন নম্র স্বভাবের ব্যক্তির পক্ষে কখনোই প্রতিহিংসা বা নির্মমতার ধারণা করতে পারা সম্ভব নয়, আবার স্বার্থপর ব্যক্তি কখনোই চরম বন্ধুত্বের বা মহানুভবতার ধারণা সহজে গড়ে তুলতে পারবে না। উপরোক্ত যুক্তি দুটির মাধ্যমে হিউম যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান তা হল, যে বিষয়ের মুদ্রণ হয়নি তার ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়।

আমরা জানি সাধারণভাবে হিউম-এর উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রতিষ্ঠা করা যে, মুদ্রণ ব্যতীত ধারণা হয় না, কিন্তু এর বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত যে সম্ভব সে কথাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ অনুরূপ মুদ্রণের উপর নির্ভর না করেও ধারণা গঠন করতে পারাটা একেবারে অসম্ভব নয়, যদিও হিউম এটিকে ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত হিসাবেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। ধরা যাক, কোনো এক ব্যক্তি নীল বর্ণের কোনো একটি বিশেষ আভা ছাড়া বাকি সবগুলো আভা প্রত্যক্ষ করেছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিটি ওই বিশেষ আভাটি ছাড়া বাকি সব আভাগুলির মুদ্রণ অবশ্যই লাভ করে থাকবে। এমতাবস্থায় যদি ওই ব্যক্তির সম্মুখে ওই বিশেষ আভার নীলটি বাদ দিয়ে, বাকি সব আভার নীল বর্ণকে উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে বিশেষ ক্রমবিন্যাসে উপস্থিত করা হয়, তাহলে ওই ব্যক্তি যে বিশেষ নীল বর্ণের আভার মুদ্রণ কখনোই লাভ করতে পারেননি, সেটির ধারণাও গঠন করতে পারবেন বলেই হিউমের অভিমত। এইস্থলে ওই ব্যক্তি নীল বর্ণের ক্রমবিন্যাসে একটি বিশেষ আভার অভাব লক্ষ

করে অপরাপর নীল বর্ণের আভার মুদ্রণের উপর ভিত্তি করে, কল্পনার সাহায্যে ওই বিশেষ অপ্রদর্শিত নীল বর্ণের আভার ধারণা গঠন করতে সমর্থ হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় সরল ধারণা সর্বদাই তার অনুরূপ মুদ্রণ থেকে নিঃসৃত হবে এমন নয়। যদিও হিউম এটিকে বিশেষ ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং শুধুমাত্র এর ভিত্তিতে তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের যে সাধারণ নীতি, অর্থাৎ ‘সব ধারণা মুদ্রণ থেকে উৎপন্ন হয়’- সেই নীতিটির কোনোরকম পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না।

হিউমের মতে সকল ধারণা, বিশেষ করে বিমূর্ত ধারণাগুলি স্বাভাবিকভাবেই ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট (faint and obscure), এগুলির উপর মনের অধিকার খুবই অল্প। অন্যান্য সদৃশ ধারণার সঙ্গে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে উক্ত বিমূর্ত ধারণাগুলি বেশ উপযুক্ত। আমরা যখন কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ ছাড়া কোনো একটি পদকে প্রায়শই ব্যবহার করি, তখন আমরা যথাযথভাবেই কল্পনা করতে চাই যে, ওই পদটির সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট ধারণা যুক্ত হয়ে আছে কিনা। অপরপক্ষে সকল মুদ্রণ যেগুলি কিনা সংবেদন, তা বাহ্য বা আন্তর যাই হোক না কেন, সর্বদাই শক্তিশালী এবং স্পষ্ট। এগুলির মধ্যে যে সীমারেখা তা আরও সঠিকভাবে নির্ধারিত এবং এদের সম্পর্কে সহজে কোনো ভুল হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যখন একটি দর্শন বিষয়ক পদকে কোনো অর্থ বা ধারণা ছাড়া প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করি এবং মনে করি যে এটি প্রায়শই ঘটছে, তখন আমাদের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন যে, ওই সন্দেহজনক ধারণাটি কোন্ মুদ্রণ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে যদি কোনো মুদ্রণ নিরূপণ করা না যায়, তাহলে আমাদের উক্ত সন্দেহটি সুনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এইভাবে হিউম মুদ্রণ ও ধারণার স্বরূপ ও সত্তা সম্পর্কে যাবতীয় বিতর্ক দূর করার চেষ্টা করেছেন।

ধারণার উৎপত্তি সংক্রান্ত মত ব্যক্ত করার পর, হিউম বিভিন্ন ধারণা কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, ধারণার অনুষ্ঙ্গ সূত্রের (laws of association) প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে আমাদের মনের বিভিন্ন চিন্তন

বা ধারণাগুলির মধ্যে একটা সংযোগের নীতি বর্তমান থাকে এটা প্রমাণিত। এমনকি স্মৃতি ও কল্পনায় যখন ধারণাগুলি আবির্ভূত হয় তখন সেগুলিও একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা শৃঙ্খলাকে অনুসরণ করে থাকে। এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করি বা আলোচনা করি। সেইসময়ে যদি অন্য কোনো বিশেষ চিন্তা ওই আলোচিত চিন্তার শৃঙ্খলা ভেঙে তার মধ্যে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে আমরা সেটিকে চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিক বিতাড়িত করে থাকি। একইভাবে আমরা যা স্বপ্ন দেখি তা যতই লাগামহীন বা উদ্ভট হোক না কেন, সেই ধারণাগুলি কল্পনায় প্রতিফলিত হওয়ার সময় সেগুলির মধ্যেও একটা সংযোগ লক্ষ করা যায়। আবার স্বাধীনভাবে কোনো কথোপকথন চলাকালীন যখন এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আনাগোনা চলতে থাকে তখন বুঝতে হবে যে, সেক্ষেত্রে এমন কোনো সূত্র আছে যা বিষয়ান্তরের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। কখনোই যদি এই সংযোগের বিষয়টি ধরা নাও পড়ে, তাহলেও ওই কথোপকথনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যে ব্যক্তি আলোচনার বিষয় থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য বিষয়ে প্রবেশ করছিলেন, তিনি হয়তো অন্যকে সে ব্যাপারে অবহিত করবেন যে, কোনো এক অজ্ঞাত চিন্তাধারা তাকে ভিন্ন বিষয়ে চালিত করেছে।

বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রেও একইরকম সংযোগ সূত্র পরিলক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রে যে ভাষাগুলির মধ্যে ন্যূনতম সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়, সেখানেও বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির দ্বারা যে ধারণাগুলি ব্যক্ত হয় তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ অনুরূপতা লক্ষ করা যায়। অত্যন্ত জটিল শব্দগুলির ক্ষেত্রেও এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং এই আলোচনা থেকে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় যে, যৌগিক ধারণাগুলিতে নিহিত সরল ধারণাগুলি কিছু সার্বিক নীতির বন্ধনে আবদ্ধ, এবং সমগ্র মানবজাতির উপর এর সমান প্রভাব লক্ষণীয়।

যে সমস্ত সার্বিক নীতির দ্বারা ধারণাগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় হিউম সেই সার্বিক নীতিগুলিকেই ধারণার অনুষ্ণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে কেবলমাত্র তিনটি অনুষ্ণ নীতি বা সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল সাদৃশ্য

(resemblance), সান্নিধ্য (contiguity) এবং কার্য-কারণ (cause or effect) সম্পর্ক^৪। ধারণাগুলি যে এই অনুষ্ণ নীতির দ্বারা সংযুক্ত হয় এ বিষয়ে হিউমের কোনো সন্দেহ ছিল না। যেমন কোনো প্রতিচ্ছবি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চিন্তাকে মূল বস্তুর দিকে চালিত করে। সাদৃশ্য নীতির কারণেই এমনটা ঘটে থাকে। অনুষ্ণের সান্নিধ্য নীতির জন্য দেখা যায় যে, কোনো সুবিশাল বাড়ির মধ্যে কোনো একটি কক্ষের অনুসন্ধান এর বিষয়টি উল্লেখ করা হলে, স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য কক্ষগুলি সম্পর্কেও অনুসন্ধানের বিষয়টি উত্থাপিত হয়ে থাকে। কার্য-কারণরূপ অনুষ্ণ নীতির প্রভাবে আমরা যখন কোনো আঘাতের কথা চিন্তা করি, তখন ওই আঘাতের কারণে যে ব্যথার সৃষ্টি হয় সেই সম্পর্কে চিন্তা না করে পারা যায় না। হিউম এই উদাহরণগুলির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে ধারণার অনুষ্ণ নীতিগুলি কার্যকরী হয়। তিনি মনে করেন যে, এই তিনটি অনুষ্ণ নীতির দ্বারা সর্বপ্রকার ধারণার অনুষ্ণ ব্যাখ্যা করা গেলেও, এই তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ কিনা সেই বিষয়ে কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ দেওয়া কঠিন। সেক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হল একাধিক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা যে, কোন্ অনুষ্ণ-নীতির জন্য বিভিন্ন চিন্তা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনুষ্ণ নীতিগুলিকে ব্যাপকতর ও সার্বিক নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে না পারছি, ততক্ষণ আমাদের উক্ত প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে। যত বেশি দৃষ্টান্ত আমরা পরীক্ষা করব, সবক্ষেত্রেই যদি কেবলমাত্র সাদৃশ্য, সান্নিধ্য এবং কার্য-কারণ এই তিনটি অনুষ্ণ নীতি কার্যকরী করা যায়, তাহলে এইস্থলে অবাধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো যে, সকল ধারণার অনুষ্ণ নীতি ওই তিনটিই। হিউম অনুষ্ণ নীতির যথার্থতা ও সম্পূর্ণতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে ইতিহাস, সাহিত্য রচনা, মহাকাব্য নির্মাণ বিষয়ক নানান দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে যথোপযুক্ত ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেছেন।

মানুষের সকল জ্ঞানের বিষয় বা অনুসন্ধানের বিষয়কে হিউম দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল ধারণার সম্বন্ধ (relation of ideas) এবং বস্তুস্থিতি (matters

^৪ Ibid, p. 15.

of fact)^৫। ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল জ্যামিতি, বীজগণিত এবং পাটিগণিত সংক্রান্ত বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানগুলিতে যা কিছু ঘোষণা করা হয় সেগুলির সঞ্জামূলক বা প্রমাণমূলক (demonstrative) নিশ্চয়তা থাকে। যেমন ‘অতিভূজের বর্গক্ষেত্র তার দুই বাহুর বর্গক্ষেত্রের যোগফলের সমান’ – এটি হল একটি জ্যামিতিক বচন, যা চিত্রগুলির মধ্যকার সম্বন্ধকে ব্যক্ত করে। একইভাবে ‘পাঁচের তিনগুণ তিরিশের অর্ধেক’ – এই পাটিগণিতের বচনটির দ্বারা ওই সংখ্যাগুলির মধ্যে একটি সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। এই ধরনের বচনগুলি শুধুমাত্র চিন্তনক্রিয়ার দ্বারাই আবিষ্কার করা যায়। বিশ্বজগতের কোথাও কিছু অস্তিত্বশীল কিনা তার উপর নির্ভর করতে হয় না। আমরা জানি প্রকৃতিতে কোনো বৃত্ত বা ত্রিভুজ কখনোই অস্তিত্বশীল হয় না। তা সত্ত্বেও সেগুলির সত্যতা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত। অর্থাৎ বস্তুস্থিতির উপর ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান নির্ভরশীল নয়।

অপরপক্ষে বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সঞ্জামূলক বা প্রমাণমূলক নিশ্চয়তা থাকে না। জগতে বস্তুর বিন্যাস বা অস্তিত্বশীলতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এইজাতীয় জ্ঞান। সেক্ষেত্রে জ্ঞানের অনুরূপ বিষয় বাস্তব জগতে অস্তিত্বশীল কিনা সেই যাচাইকরনের প্রয়োজন হয়। ফলে বস্তুস্থিতি বিষয়ক বচনগুলির সত্যতা কখনোই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণযোগ্য নয়। উক্ত কারণেই প্রতিটি বস্তুস্থিতি বা ঘটনার বিপরীত দৃষ্টান্ত থাকা সম্ভব, এবং এই দুইয়ের মধ্যে কখনোই বিরোধ হয় না। এক্ষেত্রে কোনো বস্তুস্থিতি বা ঘটনার বিপরীত ঘটনাটিও মনের দ্বারা একইভাবে গৃহীত হয়। যেমন ‘আগামীকাল সূর্য উদিত হবে’ এবং ‘আগামীকাল সূর্য উদিত হবে না’ – এই দুটিই বস্তুস্থিতি বিষয়ক বচন। এই বচন দুটি সমানভাবেই বোধগম্য এবং এদের মধ্যে কোনো বিরুদ্ধতা নেই। আমরা যদি ‘আগামীকাল সূর্য উদিত হবে না’ – এই বচনটির মিথ্যা প্রমাণ করতে চাই, তাহলে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ যদি এটি মিথ্যা হিসাবে প্রমাণ করা সম্ভব হতো, তাহলে তা অবশ্যই বিরুদ্ধতাকে নির্দেশ করত, এবং কখনোই মনের দ্বারা স্পষ্টভাবে গৃহীত হতে পারত না।

^৫ Ibid, p. 23.

হিউমের মতানুসারে বস্তুস্থিতি বিষয়ক সকল যুক্তি কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত^৬। এই সম্পর্কের জন্যই আমরা আমাদের স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রমাণকেও অতিক্রম করতে পারি। তাঁর মতে কোনো ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সে কেন এমন কোনো ঘটনা বা বস্তুস্থিতিতে বিশ্বাস করে যা কিনা অনুপস্থিত, তাহলেও ওই ব্যক্তি এই প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিস্বরূপ যা বলবেন, সেই যুক্তি হবে অপর কোনো একটি ঘটনা বা বস্তুস্থিতি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির কাছে জানতে চাওয়া হল যে, তার বন্ধু ফরাসি দেশে আছে; এই ঘটনা বা বস্তুস্থিতিতে সে বিশ্বাস করে কেন? যুক্তিস্বরূপ ওই ব্যক্তি বলতে পারেন যে, তার বন্ধু ফরাসি দেশে থাকার কথা চিঠির মাধ্যমে তাকে জানিয়েছে, বা তার বন্ধুর ফরাসি দেশে যাবার পূর্ব সংকল্পের কথা সে জানে। আমাদের বস্তুস্থিতি বা ঘটনা সংক্রান্ত যুক্তিগুলি একই প্রকৃতির। এইরকম পরিস্থিতিতে প্রতিনিয়ত ধরে নেওয়া হয় যে, বর্তমান বস্তুস্থিতি ও তার দ্বারা অনুমিত অন্যান্য বস্তুস্থিতির মধ্যে কোনো এক সম্বন্ধ আছে। এইরূপ সম্বন্ধ না থাকলে বস্তুস্থিতিগুলি একে-অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না। ফলে একটির দ্বারা অপরটির অনুমান পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে যাবে। হিউম মনে করেন যে উক্তপ্রকার অন্যান্য সকল যুক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেগুলিও কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। এইস্থলে যে প্রমাণগুলি বস্তুস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান দেয়, সেগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে যে, কীভাবে আমরা কার্য-কারণের জ্ঞানে পৌঁছাতে পারি।

উপরোক্ত কার্য-কারণ সম্পর্কের জ্ঞান পূর্বতসিদ্ধ যুক্তির^৭ সাহায্যে লাভ করা যায় না। হিউম-এর মতে এমন কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না, যা থেকে আমরা জানতে পারবো যে, এই জ্ঞান পূর্বতসিদ্ধ। তাই তিনি স্বীকার করেন যে, কার্য-কারণ সম্পর্কের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসৃত হয়। সুতরাং এই জ্ঞান হল পরতঃসাধ্য। যখন আমরা লক্ষ করি কোনো বিশেষ বিশেষ বস্তু একে-অপরের সঙ্গে নিয়তই সংযুক্ত হয়ে থাকে, তখন তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের জ্ঞান আমরা

^৬ Ibid, p. 24.

^৭ Ibid, p. 24.

অভিজ্ঞতার দ্বারাই লাভ করে থাকি। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে।

ধরা যাক কোনো এক প্রবল বুদ্ধি ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্মুখে এমন একটি বস্তু উপস্থিত করা হল যেটিকে ওই ব্যক্তিটি পূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি, সেটি তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। এই পরিস্থিতিতে ওই ব্যক্তি বস্তুটির সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলিকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করেও সেটির কোনো কারণ বা কার্য নির্ণয় করতে সমর্থ্য হবেন না। যেমন পৃথিবীর প্রথম মানব আদম তার নিখুঁত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা জলের তারল্য বা স্বচ্ছতা প্রত্যক্ষ করে কখনোই এটা অনুমান করতে পারত না যে, জলে তার শ্বাসরুদ্ধ হতে পারে, বা আগুনের আলো এবং উষ্ণতা থেকে এটা অনুমান করতে পারত না যে, আগুন তাকে দগ্ধ করতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাবলীর দ্বারা কোনো বস্তু কোন্ কারণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং ওই বস্তুটির দ্বারা কোন্ কার্য উৎপন্ন হবে কোনটিও নির্ণয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের বুদ্ধির দ্বারা বাস্তব অস্তিত্ব এবং বস্তুস্থিতি সম্পর্কে কোনো অনুমান করতে পারা সম্ভব নয়। প্রতিটি কার্য যেহেতু তার কারণ থেকে পৃথক একটি ঘটনা (event)। ফলত কারণ-এর মধ্যে থেকে কার্যকে আবিষ্কার করতে পারা অসম্ভব। তাই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে পূর্বতসিদ্ধভাবে যদি কোনো কার্যের প্রথম কারণ আবিষ্কার বা প্রথম ধারণা গঠন করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটি হবে সম্পূর্ণভাবে একটি যদৃচ্ছ ও খামখেয়ালি (arbitrary) মনোভাবের দৃষ্টান্ত।

হিউমের মতে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি যুক্তির ওপর বা বোধশক্তির কোনো ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁর মতে অভিজ্ঞতায় আমরা যা পাই তা হল বস্তুর কতকগুলি গুণ বা ধর্ম। অভিজ্ঞতা এইরকম কিছু গুণের জ্ঞান আমাদের প্রদান করলেও, এই গুণ অতিরিক্ত কোনো গোপন শক্তির জ্ঞান আমাদের হয় না। যদিও প্রাকৃতিক কোনো শক্তি বা নিয়মের জ্ঞান আমাদের হয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা যখন সেই সদৃশ কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ প্রত্যক্ষ করি, তখন সর্বদাই ধরে নিই যে, তাদের মধ্যেও সদৃশ গোপন শক্তি আছে। পূর্ব অভিজ্ঞতায় আমরা কোনো কারণ থেকে যে কার্যগুলিকে

নিঃসৃত হতে দেখেছি, প্রত্যাশা করি যে, সেই কারণ থেকে পুনরায় সদৃশ কার্য লাভ করা যাবে। যেমন পূর্বে যে রুটি গ্রহণ করে আমরা পুষ্টি লাভ করেছি তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো বস্তু যদি আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়, তাহলে আমরা সেটিকে পুনরায় গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করি না, এবং সুনিশ্চিতভাবেই ধরে নিই যে, ওই বস্তুটি আমাদের শরীরকে পুষ্টি যোগাবে^৮। এটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিন্তনের একটি প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ এবং গোপন শক্তির মধ্যে কোনো সম্বন্ধের জ্ঞান আমাদের হয় না। মন এদের প্রকৃতি সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারে তার উপর ভিত্তি করে কোনো নিয়ত অব্যভিচারী সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই হিউম মনে করেন যে, কার্য-কারণের মধ্যে যে সম্পর্ক তা কোনোভাবেই অনিবার্য সম্পর্ক নয়। আমরা অভিজ্ঞতায় যা পাই তা হল একই ধরনের একটি বস্তুকে সর্বদাই একই ধরনের একটি কার্য অনুসরণ করছে। এক্ষেত্রে অতীতে প্রত্যক্ষিত বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যদি অনুমান করা হয় যে, ভবিষ্যতেও ওই বস্তুগুলিকে একই ধরনের কার্য অনুসরণ করবে তার ব্যাখ্যা কী হবে? হিউমের মতে এইজাতীয় অনুমান যুক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ মানবমন যদি যুক্তির দ্বারা অনুমান করতে চায়, তাহলে এমন কোনো মাধ্যম স্বীকার করা প্রয়োজন যা মনকে এইপ্রকার অনুমান গঠনে সাহায্য করবে। বাস্তবে কার্য-কারণের মধ্যে কোনো মাধ্যমের জ্ঞানই আমাদের হয় না। সুতরাং আমরা যে যুক্তির দ্বারা অতীত অভিজ্ঞতায় আস্থা স্থাপন করি, সেই যুক্তি যদি আমাদের ভবিষ্যৎ অবধারণের মানদণ্ড গঠন করে, তাহলে সেগুলি অবশ্যই সম্ভাব্য হবে।

আমরা জানি কার্য-কারণ সম্পর্কের জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ এবং অস্তিত্ব বিষয়ক সব যুক্তিই এই কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সব সিদ্ধান্ত যে নীতির উপর নির্ভর করে অগ্রসর হয় তা হল, ভবিষ্যতের ঘটনা অতীতের সঙ্গে সদৃশ হবে। প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতাভিত্তিক সকল যুক্তি প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাদৃশ্যের জন্যই সদৃশ কারণ থেকে আমরা সদৃশ কার্যকে প্রত্যক্ষ করি। উক্তপ্রকার সাদৃশ্যের বিষয়টি কোনো অভিজ্ঞতাভিত্তিক যুক্তি

^৮ Ibid, p. 29.

(argument) দ্বারাও প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এই সাদৃশ্যকে প্রমাণ করতে গেলে চক্রক দোষ দেখা দেয়। যেহেতু সাদৃশ্যের বিষয়টিকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে না নিলে কোনো অভিজ্ঞতাভিত্তিক যুক্তিই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তাই সেই যুক্তির দ্বারা ওই সাদৃশ্যকে প্রমাণ করতে চাইলে উক্তপ্রকার দোষ অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে বলে হিউম মনে করেন। সুতরাং কারণ থেকে কার্যকে প্রত্যাশা করার ব্যাপারটি কোনো যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

হিউমের মতে এই প্রত্যাশার মূলে যে নীতিটি সর্বদাই বিদ্যমান থাকে তা হল আমাদের মানসিক প্রবণতা বা অভ্যাস (custom or habit)। অভিজ্ঞতায় একই ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করে আমাদের মনে একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে, যার জন্য আমরা সদৃশ কারণকে দেখলে সদৃশ কার্যকে প্রত্যাশা করি। এইরূপ প্রত্যাশা মানুষের অভ্যাসের পরিণতি। এই অভ্যাসের প্রভাব আমাদের জীবনে যদি না থাকতো, তাহলে যেসব ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের স্মৃতি বা ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রদত্ত হয়, সেই ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনাগুলি সম্পর্কে কোনো জ্ঞানলাভ করা সম্ভবই হতো না। তাই হিউম বলেছেন যে, অভ্যাস হল মানুষের জীবনের মহান পথনির্দেশক^৯। এই অভ্যাসবশত আমাদের মন স্বভাবতই একটি বস্তু থেকে অন্য বস্তুর দিকে প্রসারিত হয়। বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক বা বস্তুস্থিতি বিষয়ক সকল যুক্তির ভিত্তি হল এইপ্রকার মানসিক অভ্যাস। এটা মানব প্রকৃতি বিষয়ক এক সার্বজনীন সত্য। যদিও হিউম মনে করেন যে, কেবল মানুষ নয় মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং আলোচনায় যা পাওয়া গেল তা হল, বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি হল কার্য-কারণ সম্পর্ক, সেই কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তি হল অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি হল মানুষের অভ্যাস বা প্রবণতা। তাই বলা যেতেই পারে যে, বাস্তব অস্তিত্ব বা বস্তুস্থিতি সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্বাস তার মূলে রয়েছে এই অভ্যাস।

^৯ “All inference from experience, therefore, are effect of custom, not of reasoning. Custom, then, is the great guide of human life.”, Ibid, p. 37-38.

বিশ্বাস বলতে হিউম এক্ষেত্রে বাস্তব সত্তা বা বস্তুস্থিতি বিষয়ক বিশ্বাসকেই বুঝিয়েছেন। এইরূপ সকল বিশ্বাসই স্মৃতিতে উৎপন্ন বা নিছক ইন্ড্রিয়লব্ধ কোনো বস্তু, এবং তার সঙ্গে অন্য কোনো বস্তুর অভ্যাসজাত সংযোগ থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে^{১০}। যেমন আগুন ও উত্তাপ বা তুষার ও শীতলতা এগুলির মধ্যে পুনঃ পুনঃ সংযোগ প্রত্যক্ষ করার ফলে আমাদের মন অভ্যাসবশত উক্ত সহগামী পদার্থের একটি থেকে অন্যটির দিকে ধাবিত হয়। ফলে এর থেকে যে বিশ্বাস গড়ে ওঠে তা হল, আগুনে উত্তাপ এবং তুষারে শীতলতা ধর্ম প্রকৃতই বর্তমান থাকে। এই বিশ্বাস হল আমাদের মনের আবেগ বা অনুভূতি যা নিছক কল্পনা থেকে পৃথক। বিশ্বাসের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় যে আবেগের দ্বারা তার সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষ সর্বদাই সচেতন থাকে। এই আবেগ-অনুভূতিগুলিকে সঠিক মাত্রায় নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হলেও, বিভিন্ন শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এগুলি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গঠন করা যায়।

হিউম মনে করেন, এইরূপ বিশ্বাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এর বর্ণনা প্রদান করা যেতেই পারে। তাই তাঁর মতে বিশ্বাস হল কোনো বস্তুর অধিকতর স্পষ্ট, সজীব, দৃঢ়, স্থির শক্তিশালী ধারণা। বস্তুস্থিতি বা বাস্তব অস্তিত্ব বিষয়ক আমাদের যে বিশ্বাস, তা সর্বদা যুক্তিগ্রাহ্য হয় না, এইজাতীয় বিশ্বাসগুলি হল স্বাভাবিক বিশ্বাস। কোনো যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে না। এগুলি মনের স্বাভাবিক প্রবণতা, কোনো যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি এই প্রবণতা উৎপন্ন বা রোধ করতে পারে না। কোনো দুটি বস্তুস্থিতি বা ঘটনার মধ্যে সংযোগ দর্শন করে যখন পুনরায় সংযোগের প্রত্যাশা মনে জেগে ওঠে, তখন অনিবার্যভাবেই বিশ্বাসের স্মৃতি উৎপন্ন হয়। যেমন কেউ উপকার করলে আমরা তার প্রতি ভালোবাসা অনুভব করি, আবার কেউ ক্ষতি করলে তার সম্পর্কে আমাদের মনে ঘৃণার উদ্বেক হয়। একইভাবে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে অভ্যাসনির্ভর প্রত্যাশা আমাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন না করে থাকতে পারে না। ভালোবাসা ও ঘৃণার মতো বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়াটাও মনের একপ্রকার

^{১০} Ibid, p. 40.

স্বাভাবিক বৃত্তি বা প্রবণতা। তাই হিউম বলেন যে, এইপ্রকার আবেগ ও অনুভূতির সত্য ও যথার্থ নামই হল বিশ্বাস^{১১}।

বিশ্বাসের উৎপত্তি কীভাবে হয় ? সেই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হিউম অনুষ্ণ সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি ধারণার অনুষ্ণ সূত্র তিন প্রকার, সেগুলি হল সাদৃশ্য, সান্নিধ্য এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ। এই অনুষ্ণ সূত্রগুলি হল একমাত্র সংযোগ সূত্র যা আমাদের চিন্তাকে ঐক্যবদ্ধ করে। মানুষের চিন্তা এইপ্রকার অনুষ্ণ সূত্রের দ্বারাই নিয়মিতভাবে এক বস্তু থেকে সদৃশ অন্য বস্তুর দিকে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় বা স্মৃতির কাছে যে বস্তু প্রদত্ত হয়, মন তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এমন এক ধারণায় উপনীত হয় যা অপেক্ষাকৃত স্থির এবং শক্তিশালী ধারণা। এইরূপ ধারণাই হল বিশ্বাস, যার উৎপত্তির মূলে আছে অনুষ্ণ সূত্র। হিউমের মতে কার্য-কারণ সম্বন্ধরূপ অনুষ্ণ সূত্র থেকে যে বিশ্বাসের উদ্ভব হয় তার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিটি সত্য, কিন্তু এটিকে তখনই বিশ্বাসের উৎপত্তির মূলে একটি সাধারণ নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে, যদি দেখা যায় যে, অনুষ্ণের অন্যান্য সূত্র সম্বন্ধেও এটি সত্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারছে। এই প্রসঙ্গে হিউম মনে করেন যে, কার্য-কারণের মতো সাদৃশ্য ও সান্নিধ্যের ফলেও বিশ্বাস উৎপন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন আমাদের সম্মুখে বর্তমানে অনুপস্থিত এমন কোনো বন্ধুর ছবি উপস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, ছবির সঙ্গে সাদৃশ্যবশত ওই বন্ধুর সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট এবং সজীব হয়ে ওঠে। এই ধারণা থেকে আমাদের মনে যে সুখ বা দুঃখের অনুভূতির উদ্বেক হয় তা নতুন শক্তি ও সজীবতা লাভ করে। এক্ষেত্রে ওই কার্যটি উৎপন্ন হওয়ার সময় একটি সম্বন্ধ ও একটি মুদ্রণ একত্রে বর্তমান থাকে। সাদৃশ্য অনুষ্ণ সূত্রের দ্বারাই এইরূপ বিশ্বাসের উৎপত্তি।

আবার যখন কোনো বস্তু সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি, তখন আমাদের মন সান্নিধ্যে থাকা কোনো বিষয়ের প্রতি সঙ্গে সঙ্গেই ধাবিত হয়। এক্ষেত্রে যদি কোনো বস্তুর বাস্তব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তাহলে আমাদের মন অধিকতর সজীবতার সঙ্গেই

^{১১} “Belief is the true and proper name of this feeling;...”, Ibid, p. 41.

ওই বাস্তব বস্তুর সান্নিধ্যে থাকা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা যখন বাসস্থান থেকে বেশি দূরে অবস্থান করি, তখন ওই বাসস্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয় আমাদের মনের সঙ্গে যতটা না ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়, তার থেকেও অধিক ঘনিষ্ঠতা অনুভব করি যখন আমরা ওই বাসস্থানের নিকটে অবস্থান করি, সান্নিধ্য অনুষ্ণ সূত্রের জন্যই এইরূপ অনুভব উৎপন্ন হয়। এইস্থলে মন একটি মুদ্রণ থেকেই ধারণায় উপনীত হয়, এবং সেই ধারণা অধিকতর স্পষ্টতা ও সজীবতা লাভ করে বিশ্বাসের উৎপত্তি ঘটায়। কার্য-কারণ সম্বন্ধরূপ অনুষ্ণ সূত্রের দ্বারাও একইভাবে বিশ্বাসের উৎপত্তি ঘটে থাকে। আমরা যখন একটি শুকনো কাঠের টুকরোকে আগুনে নিক্ষেপ করি সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মন ধারণা করে নেয় যে, এর ফলে আগুন নিভে যাবে না, বরং আগুনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে আমাদের মন অগ্নিশিখার ধারণাকে অধিকতর শক্তিশালী ও সজীব করে তোলে এবং ওই বিষয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন করে।

হিউমের মতে এইসব ঘটনার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিশ্বাসের ধারণাটির পূর্বস্বীকৃতি না থাকলে কোনো সম্বন্ধই কার্যকরী হতে পারতো না। পূর্বোক্ত উদাহরণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, আমার মনে পূর্ব থেকেই এই ধারণা উপস্থিত ছিল যে, আমার বন্ধু জীবিত আছে। তা না হলে আমার বন্ধুর বর্তমান ছবির সঙ্গে সাদৃশ্যবশত সুখ বা দুঃখের অনুভূতি আমার হতো না। আবার আমার বাসস্থানের পূর্ব অস্তিত্বের ধারণা না থাকলে, আমি কখনোই বাসস্থানের সঙ্গে সান্নিধ্যবশত কোনো ঘনিষ্ঠ অনুভূতি গড়ে তুলতে পারতাম না। তেমনভাবেই আগুন দহন করে, এই পূর্ব ধারণা যদি আমার না থাকতো, তাহলে কার্য-কারণের ভিত্তিতে আমি কখনোই অনুভব করতে পারতাম না যে, আগুনে কাঠ নিক্ষেপ করলে তা অগ্নিশিখাকে আরো তীব্র করে তুলবে।

হিউম মনে করেন কারণ থেকে কার্যে উপনীত হওয়ার পশ্চাতে কোনো যুক্তি থাকে না, আছে কেবল অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসজাত প্রত্যাশা। এখানে অভ্যাস বলতে বুঝতে হবে সান্নিধ্য, সাদৃশ্য ও কার্য-কারণ সম্বন্ধকে। বস্তুস্থিতি বা বাস্তব অস্তিত্ব

সম্পর্কিত আমাদের সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এটিই হল মনের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ^{১২}। তিনি মনে করেন যে, প্রকৃতির কার্য পরম্পরা ও আমাদের ধারণার পারস্পর্যের মধ্যে এক ধরনের পূর্ব নির্ধারিত সামঞ্জস্য বর্তমান। এক্ষেত্রে যে ক্ষমতা বা শক্তি দ্বারা প্রকৃতির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয় তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের চিন্তাধারা বা ধারণাসমূহ প্রকৃতির অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একই ধারায় চলতে থাকে। অভ্যাস হল সেই সূত্র যার দ্বারা এই ধরনের অনুরূপতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজাতির জীবনধারণের জন্য এই অনুরূপতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যদি কোনো বস্তুর উপস্থিতি, তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বস্তুগুলির ধারণার উদ্রেক করতে না পারতো, তাহলে মানুষের সকল জ্ঞান তার স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়ের সীমিত পরিসরেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত। এইস্থলে অভ্যাসজাত প্রত্যাশা থেকে গড়ে ওঠা বিশ্বাসরূপ মানসিক বৃত্তি আমাদের অনুরূপ বা সদৃশ কারণ থেকে অনুরূপ বা সদৃশ কার্য অনুমান করার প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করে।

হিউমের মতানুসারে পূর্বোক্ত বিশ্বাস হল মানুষের সহজাত বা স্বাভাবিক প্রবণতা। এইরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে নিছক কল্পনার পার্থক্যকরণ অত্যাবশ্যিক। কারণ কল্পনা ও বিশ্বাস উভয়ই মনের বৃত্তি এবং এদের মধ্যে উপাদানগত বা বস্তুগত কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বিশেষ মনোভাব বা অনুভূতির দিক থেকেই এদের পৃথক করা যেতে পারে। কল্পনা ও বিশ্বাস উভয়ের উপাদান হল মুদ্রণজাত ধারণা। সুতরাং এমন বলা সম্ভব নয় যে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধারণা যুক্ত হয়ে থাকে এবং কল্পনার সঙ্গে ওই বিশেষ ধারণা যুক্ত হয় না। আমাদের সব ধারণার উপর মনের কর্তৃত্ব কায়েম থাকে। মন তার ইচ্ছামত কোনো ধারণাকে কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, আবার যেকোনো ধারণাতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, যদিও তার বাস্তব অস্তিত্ব সর্বদা নাও থাকতে পারে। যেমন আমরা কল্পনায় ধারণা করতেই পারি যে, একটি প্রাণীর মাথা মানুষের মতো, দেহটি সিংহের মতো, কিন্তু এমন প্রাণীর বাস্তব

^{১২} Ibid, p. 46.

অস্তিত্বশীলতায় বিশ্বাস করা আমাদের সাধ্যাতীত। কাজেই কল্পনা ও বিশ্বাসের পার্থক্য হল বিশেষ আবেগ ও অনুভূতির পার্থক্য, যা বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত থাকে; কল্পনার সঙ্গে যুক্ত থাকে না।

এইরূপ আবেগ বা অনুভূতি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, ঐচ্ছিকভাবে আমরা এই অনুভূতি সৃষ্টি করতেও পারি না। হিউমের মতে যে আবেগ বা অনুভূতি উপস্থিত থাকলে কোনো চিন্তাধারা বিশ্বাসে পরিণত হয়, এবং যা উপস্থিত না থাকলে তা কাল্পনিক বিষয় হয়েই থেকে যায়, তার লক্ষণ নিরূপণ করাটা সহজসাধ্য নয়, প্রকারান্তরে অসম্ভব বলা যেতে পারে। তথাপি তার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করাটা অসঙ্গত নয়। তাঁর মতে বিশ্বাস হল এমন এক অনুভূতি যা কল্পনা অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও তীব্র। অর্থাৎ বলা যেতেই পারে যে, বিশ্বাসের ধারণা, কল্পনার ধারণা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট, সজীব, দৃঢ় এবং তীব্র। কোনো ধারণাক্রম থেকে বিশ্বাসের উৎপত্তি ঘটে না। ধারণা কী ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয় – মনের সেই আবেগ বা অনুভূতির থেকেই বিশ্বাসের জন্ম হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, আমি বিশ্বাস করি যে, একটি গতিশীল বিলিয়ার্ড বল দ্বিতীয় অন্য একটি বলকে আঘাত করলে, প্রথম বলটির গতি দ্বিতীয় বলটিতে সঞ্চারিত হবে, এবং দ্বিতীয় বলটির স্থান পরিবর্তন ঘটবে। এক্ষেত্রে আমি কিন্তু এমন কল্পনাও করতে পারি যে, প্রথম বলটি দ্বিতীয় বলটিকে স্পর্শ করেই থেমে যাবে। এক্ষেত্রে আমার প্রথম চিন্তাধারার সঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তাধারার পার্থক্য স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। প্রথম চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে একরকম অনুভূতি যা ভিন্ন ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয়। স্পষ্টতই দ্বিতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে এইজাতীয় কোনো অনুভূতি যুক্ত থাকে না। সুতরাং বিশ্বাস হল মানবমনের এমন এক অনুভূতি যা বচনের ধারণাগুলিকে কল্পনার অলীক বস্তুগুলি থেকে পৃথক করে থাকে।

অধিবিদ্যা

হিউম দর্শন বলতে বুঝাতেন মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনাকে। এই মানবপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দার্শনিকগণ যে আঙ্গিকে নিজেদের বক্তব্যগুলি

উপস্থাপিত করে থাকেন, তার ভিত্তিতে হিউম দার্শনিক অনুসন্ধানের যাবতীয় বিষয়কে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, একটি হল ‘সহজ ও সুস্পষ্ট দর্শন’ (easy and obvious) এবং অপরটি হল ‘নিগূঢ় ও অস্পষ্ট দর্শন’ (accurate and abstruse)^{১০}। এই দুই প্রকার দর্শনেরই নিজস্বতা বর্তমান এবং মানব প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় উভয় ক্ষেত্রেই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। হিউম মানবজীবনে এই দুই প্রকার দর্শনচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও, জনমানসে এগুলির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মাত্রাভেদ স্বীকার করে থাকেন।

হিউমের মতে, সহজ ও সুস্পষ্ট দর্শনে মানুষকে প্রধানত কর্মপ্রবণ জীব হিসাবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। মনে করা হয় যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে মূলত কর্ম করার জন্যই। সেই কারণে এইপ্রকার দর্শনে ব্যবহারিক জীবনে মনুষ্যকৃত ক্রিয়াকলাপ বা আচরণের মধ্য থেকে নানা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নির্বাচন করে, সেগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেখানোর পাশাপাশি তাদেরকে যথাযথ কর্মপথে চালিত করে নিজ নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহিত করা হয়। মনে করা হয় যে, কর্মপ্রবণ মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গুণ বা ধর্ম হল সততা। মানুষ যেন সততা ও অসততার পার্থক্যকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে সেই উদ্দেশ্যে যেকোনো আলোচ্য বিষয়কে যথাসম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে তাদের সামনে তুলে ধরা এই দর্শনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। হিউমের মতে এই ধরনের দার্শনিক আলোচনায় যেকোনো বিষয় সহজ ও স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয় বলে, তা জনমানসে যথেষ্ট খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে থাকে, এবং স্বাভাবিকভাবেই সেটি মানবজীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারে উপযোগী। এই দর্শন এমন সত্যানুসন্ধান ব্রতী যা বাস্তবানুগ। হিউম মনে করেন, বাস্তব বা মূর্ত বিষয় কেন্দ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে এইজাতীয় দর্শনচর্চা অগ্রসর হয় বলে দার্শনিকতার পরিসরে কোনোপ্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকলে তা সহজেই সংশোধনযোগ্য। সেই কারণে এইপ্রকার দর্শন চিত্তাকর্ষক হয়, এবং পরিবর্তনের সম্ভাবনা স্বীকৃত হয়ে থাকে বলে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কখনোই সুনির্দিষ্ট নয়। তাঁর মতে

^{১০} Ibid, p. 2.

অধিকাংশ সাধারণ মানুষের জীবনে প্রাপ্ত মূর্ত, ব্যবহারিক, সংশোধনযোগ্য, সহজ ও স্পষ্ট দর্শন বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব অপরিসীম।

অপর একপ্রকার দর্শন হল নিগূঢ় ও অস্পষ্ট দর্শন, এই দর্শন অনুসারে মানুষ হল মূলত চিন্তাপ্রবণ জীব। মানুষকে যৌক্তিক জীব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এইজাতীয় দর্শনচর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য। মনে করা হয়, মানব প্রকৃতির অনুসন্ধান মননের বিষয় মাত্র। মানুষের বোধশক্তির গঠন ও তার উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে স্বল্প সংখ্যক দৃষ্টান্ত নির্বাচনের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়ে থাকে। এইরূপ পরীক্ষণের পশ্চাতে অভিপ্রায় হল সেইসব মূলসূত্রগুলিকে আবিষ্কার করা, যেগুলির সাহায্যে মানুষের বোধশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, তার ভাবাবেগ জাগ্রত হয় এবং যে সকল সূত্রের ভিত্তিতে আমরা মনুষ্যকৃত কোনো কর্ম বা আচরণের ভালোমন্দ বিচারে প্রবৃত্ত হই। এই দার্শনিক আলোচনার মূল উপজীব্য হল এযাবৎ অনাবিষ্কৃত সেই মূলসূত্রগুলিকে খুঁজে বার করা, যার দ্বারা যেকোনো সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিতভাবে লাভ করা সম্ভব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মূলসূত্র আবিষ্কার সম্ভব না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিকদের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। কোনোরকম অসুবিধাই তাঁদেরকে বিচলিত করতে পারে না। এক্ষেত্রে তাঁরা কতকগুলো বিশেষ দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে সামান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও আরও ব্যাপকতর নিয়ম-নীতির অনুসন্धानে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে। সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ না জানা পর্যন্ত তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। বলাই বাহুল্য এক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তনকার্য সম্পূর্ণভাবে বিমূর্ত বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে, যা সাধারণ মানুষের কাছে নিগূঢ় ও অস্পষ্ট বলে মনে হয়। যদিও এইস্থলে দার্শনিকদের লক্ষ্য হল জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনুমোদন লাভ করে নিজেদের পরিশ্রমকে সার্থক করে তোলা, তা সে যতই বাস্তববিমুখ হোক না কেন। সেই কারণে এইজাতীয় দর্শনচর্চায় বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের অনীহা দেখা যায়, এবং জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার কারণে জনমানসে খ্যাতি, জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বিস্তারে অক্ষম হয়ে থাকে।

হিউম মনে করেন, উক্তপ্রকার দর্শনচর্চায় যুক্তিতর্কের সূক্ষতার প্রতি অধিক আগ্রহী হওয়ার কারণে দার্শনিকগণ বাস্তববিমুখ হয়ে থাকেন। এমনকি কখনো কখনো

বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও পিছপা হন না। ফলে এক্ষেত্রে ভ্রান্তির শিকার হলে তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা বৃথা। দার্শনিক পর্যালোচনায় কোনো এক স্তরে ভুল ঘটে গেলে নিছক যুক্তিতর্কের প্রভাবে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি বা বিস্তার হতেই থাকে। সংশোধনের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

নিগূঢ় ও অস্পষ্ট দর্শন সম্পর্কে হিউমের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি এইপ্রকার দর্শনচর্চার অসুবিধার দিকগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সেই কারণে মনে করতেন যে, নিগূঢ় ও অস্পষ্ট দর্শন অপেক্ষা সহজ ও স্পষ্ট দর্শনচর্চা সাধারণ মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। যদিও হিউম প্রতিটি মানুষকে হয় কর্মপ্রবণ না হয় যুক্তিপ্রবণ, এমন ভূমিকায় দেখতে চান না। কারণ তিনি মনে করেন, নিছক যুক্তিবাদী দার্শনিক যেমন সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত, তেমনই নিছক অজ্ঞ ব্যক্তি ততধিক অবজ্ঞার পাত্র। প্রতিটি মানুষই যৌক্তিক জীব এবং একইসঙ্গে সে সামাজিক এবং কর্মপ্রবণ, তাই সমাজজীবনে যুক্তি ও কর্মের সমন্বয় প্রয়োজন। তাহলেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে হিউম সেই মানুষকেই নিখুঁত বলে মনে করেন, যিনি পূর্বোক্ত দুটি চরমসীমার মধ্যবর্তী অবস্থানে বিরাজমান। তাঁর মতে প্রকৃতি মানুষের জীবনকে কোনো বিশেষ দিকে পরিচালিত করার অনুপ্রেরণা যোগায় না। তাই মানবজীবনের সার্থকতার জন্য সব দিকগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, মানুষ যখন বিজ্ঞানচর্চা করবে সেই বিজ্ঞান যেন মানবিক হয়, আবার কোনো দার্শনিক যেন শুধুমাত্র বিমূর্ত বিষয়ের চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত না রাখেন। দর্শন যেন সর্বদাই জীবনমুখী হয়ে ওঠে, সেই বিষয়ে হিউম সমাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন।

হিউম মনে করেন, অধিকাংশ মানুষ যদি নিগূঢ় ও অস্পষ্ট দর্শনের প্রতি কোনোরকম বিরোধিতা, অবজ্ঞা বা নিন্দা প্রদর্শন না করে, প্রতিতুলনায় সহজ ও স্পষ্ট দর্শনকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, তাহলে কারোর বলার মত কিছু অবশিষ্ট থাকে না^{১৪}। কারণ সকলকে আপন পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী দর্শনচর্চা করতে উদ্বুদ্ধ

^{১৪} Ibid, p. 4.

করাটাই যুক্তিসঙ্গত। সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন সহজ ও স্পষ্ট দর্শনচর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তির সর্বপ্রকার বিমূর্ত যুক্তিতর্ক, অর্থাৎ অধিবিদ্যার বিরোধিতা করে নিগূঢ় ও অস্পষ্ট দর্শনচর্চাকে বর্জন করতে প্রয়াসী হন। সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হিউম এক্ষেত্রে অধিবিদ্যাকে সামগ্রিকভাবে বর্জন করার পক্ষপাতী নন। কারণ তিনি মনে করেন যে, বিমূর্ত দর্শনচর্চার মাধ্যমে সহজ ও স্পষ্ট দর্শনের ভিত্তি সুনিশ্চিত হতে পারে। বিমূর্ত দর্শনচর্চাকে পরিহার করে সহজ ও স্পষ্ট দর্শনচর্চা যৌক্তিকভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। তা সত্ত্বেও নিগূঢ় ও অস্পষ্ট দর্শনচর্চায় মানুষের অনীহার কারণ কী? হিউমের মতে এর কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে, উক্ত দর্শনচর্চা অধিক কষ্টসাধ্য। বরং এইজাতীয় দর্শনকে অনিশ্চয়তা ও ভ্রান্তির অনিবার্য উৎস হিসাবে মনে করা থেকেই সমস্যার সূত্রপাত।

তৎকালীন সময়ে অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল এই যে, প্রকৃত বিজ্ঞান হিসাবে অধিবিদ্যার চর্চা অসম্ভব^{১৫}। কারণ অধিবিদ্যায় এমন কতকগুলো বিমূর্ত বিষয়ের অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়, যা মানববুদ্ধির অগম্য। মনে করা হতো মানুষের অহম বোধ এবং লৌকিক কুসংস্কার থেকে এর আবির্ভাব। যথাযথ যুক্তির অভাবে সকল মানুষের ক্ষেত্রে না হলেও, বেশ কিছু অসতর্ক মানুষের মনে এইজাতীয় বিমূর্ত বিষয়ের চিন্তা প্রবেশ করে, এবং মানুষের মন অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মানববুদ্ধির অগম্য অধিবিদ্যক চর্চায় হিউমের কোনো আগ্রহ না থাকলেও, তিনি অধিবিদ্যক বিষয়সমূহের চর্চাকে সামগ্রিকভাবে বর্জন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। তাঁর মতে এযাবৎ অধিবিদ্যক চর্চা থেকে কোনো সুনিশ্চিত জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া না গেলেও, ভবিষ্যতে সফল হওয়া যাবে না এমন নয়। সুতরাং অধিবিদ্যক চর্চা অর্থহীন নয়। আমাদের, অতীতের ফলাফলে হতাশ না হয়ে যত্ন সহকারে যথার্থ

^{১৫} Ibid, p. 4.

আধিবিদ্যক অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া উচিত^{১৬}। হিউম এক্ষেত্রে যথার্থ বা সত্য এবং অযথার্থ বা মিথ্যা অধিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে চান।

অযথার্থ অধিবিদ্যাকে বর্জন করে যথার্থ অধিবিদ্যার চর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞানের মত করেই সুনিশ্চিত সত্য লাভ করা সম্ভব হবে বলেই হিউমের অভিমত। তাঁর মতে অযথার্থ অধিবিদ্যার মাধ্যমে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ যুক্তির ভিত্তিতে বিমূর্ত সত্যতায় উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা না করে, যথার্থ অধিবিদ্যার চর্চার মাধ্যমে অভিনব সত্য উদঘাটন করাটাই আধিবিদ্যক অনুশীলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর জন্য প্রয়োজন সু-যুক্তির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে কু-যুক্তিকে ধ্বংস করা। হিউমের মতে যথার্থ অধিবিদ্যার ভিত্তি হল সুনির্দিষ্ট ও প্রকৃত যুক্তির সযত্ন অনুশীলন, এবং আন্তরিকভাবে মানুষের বোধশক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তার সীমানা নির্দেশ করে মানবমনের মানচিত্র গঠন করা। ফলত আমরা বুঝতে পারবো যে, কোন্ বিষয়গুলো আমাদের বোধশক্তির সীমার আওতাভুক্ত এবং কোনগুলি সীমা বহির্ভূত।

অযথার্থ অধিবিদ্যার চর্চায় যাঁরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তাঁরা এমন কতকগুলি বিমূর্ত বিষয়ের অনুসন্ধানে নিজেদের নিযুক্ত করে থাকেন, যেগুলিকে জানতে পারাটা অসম্ভব, কারণ তা মানুষের বোধশক্তির অগম্য। এইজাতীয় আধিবিদ্যক অনুসন্ধানে খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পর মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, সেটি এক নিষ্ফল প্রক্রিয়া, তখন সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং আধিবিদ্যক চর্চাকে অর্থহীন বলে মনে করে। তাই হিউম মনে করেন, বুদ্ধির অগম্য বিষয়কে জানার বৃথা চেষ্টা না করে যথার্থ অধিবিদ্যার চর্চার মাধ্যমে যা কিছু মানুষের বোধশক্তির আওতাভুক্ত সেগুলিকে জানার চেষ্টা করা প্রয়োজন। যেমন মানব প্রকৃতির অনুসন্ধান বিষয়ক যাবতীয় যুক্তি বিমূর্ত ও কষ্টসাধ্য হলেও তা মিথ্যা নয়। আমরা এই অনুসন্ধানে যতই অগ্রসর হতে থাকবো ততই নতুন সত্য বা তথ্য উদঘাটিত হবে। এই প্রসঙ্গে হিউমের বক্তব্য হল, যদি এমনও হয় যে, বিমূর্ত বিষয়কে জানার নির্দোষ কৌতূহল ছাড়া আধিবিদ্যক চর্চার অন্য কোনও

^{১৬} “...must cultivate true metaphysics with some care, in order to destroy the false and adulterate.”, Ibid, p. 6.

উপযোগিতা নেই, তাহলেও এর মূল্য অনস্বীকার্য, যেহেতু মানবজাতির আনন্দলাভের জন্য প্রদত্ত নিরীহ উপায় বা মাধ্যমগুলির মধ্যে আধিবিদ্যক চর্চা অন্যতম^{১৭}।

নীতিবিদ্যা

হিউমের জ্ঞানতত্ত্বের পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে তিনি দুই ধরনের জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন, একটি হল ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান যা বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ, এবং অন্যটি হল ব্যাপার বা তথ্য বিষয়ক জ্ঞান, যার উৎস হল অভিজ্ঞতা। এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান সম্পর্কে হিউম সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। অপরপক্ষে জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে হিউম অভিজ্ঞতাকে নৈতিকতার উৎস হিসাবে স্বীকার করলেও, নৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনি সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করেছেন। সেক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব ও নৈতিকতার মধ্যে একটা মেলবন্ধন রচনার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়।

হিউম সুসংবদ্ধভাবে কোনো নৈতিক তত্ত্ব প্রদান করেননি, যদিও নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর মতামত যথেষ্ট স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। কারণ তাঁর মতে, নৈতিকতার মতো একটি বিষয় যা মানবজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রতি সবার সর্বাপেক্ষা মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন^{১৮}। অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত নৈতিকতারও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। বাহ্যজগতকে আমরা যেমন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারি, একইভাবে মানব প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত যে নৈতিক জগৎ সেটিকেও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জানা সম্ভব। অভিজ্ঞতা-পূর্ব কোনো নৈতিক জগতের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতেন না। বিশ্বাস করতেন যে, অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করা যায়, ঠিক তেমনই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই নৈতিক নিয়মও গড়ে তোলা সম্ভব।

^{১৭} Ibid, p. 5.

^{১৮} “Morality is a subject that interests us above all other”, David Hume, *A Treatise of Human Nature*, ed. by L.A.Selby-Bigge, Clarendon Press, Oxford, 1888, p. 455.

ধ্রুপদী নীতিবিদদের মতো হিউম শাস্ত্র, সনাতন কোনো নৈতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে নৈতিকতার মূল লক্ষ্য হল মানবজীবনের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি মূল্যগুলিকে নিরূপণ করা। বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে তা নির্ণয় করা অসম্ভব। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ পরীক্ষণ-এর মাধ্যমে আমরা নৈতিক বিচারের উপযোগী মূলসূত্রগুলিকে খুঁজে পেতে পারি। নীতিবিজ্ঞানকে হিউম পরতঃসাধ্য বিজ্ঞান হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। তাই নৈতিকতার নিয়মগুলি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন না, বরং এই প্রসঙ্গে হিউমের বক্তব্য হল, নৈতিক বচনগুলির বিরোধী বচন কখনোই স্ব-বিরোধী হবে না, কারণ তা বুদ্ধিলব্ধ নয়।

হিউম নৈতিকতা বলতে বুঝতেন এমন অনুভূতিকে যা সকল মানুষের মধ্যে একইভাবে নিহিত থাকে। সকল মানুষের নৈতিকতার ধারণা আছে একথা বলার অর্থ দাঁড়ায় তিনি এমন এক অনুভূতিকে নির্দেশ করতে চাইছেন, যা থাকার জন্য কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে সকল মানুষ বা বেশিরভাগ মানুষ একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। হিউম নৈতিক মূল্যায়ন বলতে বোঝেন কোনো বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তির মনে অনুমোদন বা অননুমোদনের অনুভূতির সৃষ্টি হওয়াকে। এই নীতি অনুসরণ করে কোনো কাজকে তখনই ভালো বলা যাবে, যখন সেটি ব্যক্তির মনে অনুমোদনের অনুভূতির সৃষ্টি করবে, এবং কোনো কাজকে তখনই মন্দ বলা হবে যখন তা কোনো ব্যক্তির মনে অননুমোদনের অনুভূতি সৃষ্টি করবে। এক্ষেত্রে কোনো একটি কাজ অনুমোদনের যোগ্য কিনা তা নির্ভর করে সেই কাজটি কর্তার নিজের বা অন্য ব্যক্তির জন্য সুখ উৎপাদনকারী বা উপযোগী কিনা তার উপর। কোনো কাজ যদি সুখ উৎপাদন করতে পারে তাহলে তা নৈতিক বিচারে অনুমোদনযোগ্য, এবং সেই কাজটি ভালো হিসাবে বিবেচিত হবে। অপরপক্ষে কোনো কাজ যদি সুখ উৎপাদন করতে না পারে, তাহলে তা নৈতিক বিচারে অননুমোদনযোগ্য হিসাবে গৃহীত হবে, এবং মন্দ প্রতিপন্ন হবে। এক্ষেত্রে কোনো একটি কাজ সুখ উৎপাদন করতে পারবে কিনা তা বুদ্ধির মাধ্যমে জানা যায় না। সেটি জানার একমাত্র উপায় হল আমাদের অভিজ্ঞতা। অনুমোদন এবং

অননুমোদনের এই অনুভূতিকে হিউম নৈতিক ভাবাবেগ (moral sentiment)^{১৯} বলেছেন, বা কখনো কখনো নৈতিক অনুভূতি (moral sense) রূপেও ব্যাখ্যা করেছেন।

হিউমের নৈতিক চিন্তায় সুখ ও উপযোগিতা একই পর্যায়ভুক্ত এবং নৈতিক আবেগ, অনুভূতি বা ভাবাবেগকে (passion) একই অর্থে বুঝতে হবে। তিনি সুখবাদের সমর্থক হলেও আত্মসুখবাদী ছিলেন না। কারণ তিনি মনে করতেন, মানুষ যে কেবল নিজের সুখের অন্বেষণ করে তা নয়, সে অপরের সুখও কামনা করে। একইভাবে তিনি নৈতিক প্রেক্ষাপটে বুদ্ধি অপেক্ষা নৈতিক আবেগকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু, এইস্থলে তিনি আবেগ বলতে ব্যক্তিসাপেক্ষ যে আবেগ, যা প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয় শুধুমাত্র সেইজাতীয় আবেগ বা অনুভূতির কথা বলতে চাননি। হিউমের নৈতিক চিন্তায় স্বীকৃত আবেগ হল সেই আবেগ, যা সকলের মধ্যে একইভাবে বিদ্যমান। যার দ্বারা গঠিত নৈতিক মানদণ্ড সার্বজনীন ও নৈর্ব্যক্তিক হবে। তাঁর মতে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেমন স্বার্থপরতার অনুভূতি আছে ঠিক তেমনি পরার্থপরতার অনুভূতিও থাকে। এক্ষেত্রে প্রথম প্রকার অনুভূতির উপর নির্ভর করে কোনো নৈতিক মূল্যায়ন কাম্য নয়। কারণ এই অনুভূতিগুলি একান্তভাবে বিশেষ ব্যক্তিসাপেক্ষ। দ্বিতীয় প্রকার অনুভূতির দ্বারাই অপেক্ষাকৃত পক্ষপাতহীন, সার্বজনীন ও নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়ে থাকে। কারণ এই অনুভূতিগুলি সকল ব্যক্তির মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। ফলত এইপ্রকার অনুভূতির দ্বারাই নৈতিক মানদণ্ড গড়ে তোলা যেতে পারে বলে হিউম মনে করতেন। এই অনুভূতিগুলি সকলের মধ্যে সমানভাবে থাকে বলেই সবাই একইরকম নৈতিক মনোভাব পোষণ করতে পারে, বা প্রত্যেকেই নৈতিক বিচারের প্রতি সমানাধিকার দাবি করতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হিউম ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতার সমর্থক ছিলেন, তাই কোনো মানুষ নৈতিক ভালো-মন্দ, ঠিকিত্য-অনৌচিত্য ইত্যাদি মূল্যগুলি সম্পর্কে

^{১৯} David Hume, *An Enquiry concerning the Principles of Morals*, ed. by J.B.Schneewind, Hackett Publishing Company, Cambridge, 1983, p. 85-8.

জ্ঞানলাভ করেছেন, একথা তখনই বলা যাবে, যদি সেই ব্যক্তিটি অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যভিত্তির উপর নির্ভর করে কোনো একটি কাজ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে অনুমোদন বা অননুমোদনের অনুভূতি গড়ে তুলতে সক্ষম হন। সেক্ষেত্রে আমরা কোনো নৈতিক বিচারে তখনই সহমত পোষণ করতে পারবো, যখন আমরা নিজেদের স্বার্থবুদ্ধিগুলিকে নৈতিক বিচারের প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হব। এমন হতেই পারে যে, বিভিন্ন ব্যক্তি নৈতিক মূল্য সম্পর্কে সহমত হতে পারলো না। সেই কারণে হিউম নৈতিক মূল্যগুলি সম্পর্কে সংশয়ী ছিলেন, কিন্তু নৈতিকতার অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোনো দ্বিধা তাঁর মনে ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন সকল মানুষের মনে নিহিত পরার্থপরতার অনুভূতি নৈতিকতার পথ প্রশস্ত করবে। তাই তিনি নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন।

হিউম নৈতিক প্রেক্ষাপটে নৈর্ব্যক্তিকতা বা সার্বজনীনতার দাবি জানালেও, তা কীভাবে লাভ করা যায় সেই ব্যাপারে যুক্তির ভূমিকাকে প্রাধান্য দেননি। তাঁর মতে যুক্তি হল আবেগের অধীনস্থ দাস এবং সেইরূপেই তার থাকা উচিত^{২০}। এইস্থলে তিনি যুক্তি অপেক্ষা মানুষের বিশ্বাসের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নৈতিকতা প্রসঙ্গে হিউমের অভিমত তাঁর মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাসই এক্ষেত্রে অধিক নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ অনুসারে মানুষ চিন্তাপ্রবন জীব হলেও ব্যবহারিক জীবনে সে বিশ্বাসের উপর ভরসা রাখে। যেহেতু নৈতিকতা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই নৈতিক বিচারের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত এইসব মূল্যায়ন বিশ্বাসের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে। এইরূপ বিশ্বাসের মূলে আছে মানুষের অনুভূতি। নৈতিকতার ক্ষেত্রে হিউম এইপ্রকার অনুভূতিমূলক বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিলেও নৈতিক সমস্যার সমাধানে বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে যুক্তির ভূমিকাকে সর্বৈব অস্বীকার করেননি, যদিও যুক্তিকে আবেগ চালিত দাসরূপে গণ্য করেছেন। এর অতিরিক্ত কোনো ভূমিকা যুক্তির থাকতে পারে না বলেই তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে বিশুদ্ধ যুক্তি হল নিষ্ক্রিয় মানববৃত্তি,

^{২০} “Reason is, and ought only to be the slave of passions”, David Hume, *A Treatise of Human Nature*, 1888, p. 415.

অর্থাৎ এইরূপ যুক্তি মানুষের মনে কোনো কর্মের ইচ্ছা বা কামনা-বাসনার উদ্রেক করতে অপারগ। এই বিশুদ্ধ যুক্তি পরোক্ষভাবে মানুষের মনে আবেগ, অনুভূতির সঞ্চার করে, তার কর্মপ্রেরণা বা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারে মাত্র। যুক্তির ভূমিকা এইটুকুই, তা সর্বদাই আবেগের অনুগামী, মানুষের আবেগ, অনুভূতি হল তার নৈতিক বোধের প্রধান উৎসস্থল।

হিউম নৈতিক প্রেক্ষাপটে দুই প্রকার আবেগের কথা উল্লেখ করেছেন, একটি হল প্রত্যক্ষ আবেগ (direct passion) এবং অপরটি হল পরোক্ষ আবেগ (indirect passion)^{১১}। প্রত্যক্ষ আবেগ মানুষের সুখ-দুঃখের মুদ্রণ থেকে সরাসরি উৎপন্ন হয়। যেমন ক্রোধ, আনন্দ, ভয়, হিংসা, সুখ, দুঃখ, হতাশা ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। অন্যদিকে পরোক্ষ আবেগ সুখ-দুঃখের মুদ্রণ থেকে পরোক্ষভাবে উৎপন্ন হয়, যেমন অহংকার, গর্ব, ঘৃণা, ভালোবাসা, দয়া, উদারতা ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ, সুখ-দুঃখের মুদ্রণ বা অনুভূতি হল সকল আবেগের উৎসস্থল। এই সুখ ও দুঃখের অনুভূতি মানুষের মধ্যে কর্মপ্রেরণার সঞ্চার করে এবং তার ভিত্তিতেই আমরা কাজের ভালো-মন্দ বিচার করে থাকি। অর্থাৎ কোনো কর্ম সুখ উৎপন্ন করলে সেই কর্মকে ভালো, এবং কোনো কর্ম দুঃখ উৎপন্ন করলে সেই কর্মকে মন্দ হিসাবে বিবেচিত করতে পারি।

এখন প্রশ্ন হল, কোনো একটি কাজ কী কারণে মানুষের মনে সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক অনুভূতি সৃষ্টি করে? এর উত্তরের সমর্থনে হিউম উল্লিখিত উপযোগিতার ধারণাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিউম এখানে উপযোগিতা বলতে কোনো ব্যক্তি বিশেষের উপযোগিতার কথা বোঝাতে চাননি। তিনি সামগ্রিকভাবে সমাজের সকল মানুষের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষের জীবনে যে কার্যের উপযোগিতা আছে সেই কার্যই হল সুখদায়ক এবং তা ভালো, যে কার্যের উপযোগিতা নেই তা হল দুঃখদায়ক এবং তা মন্দ। এখানে সুখ বলতে সামাজিক সুখ বা পরসুখকেও গ্রহণ করতে হবে। হিউমের নৈতিকতায়, সুখ আত্ম বা

^{১১} Ibid, pp. 438-9.

পর যাই হোক না কেন, সেটিকে উপযোগিতার সমার্থক হিসাবে ধরে নেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

পরসুখ কীভাবে আত্মসুখে সঞ্চারিত হয় সেই প্রসঙ্গে হিউম মানুষের মধ্যে ‘সহানুভূতি’ (sympathy) নামক একপ্রকার গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, এবং এই সহানুভূতির জন্যই যে একজনের আবেগ বা অনুভূতি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয় সেই ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। তাঁর মতে যেকোনো মানুষই আত্মসুখ লাভ করতে চায়। আবার কোনো মানুষ যখন অপরের চোখে-মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ করে সেই ব্যক্তির আবেগ বা অনুভূতি সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তোলে, এবং এইপ্রকার অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির ফলে উক্ত ধারণাক্রম যখন স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে ওঠে তখন তা মুদ্রণের সৃষ্টি করে। এই পর্যায়ে কোনো ব্যক্তি অন্যের অনুভূতিকে নিজের অনুভূতিরূপে গ্রহণ করে, এবং এই সহানুভূতির মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করে।

হিউম নৈতিক প্রেক্ষাপটে দুই ধরনের ভাষার উল্লেখ করেছেন। একটি হল নিজের প্রতি ভালোবাসার ভাষা (language of self-love) এবং অপরটি অন্যের প্রতি সহানুভূতির ভাষা (language of sympathy)। প্রথম প্রকার ভাষা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ভাষা ব্যবহারের মধ্যে সমরূপিতা লক্ষ করা যায়। উক্ত সহানুভূতির মাধ্যমেই আমরা আত্মসুখ ও পরসুখের প্রেক্ষিতে এবং উপযোগিতার ভিত্তিতে কৃতকর্মের নৈতিক বিচারের প্রবৃত্ত হই। উদাহরণস্বরূপ হিউম ‘উপকার’ (benevolence)^{২২}-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এমন কোনো সমাজ নেই যেখানে উপকার করাকে ভালো চোখে দেখা হয় না। কারণ উপকার করার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে সামাজিক সুখের সঙ্গে সম্পর্কিত। কোনো ব্যক্তি যখন উপকার করাকে ভালো বলে মনে করে, তখন সে নিশ্চয়ই উপকারের সঙ্গে সামাজিক সুখকেও সম্পর্কযুক্ত করে থাকে। এক্ষেত্রে উপকার সুখ উৎপন্ন করতে পারবে, কারণ তার সামাজিক উপযোগিতা আছে। হিউমের মতে উপকারের এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব যার সঙ্গে মানুষের স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি পশুদের মধ্যেও এমন

^{২২} David Hume, *An Enquiry Concerning Principles of Morals*, 1983, pp. 16-20.

দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং যা পশুসুলভ তা মানুষের মধ্যে কখনোই দুর্লভ হতে পারে না। উপকার সুখ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বলে তা সামাজিক উপযোগিতার সঙ্গেও সম্পৃক্ত, এমন জোরালো দাবির ভিত্তি হল সকল মানুষের মধ্যে অবস্থিত সহানুভূতির বোধ, যা স্বাভাবিকভাবে পরসুখকেও আত্মসুখে পরিণত করে দেয়। ফলত সকল মানুষ আত্মসুখ উৎপাদনকারী কর্মকে যেমন ভালো বলে, তেমনি পরসুখ উৎপাদনকারী কর্মকেও ভালো বলতে পারে। হিউম এইভাবে আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদ-এর সমন্বয় সাধন করেছেন।

হিউম প্রতিটি কর্মের পিছনে অভিপ্রায় (motive) বা উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে কারণ ও কার্যের মতো অভিপ্রায় ও কর্মের মধ্যেও নিয়ত সংযোগ বর্তমান থাকে। এইরূপ সংযোগের জন্যই কোনো মানুষের অভিপ্রায় থেকে তার কৃতকর্মকে অনুমান করার প্রবণতা তৈরি হয়ে যায়। সুতরাং প্রতিটি কর্ম অভিপ্রায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক্ষেত্রে যদি এমন বলা হয় যে, কোনো কর্ম অভিপ্রায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাহলে এটাও মনে নিতে হবে যে, কর্মটি আকস্মিক। যদিও হিউম আকস্মিকতা স্বীকার করেন না, যেহেতু তিনি অভিপ্রায় ও কর্মের মধ্যে নিয়ত সংযোগের কথা স্বীকার করেন।

একই কারণে হিউম ইচ্ছার স্বাধীনতাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেননি। তিনি স্বাধীনতা বলতে বুঝতেন স্বতঃস্ফূর্ততাকে। তাঁর কাছে স্বাধীন কর্ম বা স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম হল তাই যা নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। এক্ষেত্রে যদি স্বাধীন বা স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম বলতে আকস্মিক কর্মকে স্বীকার করা হয়, তাহলে কোনো ব্যক্তিকেই তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী করা যাবে না। ফলত ওই কাজের কোনো নৈতিক বিচারও সম্ভবপর হবে না। এইজন্য হিউম মনে করেন যে, স্বাধীনতার ধারণাটিকে স্বতঃস্ফূর্ততা অর্থেই গ্রহণ করা উচিত, তাহলে সেই কর্মের জন্য কর্তাকে দায়ী করা যাবে, এবং ওই কর্মটিও নৈতিক বিচারের আওতাধীন হবে। তাঁর মতে যুক্তি কখনোই এইজাতীয় কর্মের অভিপ্রায় হতে পারে না, বা মানুষের ইচ্ছার নিয়ামক হতে পারে না। আবেগ বা অনুভূতি হল এইসবের মূল।

নৈতিকতা সম্পর্কিত হিউমের মত পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে, তিনি মানুষের নৈতিক জীবনে অনুভূতি বা আবেগ এবং উপযোগিতা এই দুটি বিষয়ের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে অনুভূত উপযোগিতাকেই তিনি ন্যায়নিষ্ঠতার (justice)^{২০} ভিত্তি হিসাবে মনে করেছেন। সামাজিক উপযোগিতা এবং সামাজিক শান্তি রক্ষার্থেই উক্ত ন্যায়নিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাঁর মতে সমাজে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। ফলে সকল মানুষ যথেষ্ট সম্পদ লাভ করতে পারবে না। অথচ মানুষের স্বার্থবুদ্ধি তাকে অন্যদের বঞ্চিত করে অতিরিক্ত সম্পদ লাভের ইচ্ছন যোগায়। এই পরিস্থিতিতে স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের স্বার্থবুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়ে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ন্যায়নিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়েছে। ন্যায়নিষ্ঠতার বোধ মানুষের স্বভাবজ নয়, তা কৃত্রিম। মানুষ এটি শিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জন করে থাকে। সমাজে শান্তিতে বসবাস করা এবং নিজ সম্পত্তি ভোগ করার উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে ন্যায়নিষ্ঠতার নিয়ম।

যুক্তিবিজ্ঞান

যুক্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় হিউম আরোহমূলক সমস্যার (problem of induction) প্রতি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর কাছে যুক্তিবিজ্ঞান হল ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান, তা কখনোই অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান নয়। যদিও আরোহমূলক অনুমান কখনোই যুক্তিনির্ভর হতে পারে তিনি মনে করতেন না। হিউমের মতানুসারে আরোহমূলক যুক্তির ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তা কখনোই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। আরোহ অনুমানের বৈশিষ্ট্য হল, সেখানে কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ভবিষ্যৎ সর্বদাই অতীত এবং বর্তমানের অনুরূপ হবে। যদিও হিউম মনে করেন, অভিজ্ঞতার দ্বারা কখনোই সাধারণীকরণ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমরা দাবি করতে পারি না যে, কোনো একটি ঘটনা অতীত ও বর্তমানে যেভাবে ঘটেছে ভবিষ্যতেও তা একইভাবে ঘটবে। কারণ যে বাস্তব তথ্যভিত্তির উপর নির্ভর করে আরোহমূলক যুক্তির মাধ্যমে সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তা

^{২০} Ibid, p. 23.

সর্বদাই অতীত ও বর্তমানকালীন হয়। তার দ্বারা কখনোই ভবিষ্যতের বস্তুস্থিতিকে যুক্তিযুক্ত করে তোলা যায় না। এই প্রসঙ্গে হিউমের দাবি হল, অতীত ও বর্তমানকালীন কোনো ঘটনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের বস্তুস্থিতি সম্পর্কে আমাদের যে বিশ্বাস গড়ে ওঠে, তা কোনো যুক্তির উপর নির্ভর করে না। সেটি নির্ভর করে মানবপ্রকৃতিতে নিহিত একপ্রকার নীতির উপর। সেগুলিকে তিনি প্রথা বা অভ্যাস নামে অভিহিত করেছেন। একই কারণে হিউম কার্য ও কারণ-এর মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক স্বীকার করেন না। তাঁর মতে কার্য-কারণ হল প্রকৃতপক্ষে দুটি ঘটনার মধ্যে সততসংযোগ। ফলত হিউমের দর্শনে সম্ভাব্যতা ও সংশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। হিউমের যুক্তিবিজ্ঞান হল একাধারে বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণাত্মক এবং আদর্শমূলক। কারণ এখানে যুক্তি কীভাবে চালিত হয়ে থাকে তার বর্ণনা দেওয়া হয়, যুক্তি কেনই বা এভাবে চালিত হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়, এবং যুক্তি কীভাবে চালিত হওয়া উচিত তা নির্দেশ করা হয়।

সম্ভাব্যতা হল অভিজ্ঞতাভিত্তিক আরোহ অনুমানের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। আমরা জানি আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্তের কোনো অনিবার্যতা বা নিশ্চয়তা থাকে না, সেটি সর্বদাই সম্ভাব্য। এইপ্রকার সম্ভাব্যতা বিষয়ক প্রশ্নাবলী বস্তুস্থিতি সংক্রান্ত বচন বা জ্ঞানকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে থাকে। হিউম কার্য-কারণ নিয়মে বিশ্বাস করেন, তাই তিনি আকস্মিক কোনো ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে আকস্মিকতার উদ্ভব কার্য-কারণ নিয়ম সম্পর্কিত অজ্ঞতা থেকে।

জগতে আকস্মিকতা বলে কিছু আছে এমনটা স্বীকার না করলেও, সম্ভাব্যতার ধারণাটি হিউমের দর্শনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই সম্ভাব্যতার উৎপত্তি আকস্মিক ঘটনার শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষতা থেকে। যে সমস্ত আকস্মিক ঘটনার উৎকর্ষতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় সেগুলির সম্ভাব্যতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু এর বিপরীত ঘটনাগুলির সম্ভাব্যতা হ্রাস পায়। হিউমের মতে আকস্মিকতার উৎকর্ষতা বা শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে সম্ভাব্যতার এক আনুপাতিক সম্বন্ধ বর্তমান। সেক্ষেত্রে যে ঘটনাগুলি ঘটায় সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, সেই ঘটনাগুলির প্রতি আমাদের বিশ্বাসের মাত্রা বা সম্মতির পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরপক্ষে যে ঘটনাগুলি ঘটায় সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম সেগুলির প্রতি

আমাদের বিশ্বাসও ক্রমশ হ্রাস পায়, ফলত সম্মতির পরিমাণও কমতে থাকে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে।

হিউমকে অনুসরণ করে একটি লুডোর ছক্কার দৃষ্টান্তের সাহায্যে সম্ভাব্যতার মাত্রাভেদের বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হল। আমরা জানি একটি লুডোর ছক্কার সাধারণত ছয়টি দিক থাকে। ধরা যাক, ছক্কাটির ওই ছয়টি দিকেই এক থেকে ছয় পর্যন্ত পৃথক ছয়টি সংখ্যা মুদ্রিত রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি ছক্কাটিকে চালা হয়, তাহলে যেকোনো একটি সংখ্যার দান পড়ার সম্ভাবনা সমান। এক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার কোনো মাত্রাভেদ থাকে না।

এখন ধরে নেওয়া যাক যে, কোনো একটি লুডোর ছক্কার ছয়টি দিকের মধ্যে চারটি দিকে এক সংখ্যাটি মুদ্রিত এবং অবশিষ্ট দুটি দিকে দুই সংখ্যাটি মুদ্রিত হয়ে আছে। এই অবস্থায় যদি ছক্কাটিকে চালা হয়, তাহলে এক সংখ্যাটির দান পড়ার সম্ভাবনা দুই সংখ্যাটির দান পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা বেশি হবে। কাজেই এক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার মাত্রাভেদ সুস্পষ্ট।

এবার ধরা যাক, একটি লুডোর ছক্কাতে মোট এক হাজার দিক রয়েছে। যেখানে নয়শো নিরানব্বইটি দিকে এক সংখ্যাটি মুদ্রিত রয়েছে, এবং অবশিষ্ট একটি দিকে দুই সংখ্যাটি মুদ্রিত। এমন অবস্থায় যদি লুডোর ছক্কাটিকে চালা হয়, তাহলে এক সংখ্যাটির দান পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা দুই সংখ্যাটির দান পড়ার সম্ভাবনা বেশি হবে। সুতরাং এক্ষেত্রেও সম্ভাব্যতার মাত্রাভেদ লক্ষ করা যায়।

হিউমের মতে কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা যত বৃদ্ধি পাবে, সেই ঘটনাটির প্রতি আমাদের বিশ্বাস বা প্রত্যাশা অধিক পরিমাণে অবিচল ও নিরাপদ হয়ে উঠবে^{২৪}। মানুষের মন বারংবার সেই ঘটনাটির দিকে চালিত হয়, যা ঘটার সম্ভাবনার উপর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভর করে থাকে, এবং কোনো একটি বিশেষ ঘটনাকে তার বিপরীত ঘটনার তুলনায় অধিক সম্ভাব্য হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বিশ্বাসের আবেগটিকে

^{২৪} David Hume, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, 1999, p. 48.

উৎপন্ন করে। আমরা জানি, হিউমের মতে নিছক কল্পনার সঙ্গে বিশ্বাসের পার্থক্য হল এই যে, বিশ্বাস কোনো বস্তু সম্পর্কে দৃঢ় ও শক্তিশালী ধারণা অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। এক্ষেত্রে কোনো ঘটনা ঘটার বেশ কিছু দৃষ্টান্তের উপস্থিতি তার ধারণাটিকে কল্পনায় তীব্রভাবে মুদ্রিত করে, এবং তুল্যমূল্য বিচারে সেটিকে উচ্চতর শক্তি ও সজীবতা প্রদান করে, আমাদের আবেগ ও অনুভূতির উপর এর প্রভাব বলবৎ করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কোনো ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস নিশ্চয়তা লাভ করে থাকে। সুতরাং সম্ভাব্যতা হল প্রকৃতপক্ষে কোনো ঘটনা সম্পর্কে আমাদের মনের বিশ্বাস বা বিশ্বাসজাত প্রত্যাশা, যা বস্তুস্থিতি বা বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সেই কারণেই সম্ভাব্যতার মাত্রাভেদ লক্ষ করা যায়।

হিউমের মতে আকস্মিক ঘটনাসমূহের মত কার্য-কারণ সম্বন্ধের সম্ভাব্যতাও অভিজ্ঞতাভিত্তিক আরোহ অনুমানের উপর নির্ভর করে থাকে। আকস্মিক ঘটনাসমূহের সম্ভাব্যতা বিষয়ে যেমন মাত্রাভেদ লক্ষ করা যায়, অনুরূপভাবে কার্য-কারণ নিয়মের সম্ভাব্যতাও নানা মাত্রাবিশিষ্ট হতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতায় এমন কতকগুলো কারণ-এর সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি কোনো এক বিশেষ কার্য উৎপাদনের ব্যাপারে সর্বদাই অভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়। এযাবৎ এই কারণগুলি থেকে বিশেষ কার্য উৎপাদনের ব্যাপারে কোনোপ্রকার ব্যর্থতা বা অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হয়নি। যেমন আগুন সর্বদাই দহন করে থাকে এবং জলে ডুবলে যেকোনো ব্যক্তির শ্বাসরুদ্ধ হয়। একইভাবে মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম আজও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় না। এইজাতীয় ক্ষেত্রগুলিতে সম্ভাব্যতা বিচারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

উপরোক্ত কার্য-কারণমূলক উদাহরণের পাশাপাশি এমন অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায় যেখানে কারণ যথেষ্ট পরিমাণে অনিয়মিত বা পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত। যেমন আফিম খেলে নিদ্রা উৎপন্ন হয় এমনটা অনেকের ক্ষেত্রে ঘটে, আবার এর ব্যতিক্রম ঘটনাও লক্ষ করা যায়। সুতরাং আফিম খেলে নিদ্রা উৎপন্ন হবেই এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এক্ষেত্রে কোনো কারণ যদি তার স্বাভাবিক কার্য উৎপাদনে ব্যর্থ হয়, তাহলে দার্শনিকগণ এর পিছনে প্রকৃতির কোনো অনিয়মকে দায়ী করেন না।

তাঁরা ধরে নেন যে, কোনো গোপন কারণের উপস্থিতি ওই বিশেষ কারণটি থেকে বিশেষ কার্য উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করছে। হিউমের মতে যখন আমরা কোনো বিশেষ কারণ থেকে কোনো বিশেষ কার্যকে অপরিবর্তনীয় বা ব্যতিক্রমহীনভাবে উৎপন্ন হতে দেখি, তখন আমরা ওই বিশেষ কার্য-কারণ সম্বন্ধকে সুনিশ্চিত হিসাবে ধরে নিই। অর্থাৎ যেকোনো অনুমানের ক্ষেত্রে অতীত যেখানে সম্পূর্ণভাবে নিয়মিত, সেক্ষেত্রে আমরা অভ্যাস বা প্রথাবশত ওই অতীত থেকে ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিতভাবে প্রত্যাশা করি, বিপরীত কোনো অনুমানের অবকাশ নেই বলেই মনে করি।

অপরদিকে যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোনো একটি কারণ থেকে ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি লক্ষ করা যায়, অর্থাৎ কোনো কারণ যখন কোনো বিশেষ কার্যের প্রতি নিয়মিত না হয়ে অনিয়মিতভাবে নানা কার্য উৎপন্ন করে, তখন কার্য-কারণ নিয়মের সম্ভাব্যতা বিচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমত পরিস্থিতিতে অতীত যেহেতু অনিয়মিত, তাই এইরূপ অতীত থেকে অভ্যাস বা প্রথাবশত ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করতে গেলে, একই কারণ জন্য ভিন্ন ভিন্ন কার্য উৎপত্তির ঘটনা আমাদের মনে ভাসমান হয়, এবং সেটি আমাদের বিবেচনার বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে তুল্যমূল্য বিচার করে আমরা যে ঘটনা বা কার্যটিকে সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক বলে মনে করি, সেটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি, এবং বিশ্বাস করি যে, উক্ত কার্যটি অস্তিত্বশীল হবে। যদিও এমন নয় যে, অন্যান্য কার্যগুলি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষণীয়। সম্ভাব্যতার নিরিখে ঘটনা ঘটান আনুপাতিক হার বিচার করলে কোনো কারণ-এর প্রতিটি কার্যেরই গুরুত্ব বা কর্তৃত্ব থাকবে। অর্থাৎ কোনো কার্য ঘটান সম্ভাব্যতার হার বেশি, কোনোটির হয়তো বা কম। যেমন জানুয়ারি মাসে ইউরোপীয় দেশগুলিতে সারাবছর ধরে যে আবহাওয়া থাকে তার তুলনায় তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যদিও অন্যান্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুর কারণে এই সম্ভাব্যতার তারতম্য ঘটতে পারে। সুতরাং দেখা গেল যে, আমরা যখন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য অতীতের প্রত্যক্ষিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে অভ্যাস বা প্রথাবশত ভবিষ্যতেও অনুরূপ ঘটনার প্রত্যাশা করি, তখন সেই প্রত্যাশা সম্ভাব্যতার আনুপাতিক তারতম্য অনুসারেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হিউমের মতানুসারে সম্ভাব্যতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, একটি হল আকস্মিকতার সম্ভাব্যতা (probability of chance), অপরটি হল কার্য-কারণ সম্বন্ধের সম্ভাব্যতা (probability of cause)^{২৫}। আকস্মিক সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে কোনো ঘটনা বা কার্যের কারণটি অজ্ঞাত, অন্যদিকে কার্য-কারণ সম্বন্ধের সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে কোনো ঘটনা বা কার্যের কারণটি জ্ঞাত, কিন্তু ঘটনা বা কার্যটি ঘটার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসের প্রকৃতিটি কীরূপ সেটাই বিচার্য বিষয়। অভিজ্ঞতাভিত্তিক হওয়ার দরুন কার্য-কারণ সম্বন্ধ সর্বদাই সম্ভাব্য কখনোই অনিবার্য নয়। একই যুক্তিতে বস্তুস্থিতি বা বাস্তব তথ্য বিষয়ক জ্ঞানও সম্ভাব্য, যেহেতু তা কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

হিউম মনে করেন, যে সমস্ত আধিবিদ্যক ধারণা সর্বাপেক্ষা নিগূঢ় এবং অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট, তার মধ্যে ক্ষমতা, শক্তি, তেজ ও অনিবার্য সম্বন্ধ অন্যতম। এই ধারণাগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে গেলে প্রথমেই অনুসন্ধান করতে হবে যে, এগুলি কোন্ মুদ্রণের প্রতিক্রম। যদি এই ধারণাগুলির ভিত্তিতে কোনো মুদ্রণের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহলে এগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। হিউমের মতে শত চেষ্টাতেও আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতে এমন কোনও দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যাবে না, যার দ্বারা আমরা শক্তি বা অনিবার্য সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ করতে পারবো। তিনি মনে করেন এই শক্তি বা অনিবার্য সম্বন্ধের ধারণাটাই হল কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এর বিশ্লেষণে আমাদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত তথাকথিত অনিবার্যতার ধারণা প্রসঙ্গে হিউমের বক্তব্য হল এই ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করতে গেলে, যে মুদ্রণের উপস্থিতি অপরিহার্য, তা আমরা সম্ভাব্য তিনটি ক্ষেত্রে^{২৬} অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।

প্রথমত, বাহ্যজগৎ-এর কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্যে : আমরা যখন বাহ্যজগতের বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, তখন কোনো একটি দৃষ্টান্তেও কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত

^{২৫} “The case is the same with the probability of causes, as with that of chance,” Ibid, p. 49.

^{২৬} Ibid, pp. 53-7.

শক্তি বা অনিবার্যতার মুদ্রণ আমাদের হয় না। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা হল একটি ঘটনা অপর একটি ঘটনার অনুগামী। অর্থাৎ কারণ আগে ঘটে এবং কার্যটি পরে ঘটে। এর অতিরিক্ত কোনো শক্তি বা অনিবার্য সম্বন্ধের মুদ্রণ পাওয়া যায় না। যেমন একটি বিলিয়ার্ড বল যখন অপর একটি বিলিয়ার্ড বলকে আঘাত করে, তখন আমরা দেখি যে, প্রথম বলের আঘাতে দ্বিতীয় বলটি গতিশীল হল, যদিও এর মধ্যে কোনো শক্তি বা অনিবার্যতার ইঙ্গিত থাকে না।

আমরা যখন কোনো বস্তুকে প্রথম প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই বস্তুটি কী কার্য উৎপন্ন করতে পারবে সেই সম্পর্কে কোনো অনুমান করতে পারি না। সেক্ষেত্রে যদি কেবল মনের দ্বারাই কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত শক্তি বা অনিবার্যতার আবিষ্কার সম্ভব হত, তাহলে অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র চিন্তা বা বুদ্ধিপ্রয়োগ করেই বলা যেত যে, প্রথম দৃষ্ট কারণটি কোন্ কার্য উৎপন্ন করবে।

দ্বিতীয়ত, আন্তরজগৎ-এর কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্যে : বাহ্যজগতে যেমন কার্য-কারণ সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত শক্তি বা অনিবার্যতার কোনো মুদ্রণ হয় না, একইভাবে মনোজগতেও আন্তর প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অনুরূপ কোনো শক্তি বা অনিবার্যতার মুদ্রণ পাওয়া যায় না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিউম তিনটি যুক্তি প্রদান করেছেন।

১) হিউম মনে করেন, মন কীভাবে দেহকে চালিত করে, অর্থাৎ মানসিক ইচ্ছার প্রভাবে কীভাবে দৈহিক অঙ্গসঞ্চালন সম্ভব হয়, তা অত্যন্ত রহস্যজনক একটি বিষয়। এক্ষেত্রে যদি আমরা ইচ্ছার মধ্যে কোনো শক্তি প্রত্যক্ষ করতে পারতাম, তাহলে সেই শক্তি কীভাবে অঙ্গসঞ্চালনের কারণ হয় তার মুদ্রণও লাভ করতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে এমন কোনো শক্তির অনুভব আমাদের হয় না।

২) আমাদের ইচ্ছা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর সমানভাবে ক্রিয়াশীল নয়। যেমন জিহ্বা বা অঙ্গুলি আমাদের ইচ্ছাধীন, কিন্তু হৃদপিণ্ড বা যকৃতের উপর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ কয়েম করা যায় না। যদি ইচ্ছার মধ্যে কোনো শক্তি থাকতো, তাহলে আমরা অভিজ্ঞতা

নিরপেক্ষভাবে শুধুমাত্র সেই শক্তি বা অনিবার্যতার চেতনার ভিত্তিতে বলতে পারতাম কোনো অপের উপর ইচ্ছার প্রভাব কেন বলবৎ হয়, অথবা কেনই বা হয় না।

৩) শরীরবিদ্যা থেকে জানা যায় যে, মনোজাগতিক ইচ্ছা ও অঙ্গসঞ্চালনের মধ্যে কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, এর মধ্যবর্তী পর্যায়ে থাকে পেশী, স্নায়ু ইত্যাদির অনেক সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম ক্রিয়াকলাপ। বাস্তবে এইজাতীয় কোনো ক্রিয়ার উপস্থিতির চেতনা আমাদের থাকে না। সুতরাং মনের ইচ্ছার সঙ্গে এইসব অতিসূক্ষ্ম শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সম্বন্ধকে অনিবার্য বলা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, মনোজগৎ-এ সৃষ্ট কল্পনার মধ্যে : দৈহিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে যেমন কোনো শক্তি বা অনিবার্যতার মুদ্রণ হয় না, তেমনই শুধুমাত্র মন থেকে উদ্ভূত কল্পনার ক্ষেত্রেও অনুরূপ কোনো চেতনা আমরা লাভ করি না। এই প্রসঙ্গে হিউমকে অনুসরণ করে তিনটি যুক্তি প্রদান করা যেতে পারে।

১) হিউমের মতে কারণ এবং কারণের শক্তি প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। এক্ষেত্রে কারণ-এর মধ্যে নিহিত শক্তিকে জানতে পারলে ওই কারণের কার্য ও তাদের মধ্যকার সম্বন্ধকেও জানা সম্ভব হবে। যদিও কেবল মনের ইচ্ছার দ্বারা যখন কোনো সৃজনশীল ধারণা গঠিত হয়, তখন সেই ধারণার পশ্চাতে কোনো মুদ্রণের চেতনাই থাকে না। সুতরাং মনের ইচ্ছার মধ্যেও কোনো শক্তি বা অনিবার্যতার উপস্থিতি থাকতে পারে না।

২) মনের নিজের ক্ষেত্রেও তার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ সীমিত। মন ইচ্ছামতো কোনো ধারণা সৃষ্টি করতে পারে না, অথবা কোনো ধারণা মন থেকে মুছে ফেলতেও পারে না। আবার আবেগ বা অনুভূতির ওপর মনের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ খুবই দুর্বল। কেন এমনটা ঘটে তা বুদ্ধির দ্বারা জানা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জানা যায় যে, কোনো মানসিক উপকরণ কেন ইচ্ছাধীন অথবা কেন ইচ্ছাধীন নয়। এক্ষেত্রে মনের ইচ্ছার মধ্যে কোনো শক্তি বা অনিবার্যতার চেতনা আমাদের হয় না।

৩) ক্ষেত্রবিশেষে মনের ইচ্ছার সামর্থ্যের পরিবর্তন লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, ইচ্ছার স্ব-নিয়ন্ত্রণ (self-command) সর্বদা সমান হয় না। উদাহরণস্বরূপ হিউম বলেন, সকালে নিজেদের চিন্তার উপর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ যে পরিমাণে থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সেই পরিমাণে থাকে না। কেন এমনটা ঘটে তা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জানা যায়, বুদ্ধির মাধ্যমে নয়। সুতরাং মন বা মনের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোনো শক্তি বা অনিবার্য সম্বন্ধের চেতনা না থাকার ফলে তার ধারণাটি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

সবশেষে বলা যেতে পারে যে, বাহ্যজগৎ হোক বা মনোজগৎ, বুদ্ধি হোক বা অভিজ্ঞতা কোনো ক্ষেত্রেই কার্য-কারণের অনিবার্য সম্বন্ধ স্বীকার করা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হল কার্য-কারণের অনিবার্য সম্বন্ধ যদি সিদ্ধ না হয়, তাহলে কার্য-কারণ সম্বন্ধের স্বরূপটি কী? এই প্রশ্নে হিউমের বক্তব্য হল, অভিজ্ঞতায় আমরা যা পাই তা হল একটি ঘটনা বা বস্তু অপর একটি ঘটনা বা বস্তুকে অনুগমন করে। এর অতিরিক্ত কোনো বন্ধন লক্ষ করা যায় না। উক্ত ঘটনাদ্বয়কে সর্বদা সংযুক্ত (conjoined) বলেই মনে হয় কখনোই সম্বন্ধযুক্ত (connected) বলে মনে হয় না^{২৭}। আমরা যখন সকল সদৃশ বস্তুকে অপর সদৃশ বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেখি, তখন একটি ঘটনার আবির্ভাবের পর অপরটিরও আবির্ভাব ঘটবে এমন ভবিষ্যৎবাণী করতে দ্বিধাবোধ করি না। সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম ঘটনাটিকে কারণ এবং দ্বিতীয় ঘটনাটিকে কার্য বলে থাকি। আমরা ওই ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে বলে মনে করে নিই এবং অনুমান করি যে, একটি ঘটনার মধ্যে এমন কোনো ক্ষমতা বা শক্তি আছে যা অভ্রান্তভাবে অপরটিকে উৎপন্ন করতে সক্ষম। ফলত দুটি ঘটনার মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধের ধারণাটি একাধিক সদৃশ দৃষ্টান্তের ঘটনাগুলির সততসংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। সদৃশ ঘটনার পুনরাবৃত্তির ফলে আমাদের মন অভ্যাসবশত একটি ঘটনা (কারণ) প্রত্যক্ষ করলে তার অনুগামী অপর ঘটনাটিকেও (কার্য) প্রত্যাশা করে এবং বিশ্বাস করে যে, এই সম্বন্ধটি অস্তিত্বশীল হবে। হিউমের মতে অভ্যাস বা প্রথাবশতই আমাদের কল্পনা

^{২৭} “One event follows another, but we never can observe any tie between them. They seem conjoined but never connected”, Ibid, p. 61-2.

এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, এবং বিশ্বাস করে যে, সেগুলির মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ আছে।

হিউমের মতে মানুষের কল্পনা দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করে যায় বলেই সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি সার্বিক সংশয়বাদকে সমর্থন করেন নি, এমনকি ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কেও সংশয় পোষণ করার কথা বলেন না। একমাত্র বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞান সম্পর্কে তিনি পরিমিত সংশয়বাদী অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন।

হিউম তাঁর দার্শনিক তত্ত্বে জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় বাস্তব অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান-এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এইজাতীয় জ্ঞান ব্যক্ত হয় অভিজ্ঞতাভিত্তিক কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে কার্য-কারণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা অনিবার্য নয়, মানুষের অভ্যাসজাত প্রত্যাশা থেকেই এর উৎপত্তি। অভিজ্ঞতা নির্ভর হওয়ার জন্য উক্তপ্রকার কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাস্তব অস্তিত্ব বিষয়ক সকল জ্ঞান সম্ভাব্য, তা কখনোই নিশ্চিত নয়। ইন্দ্রিয়াতীত কোনো বিষয়ের জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা তিনি স্বীকার করেন না। তাই আধিবিদ্যক প্রেক্ষাপটে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টাকে তিনি অর্থহীন বলে মনে করেন। যদিও অধিবিদ্যক চর্চাকে অর্থহীন বলেন না। নৈতিকতা প্রসঙ্গে তিনি মানুষের আবেগ-অনুভূতির ওপর আস্থা রাখার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে যুক্তিকে আবেগ চালিত দাসরূপে গণ্য করে থাকেন। যুক্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি আরোহ অনুমানের মাধ্যমে সার্বিক সিদ্ধান্ত লাভের প্রক্রিয়াটিকে সমস্যাपूर्ण বলে মনে করেছেন। কারণ আরোহ অনুমান কার্য-কারণ নির্ভর হওয়ার জন্য এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সর্বদাই সম্ভাব্য হবে, কখনোই নিশ্চিত নয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হিউমের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হয় মানব প্রকৃতির জ্ঞান সামর্থ্যের সীমানা নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে, যার অন্তিম পরিণতি হল সংশয়বাদ।

তৃতীয় অধ্যায়

উদারপন্থী নারীবাদ ও নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্ব

নারীবাদের অন্যতম পথ প্রদর্শক মেরী ওলস্টনক্র্যাফ্ট' (Mary Wollstonecraft, 1759-1797)-এর সময় থেকেই নারীবাদী একপ্রকার বিশেষ চিন্তাধারা 'উদারপন্থী নারীবাদ' (Liberal Feminism) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণত মনে করা হয় যে, নারীবাদের এই বিশেষ ধারা মূলস্রোতের 'উদারনীতিবাদ' (Liberalism)-এর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। কোয়াইন (W.V.O. Quine), মিল (John Stuart Mill), লক (John Locke), হবস (Thomas Hobbes) প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দ ছিলেন মূলস্রোতের উদারনীতিবাদ-এর অন্যতম প্রবক্তা। এই মতবাদের মূল বক্তব্য ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে^১ স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে খর্ব করা, যা কিনা তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের আবহে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। উদারপন্থী নারীবাদের ভিত্তিতেও এই সমস্ত দার্শনিকদের বিভিন্ন মতাদর্শের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো নারীবাদী তাত্ত্বিক সেকথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকারও করে থাকেন। যদিও মূলস্রোতের 'উদারনীতিবাদ' এবং 'উদারপন্থী নারীবাদ'-এর লক্ষ্য ও উপায় অত্যন্ত ভিন্ন প্রকৃতির। এইস্থলে উদারপন্থী নারীবাদ-এর আলোচনাটাই একমাত্র বিবেচ্য, মূলস্রোতের উদারনীতিবাদ আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা জানি যেকোনো নারীবাদী অবস্থানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নারী-পুরুষের লিঙ্গ পার্থক্যকে কেন্দ্র করে যে লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টি হয়, তা দূর করে কীভাবে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে তার পথনির্দেশ করা। উদারপন্থী নারীবাদীরা এক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে চান তা বোঝার জন্য তাঁদের আধিবিদ্যক মতাদর্শ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

^১ Liberal Feminism/wikipedia/en.m.wikipedia.org/31.12.20.

^২ Liberal Feminism/standford encyclopedia of philosoply/plato.stanford.edu/31.12.20.

অধিবিদ্যা :

আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে উদারপন্থী নারীবাদীরা সমাজে বসবাসকারী মানুষের তিনটি পরিচয় স্বীকার করেন। প্রথমটি হল তার যৌন পরিচয় যা শারীরিকভাবে নির্ধারিত, দ্বিতীয়টি হল লিঙ্গ পরিচয় যা সামাজিকভাবে আরোপিত, এবং তৃতীয় পরিচয়টি হল সে মানুষ, এটি হল উক্ত দুই পরিচয়ের অতিরিক্ত এক রূপ, যার মূল চালিকা শক্তি হল যুক্তি (reason)। এই নারীবাদীরা মনে করেন সমাজ আরোপিত লিঙ্গ পরিচয় থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি মানুষের কোনো না কোনো লিঙ্গ পরিচয় অবশ্যই থাকে। কোনো মানুষই লিঙ্গ পরিচয়কে ত্যাগ করতে পারে না, যদিও লিঙ্গ ধর্মের উত্তরণ সম্ভব। সেই কারণে তাঁরা অনপেক্ষ মানবধর্ম স্বীকার করেন, যা নারী ও পুরুষের লিঙ্গ ধর্মের এক অতিক্রান্ত রূপ।

উদারপন্থী নারীবাদীরা একথা মানেন না যে, নারী-পুরুষের লিঙ্গ পরিচয় তাদের যৌন পরিচয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাঁদের মতে কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারী বা পুরুষের পক্ষে কী ভূমিকা পালনীয় তা একরকমের সামাজিক প্রত্যাশা। সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের লিঙ্গ পরিচয় বস্তুতপক্ষে উক্ত সামাজিক প্রত্যাশা অতিরিক্ত আর কিছুই নয়।^৩ সুতরাং যৌন পরিচয়কে জৈবিকভাবে প্রদত্ত বলা গেলেও, লিঙ্গ পরিচয় আবশ্যিকভাবে সমাজ আরোপিত। ফলে সামাজিক কারণে নারী ও পুরুষের বিশেষ বিশেষ লিঙ্গ ভূমিকার ভেদ থাকতেই পারে, আবার প্রয়োজন বিশেষে তার পরিবর্তনও সম্ভব।

উদারপন্থী নারীবাদীরা মানুষকে যৌক্তিক জীব হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করতে চান। এমনকি সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারী ও পুরুষের লিঙ্গ ধর্মগুলি যুক্তির ভিত্তিতেই নির্ধারিত হওয়া উচিত বলেই তাঁরা মনে করেন। যুক্তিকে সর্বদাই অনপেক্ষ, মানবধর্ম হিসাবে দেখতে চান। তাই উদারপন্থী নারীবাদীরা যুক্তির কোনো লিঙ্গ পরিচয় থাকতে পারে বলে মনে করেন না। এই মতে কোনো মানুষ যখন যুক্তি প্রয়োগ করে

^৩ Feminist Metaphysics, Ibid, 11.08.2017.

তখন সে তার সাপেক্ষ লিঙ্গ পরিচয়কে অতিক্রম করে যায়। তাই নারী ও পুরুষ অতিরিক্ত যে মানুষ, তার নেই কোনো সাপেক্ষ লিঙ্গ ধর্ম, আছে কেবল অনপেক্ষ মানব ধর্ম। সেই মানবধর্ম অনুসারে মানুষ হল যৌক্তিক জীব। এই অনপেক্ষ পরিচয় অতিরিক্ত অন্য কোনো সাপেক্ষ পরিচয় যেন তত্ত্বের প্রেক্ষিতে স্থান না পায়, বা সেই সাপেক্ষ পরিচয় যেন গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে না পারে, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যিক।

পূর্বোক্ত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, উদারপন্থী নারীবাদীরা এমন তত্ত্ব নির্মাণে আগ্রহী যার ভিত্তিতে থাকবে বিশুদ্ধ যুক্তি। প্রতিটি তত্ত্ব যদি যুক্তির দ্বারা নির্মিত হয় তাহলে তত্ত্বের অনুষণে কখনোই লিঙ্গ পক্ষপাত, লিঙ্গ রাজনীতি বা লিঙ্গ বৈষম্য যুক্ত থাকতে পারবে না। প্রশ্ন হল, যাপনের প্রেক্ষাপটে যে লিঙ্গ বৈষম্যের অস্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তার উৎস কী? এর উত্তরে তাঁরা তত্ত্বের অপপ্রয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। তাঁদের মতে তত্ত্বমাত্রই সর্বপ্রকার ইতিহাস অনপেক্ষ। তা সত্ত্বেও সামাজিক পরিমণ্ডলে যদি কোনো ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য লক্ষ করা যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, হয় বিশুদ্ধ যুক্তি তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে, অথবা তত্ত্বটির ভ্রান্তপ্রয়োগ ঘটেছে। সেক্ষেত্রে তত্ত্বটির নিজস্ব কোনো সাপেক্ষ অবস্থান বা কোনো পক্ষপাত কখনোই থাকতে পারে না, থাকাটাও কাম্য নয়। তাত্ত্বিক স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য না থাকা সত্ত্বেও প্রায়োগিক স্তরে সেই বৈষম্য কীভাবে বলবৎ হয় তার কারণ স্বরূপ এই নারীবাদীরা বিশেষ লিঙ্গ ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্ষমতার কর্তৃত্বকে চিহ্নিত করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন ক্ষমতার রাজনীতির কারণেই বিশেষ বর্গের মানুষ কর্তৃক তত্ত্বের অপপ্রয়োগ ঘটে, এবং অপরাপর বর্গের মানুষজন বৈষম্যের শিকার হন।

উদারপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন মূলস্রোতের ধ্রুপদী দর্শনের প্রচলিত তত্ত্ব কাঠামোতে লিঙ্গ পার্থক্য এবং তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যাটি এ যাবৎ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত না হওয়াটা এক ধরনের ত্রুটি বা দোষ। এইজাতীয় দোষকে তাঁরা ‘অনবধান দোষ’ (Error of Omission) হিসাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। উক্ত মতানুসারে কোনো তত্ত্ব কখনোই সক্রিয়ভাবে লিঙ্গ রাজনীতি অথবা ক্ষমতার রাজনীতির

পৃষ্ঠপোষক হতে পারে না। তাঁদের বক্তব্য হল তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে সচেতনভাবে কোনো লিঙ্গ রাজনীতি প্রশ্রয় পায় না, পাওয়া উচিতও নয়। যদিও তত্ত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে পারে, কিন্তু তা ইচ্ছাকৃত নয়। অনেকসময় লিঙ্গ সংবেদী সমস্যাগুলি বিভিন্ন তত্ত্বের পরিসর থেকে বাদ পড়ে যায়, বা সেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তেমন গুরুত্ব পায় না। এইজাতীয় ত্রুটিগুলিকে তাঁরা তত্ত্বের অনবধান দোষ হিসাবে দেখতে চান, এবং তত্ত্বকে দোষমুক্ত করা তথা লিঙ্গ সমস্যা দূরীকরণের পন্থা হিসাবে ‘অন্তর্ভুক্তি’(Inclusion)-এর প্রকল্পটিকে নির্বাচন করেন। উদারপন্থী নারীবাদীরা এক্ষেত্রে তিন ধরনের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে থাকেন। প্রথমত, প্রতিষ্ঠিত চিন্তাতন্ত্রে নারীর অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্তি। দ্বিতীয়ত, সবরকম সামাজিক চর্যা বা অনুশীলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অন্তর্ভুক্তি। তৃতীয়ত, আইনের অঙ্গনে একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্তি।^৪

প্রথম ধরনের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য হল, নারীর যাপনের প্রেক্ষাপটে বিধৃত যে সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বিচার কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে নি, সেগুলির তাত্ত্বিক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প গ্রহণ করা যেতেই পারে। এক্ষেত্রে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোনো তত্ত্ব-কাঠামোর নিরিখেই নারীর যাপনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত যেকোনো সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তার জন্য সেই বিশেষ তত্ত্ব-কাঠামোর পরিবর্তন অপরিহার্য নয়। ধ্রুপদী যেকোনো তত্ত্ব-কাঠামোর মধ্য দিয়েই নারীর লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ‘ক্রমহত্যা’ বা কর্মক্ষেত্রে ‘মাতৃত্বকালীন’ ছুটির কথা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক, যা কিনা অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পের সাফল্যের নিদর্শন। সুতরাং নারীর যাপনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা উক্ত সমস্যাগুলিকে মূলস্রোতের ধ্রুপদী কোনো তত্ত্বের আওতায় বিচারপূর্বক সমাধানের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাই উদারপন্থী নারীবাদীরা লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য প্রচলিত তত্ত্বের পরিসর বৃদ্ধি করে, তার পুনর্নির্মাণে আগ্রহী, আমূল সংস্কার করাটা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়।

^৪ শেফালি মৈত্র, *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪৬।

দ্বিতীয় ধরনের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারীরও অধিকার প্রাপ্তির দাবি জানানো হয়। উদারপন্থী নারীবাদীরা চান পুরুষের মতো নারীও যেন মূল সামাজিক চর্যার পরিসরে যুক্ত হতে পারে। শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করাই হল এই ধরনের অন্তর্ভুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত, উদারপন্থী নারীবাদীদের একটি কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যেতেই পারে। ১৯৬৬ সালে আমেরিকার উদারপন্থী নারীবাদীরা এই ধরনের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন তৈরী করে সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির নিকট আট দফা দাবি তুলে ধরেন। ওই নারীবাদী সংগঠনটি NOW (National Organization for Women) নামে খ্যাত। NOW এর দাবিগুলি ছিল -

১. সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নারীকে সমানাধিকার প্রদান করা।
২. কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে নারী-পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্য আইন প্রণয়নের দ্বারা নিষিদ্ধ করা।
৩. কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য 'মাতৃত্বকালীন ছুটি' ও সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা প্রদান করা।
৪. কর্মরত অভিভাবকদের নির্ভরশীল শিশু ও পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আয়কর ছাড়ের ব্যবস্থা করা।
৫. শিশুদের দেখাশোনার জন্য কেন্দ্র নির্মাণ করা।
৬. একই প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সহশিক্ষা লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
৭. কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান প্রশিক্ষণ পাওয়ার অধিকার এবং দরিদ্র নারীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা।
৮. নারীর প্রজনন ক্ষমতার স্ব-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

NOW-এর উদারপন্থী নারীবাদীরা মনে করতেন যে, আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে উক্ত দাবিগুলিকে আদায় করে, নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদেরকে মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। এর জন্য তাঁরা সমাজের প্রচলিত ছাঁচ বা

পরিকাঠামোটিকে পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন না। তাঁরা চান যেকোনো সামাজিক পরিকাঠামোতেই নারীর স্থান সুনিশ্চিত হোক।

তৃতীয় ধরনের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে উদারপন্থী নারীবাদীরা আইনের পরিসরে^৬ নারীর একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলির প্রতিফলন কীভাবে সম্ভব হতে পারে তার উপায় নির্ধারণ করতে চান। সাধারণত মনে করা হয় যা কিছু একান্ত ব্যক্তিগত, তা অবশ্যই অত্যন্ত গোপনীয় হওয়া উচিত। এহেন ব্যক্তিগত বিষয়কে আইনের দরবারে হাজির করার অর্থ হল তাকে যুক্তিনিষ্ঠ নিয়ম-নীতির আওতাভুক্ত করে বিচার করা। আমরা জানি যুক্তি কখনোই কারোর ব্যক্তিগত বা গোপনীয় কোনো বিষয় নয়, তা সর্বদাই সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়। সুতরাং ব্যক্তিগত কোনো বিষয়কে নৈর্ব্যক্তিক যুক্তির মাধ্যমে বিচার করার অর্থ হল গোপনীয়তা ভঙ্গ হওয়া। সেক্ষেত্রে উদারপন্থী নারীবাদীদের বক্তব্য হল - একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিকে বৃহত্তর আইনী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে বিচার করা হলে তা গোপনীয়তা হারিয়ে ফেললেও, সুবিচার পাওয়ার মাধ্যমে নারীর অধিকতর লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, যুক্তি ও বিচার যতবেশী প্রসারতা লাভ করবে, ততই নারীর লিঙ্গভিত্তিক অবদমন হ্রাস পাবে, এবং সেইসঙ্গে তার লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধানও সম্ভব হবে।

উদারপন্থী নারীবাদে অন্দরমহল ও বহির্বিশ্বের ভেদ স্বীকৃত, কিন্তু যখন তাঁরা ‘যা ব্যক্তিক তা রাজনৈতিক’^৭ (the personal is political)-এই স্লোগান সমর্থন করেন, তখন তাঁরা ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিকে আইনের পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিকেই নির্দেশ করে থাকেন। এইস্থলে দৈনন্দিন জীবনচর্যার কয়েকটি উদাহরণ থেকে নারীবাদীদের অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করা যেতে পারে। যেমন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, নারী স্ব-গৃহে যে শ্রমদান করে, তার নেই কোনো সামাজিক স্বীকৃতি, না আছে কোনো অর্থনৈতিক মূল্যায়ন। সন্তান লালন-পালন, অন্যান্য পরিবার-পরিজনের সেবাযত্ন, রোজকার ঘরকন্নার কাজ ইত্যাদি হল নারীর অস্বীকৃত এবং অবমূল্যায়িত শ্রমের

^৬ Liberal Feminism/wikipedia/Ibid, 22.12.22.

^৭ Carol Hanisch, “The Personal is Political”, 1970, Carolhanisch.org.Retrieved, 02.11.2019.

তালিকা। অথচ এই একই কাজ যখন বৃহত্তর সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, বিশেষত সেই কাজ যদি কোনো পুরুষ কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাহলে তা ‘শ্রম’ তথা পেশা বা জীবিকার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কাজের পরিমাণ, ছুটির অধিকার ইত্যাদি আরও নানান হিসাব-নিকেশ ওই ‘শ্রম’-এর অনুষঙ্গে যুক্ত হয়। যদিও গৃহস্থালীতে নারীর অক্লান্ত ‘পরিশ্রম’ কখনোই ‘শ্রম’ হিসাবে বিবেচিত হয় না। এইপ্রকার লিঙ্গ বৈষম্য ও লিঙ্গ রাজনীতির সমস্যার সমাধান আইনের মাধ্যমেই সম্ভব হবে বলে উদারপন্থী নারীবাদীদের অভিমত। একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পের মাধ্যমে আইনের দৃষ্টিতে বিচার্য বিষয় হিসাবে তুলে ধরার, এবং সুবিচার লাভ করার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে ‘বৈবাহিক ধর্ষণ’-কে ‘অপরাধ’ রূপে গণ্য করার কথা বলা যেতে পারে। একদা বৈবাহিক ধর্ষণ-কে, ধর্ষণের পর্যায়ভুক্ত করে আলোচনা করার কথা ভাবাই যেত না, অথবা বৈবাহিক ধর্ষণ-কে ধর্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করাটা ছিল যেন অলীক কল্পনা। ফলত তার আইনী বিচারের প্রশ্নই উঠতো না, সেটা আইন বর্হিভূত বিষয় হিসাবেই পরিগণিত হত। মনে করা হত স্ত্রীর প্রতি ওইরূপ আচরণ করাটা বিবাহিত পুরুষের একটা স্বাভাবিক অধিকার, এবং ঘটনাটা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য যাপনের ব্যক্তিগত, গোপনীয় একটি অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। বর্তমানে অন্তর্ভুক্তির সুফল স্বরূপ ‘বৈবাহিক ধর্ষণ’-কে আইনের দৃষ্টিতে বিচার্য একটি বিষয় এবং ‘অপরাধ’ হিসাবে গণ্য করা হয়।

উদারপন্থী নারীবাদীদের মতানুসারে অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে তথ্যকেন্দ্রিক। অবহেলিত তথ্যগুলিকে প্রচলিত তত্ত্ব-কাঠামোর পরিসর প্রসারিত করে, তাতে প্রতিস্থাপিত করাই হল এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। তথ্যভূমি এবং তত্ত্ব-কাঠামোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারায় সুস্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাঁরা তাত্ত্বিক স্তরে কোনোপ্রকার লিঙ্গ রাজনীতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। কারণ তত্ত্ব সর্বদাই মানুষের যৌক্তিক বৃত্তির দ্বারা নির্মিত, ফলে সেটি কোনোভাবেই দেশস্থিত বা কালস্থিত কোনো সাপেক্ষ ধর্মের ধারক বা বাহক হতে পারে না। সুতরাং লিঙ্গ প্রেক্ষিত সাপেক্ষে বিচার করে কোন্ তত্ত্ব

পুরুষানুগত এবং কোনটি বা নারীসুলভ, তা নির্ণয় করতে পারা অসম্ভব। তত্ত্ব মাত্রেই তা অপেক্ষ, ক্ষেত্রবিশেষে সাপেক্ষ প্রেক্ষিত যুক্ত হতে পারে শুধুমাত্র তথ্যের স্তরে। তথ্য নির্বাচন করার সময়, তাত্ত্বিক পরিসরে যে সকল তথ্য গৃহীত হয়, সেগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সেগুলি অগ্রাধিকার পাওয়ার ফলে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সুবিধা লাভ করে। অন্যদিকে যে সকল তথ্যগুলিকে বর্জন করা হয়, সেগুলি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তা অবহেলিত হওয়ার দরুণ, প্রয়োগের স্তরেও সেগুলির প্রতি সুবিচার সম্ভব হয় না। তাই উদারপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন যে, তথ্য নির্বাচন করার সময়ে অপেক্ষতার আড়ালে কোনোভাবেই যেন সাপেক্ষ প্রেক্ষিত লুকিয়ে না থাকে, এবং তত্ত্বপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতার রাজনীতি যেন যুক্ত হতে না পারে, সেই ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যুক্তি যেন তার নিয়ামক ভূমিকা বলবৎ রাখতে পারে সেই দিকে সদা-সতর্ক দৃষ্টিপাত আবশ্যিক। যেকোনো তত্ত্বের কাজই হল কোনো তথ্যকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বোধগম্য করে তোলা। কাজেই যে সমস্ত তথ্যগুলি তত্ত্বের পরিসর থেকে বাদ পড়ে গেছে সেগুলিকে পুনরায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সুবিচার পাওয়া যেতে পারে। এই উপায়ে নারীর লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলেই উদারপন্থী নারীবাদীরা মনে করে থাকেন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উদারপন্থী নারীবাদীদের দুটি মূল লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। প্রথমত, মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠিত ধ্রুপদী তত্ত্ব কাঠামোর মধ্য থেকে, নারীর লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি যুতসই কাঠামো নির্বাচন করা, এবং দ্বিতীয়ত, তথ্যের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব কাঠামোর পরিসরে যুক্ত করে, ওই তত্ত্বের প্রয়োগ ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা।^১

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উদারপন্থী নারীবাদীরা মানুষের যৌন ও লিঙ্গ ধর্ম অতিরিক্ত যে মানব ধর্ম স্বীকার করেন, তা নারী বা পুরুষ কারোরই লিঙ্গ সাপেক্ষ কোনো ঐকান্তিক গুণধর্ম নয়। বরং তা হল নারী-পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি সাধারণ ধর্ম। সুতরাং বলা

^১ শেফালি মৈত্র, ২০০৭, পৃ. ১২০।

যেতেই পারে যা মানবিক তা যৌক্তিক, যা যৌক্তিক তা সার্বজনীন, এবং যা সার্বজনীন তা অনপেক্ষ। সেই কারণেই বলা হয় মানুষ হল যৌক্তিক জীব, কিন্তু ‘অনবধান’ বশত যদি দেখা যায় যে, যা মানবিক বা মানুষের ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়, সেগুলি আসলে পুরুষের লিঙ্গ ধর্ম সাপেক্ষ গুণাবলী, তাহলে করণীয় বিষয় হল দুটি। সেক্ষেত্রে হয় নারী সুলভ গুণগুলিকে ‘মানব’ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অথবা লিঙ্গ উত্তরণের মাধ্যমে নারীকে আদর্শ ‘মানব’ হয়ে ওঠার সুযোগ প্রদান করতে হবে। মনে রাখা আবশ্যিক যে, উদারপন্থী নারীবাদীরা নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, লিঙ্গ সাপেক্ষতাকে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকার করে নিলেও, চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁরা লিঙ্গ অনপেক্ষ অবস্থানকেই সমর্থন করবেন। তাঁরা নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্ষমতার সর্বস্তরে অন্তর্ভুক্তির দাবিটিকে বহাল রাখতে চান। তত্ত্ব-কাঠামোর অহেতুক পরিবর্তনের দাবি তাঁরা জানান না, কিন্তু প্রয়োজন সাপেক্ষে তত্ত্বের পরিসর বৃদ্ধি করার জন্য পুনর্নির্মাণের পক্ষপাতী।

জ্ঞানতত্ত্ব :

ধ্রুপদী জ্ঞানতত্ত্বে ‘যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস’, (Justified True Belief)-কে ‘জ্ঞান’ (Knowledge) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই মতানুসারে কোনো বিষয়কে (বচনকে) যদি জ্ঞান পদবাচ্য হতে হয়, তাহলে সেই জ্ঞানের বিষয়টিকে সত্য হতে হবে, বিষয়টির সত্যতার প্রতি জ্ঞাতার বিশ্বাস থাকতে হবে এবং ওই বিশ্বাসের সমর্থনে পর্যাপ্ত যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা আবশ্যিক। সুতরাং যেকোনো জ্ঞানের ক্ষেত্রে ওই তিনটি শর্ত অপরিহার্য। তাই উক্ত শর্তগুলিকে পৃথকভাবে জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত এবং একত্রে জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত বলা হয়।

মূলস্রোতের ধ্রুপদী জ্ঞানতত্ত্বে সর্বদাই বিষয়নিষ্ঠ (objective) জ্ঞানলাভের দাবি জানানো হয়ে থাকে, এবং মনে করা হয় উক্ত বিষয়নিষ্ঠতায় পৌঁছানোর একমাত্র অবলম্বন হল যুক্তি (reason)। যে সমস্ত জ্ঞানতাত্ত্বিকরা জ্ঞানতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে যুক্তিকে

অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাঁদের মতে বিশুদ্ধ যুক্তির মাধ্যমেই বিষয়ী (subject) বা জ্ঞাতার প্রেক্ষিত অনপেক্ষভাবে বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। এইপ্রকার যুক্তির মাধ্যমে আমরা যেমন বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করতে পারি, তেমনই আবার বিষয়ী অনপেক্ষ যৌক্তিক নীতিও (rational principle) পেতে পারি।

আলোচ্য স্থলে নারীবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক রে হেলেন ল্যাংটন (Rae Helen Langton, 1961-) কীভাবে বিশেষ বিশেষ নারীবাদী মতের বিশ্লেষণ ও বিচারপূর্বক, জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে যুক্তি তথা যৌক্তিক নীতির আভিজাত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন তা পর্যালোচনা করা হবে। ল্যাংটন তাঁর “Beyond a Pragmatic Critique of Reason”^৮ নামক প্রবন্ধে যে বিশেষ বিশেষ নারীবাদী মতের উপস্থাপনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ক্যাথেরিন এ্যালিস ম্যাক্কিনন (Catherine Alice Mackinnon, 1946-) এবং স্যালী হাসলাঙ্গার (Sally Haslanger, 1955-)।

ম্যাক্কিননের বক্তব্য ছিল - জ্ঞানতাত্ত্বিক (ধ্রুপদী) প্রেক্ষিতে যে ধরনের বিষয়নিষ্ঠতার দাবি করা হয়, যা জ্ঞাতার প্রেক্ষিত অনপেক্ষ অবস্থান দ্বারা রচিত বলে মনে হয়, তা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের সামাজিক অবস্থান নির্ভর কতকগুলি নির্মাণ। সেক্ষেত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়নিষ্ঠতার পরিবর্তে একধরনের ‘সামাজিক বিষয়করণতা’ (social objectification) প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে বলেই তাঁর অভিমত। প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যিক যে, বিষয়নিষ্ঠতা হল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি, অপরপক্ষে বিষয়করণতা হল একপ্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো কিছুকে ‘বিষয়’^৯-এ পরিণত করা হয়। অর্থাৎ বিষয়নিষ্ঠতার পরিবর্তে ‘বিষয়করণ’ (objectify) করা হয়। এই মতানুসারে আরও দাবি জানানো হয় যে, উক্ত সামাজিক প্রক্রিয়া লিঙ্গ রাজনীতি (gender politics)-র সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। তাই এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে নারী, বিশেষত তার যৌনতার উপর পুরুষের আধিপত্য একপ্রকার সামাজিক চর্চায় পর্যবসিত হয়। ফলত বলা যেতেই পারে যে, যৌন বিষয়নিষ্ঠতা (sexed objectivity)

^৮ Rae Langton, “Beyond a Pragmatic Critique of Reason”, in *Australasian Journal of Philosophy*, Vol. 71, No. 4, 1993, p. 365.

^৯ Catherine Mackinnon, *Feminism Unmodified*, Harvard University Press, London, 1987, p. 50.

সৃষ্টি করে যৌন বিষয় (sex object)-কে। এক্ষেত্রে যৌন বিষয়নিষ্ঠতার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় যৌন বিষয়করণতা। আমরা জানি সৃষ্টি মাত্রেই তা স্রষ্টানির্ভর। সুতরাং এহেন আপাত বিষয়নিষ্ঠ, অথচ প্রকৃতপক্ষে পুরুষের সামাজিক অবস্থান নির্ভর প্রেক্ষিত থেকে কোনও বিশেষ যৌক্তিক নীতিকে (যা কিনা তথাকথিত বিষয়নিষ্ঠ বা বিষয়ী অনপেক্ষতার দ্বারা ভূষিত) অনুসরণ করার অর্থ হল, পুরুষের স্বার্থ চরিতার্থ হওয়া এবং নারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া। বলাই বাহুল্য যে, নারীবাদীরা মনে করেন পুরুষই হল সেই স্রষ্টা যার প্রতিনিধিত্বে বিষয়করণতার প্রক্রিয়া সার্থক হয় ওঠে, এবং নারীই হল সেই সৃষ্ট 'বিষয়' যা এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্যবস্তু - পুরুষের সমস্ত কামনা-বাসনার (desire) উৎসস্থল।

ল্যাংটন উপর্যুক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপূর্বক দেখাতে চাইছেন যে, সত্যি যদি এমন কোনো যৌক্তিক নীতি থাকে যা অনুসরণ করার ফলে পুরুষের স্বার্থ পূরণ হয়, এবং একইসঙ্গে তা নারীর স্বার্থকে আঘাত করে, তাহলে এই মতটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুটি অবশ্য করণীয় বিষয় হল - প্রথমত, উক্ত যৌক্তিক নীতিটির বহুল প্রচলনের বা ব্যাপকভাবে অনুসরণ করার স্বপক্ষে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে হবে, এবং দ্বিতীয়ত, ওই যৌক্তিক নীতিটিকে নস্যাৎ (damning) করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো যৌক্তিক নীতিকে যদি নস্যাৎ করতে হয় তাহলে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে যে, ওই যৌক্তিক নীতিটি কারোর স্ব-স্বার্থ (self interest) পূরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা, এবং সেইসঙ্গে নীতিটি কোনোপ্রকার কু-ফলাফলের জন্ম দিচ্ছে কিনা। যদিও ল্যাংটন মনে করেন এতটা দেখানোই যথেষ্ট নয়। তাই এইপ্রকার যৌক্তিক নীতিগুলিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা সেগুলিকে নস্যাৎ করার জন্য অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন আছে। সেই অভিপ্রায়ে তিনি বিশ্বাস সৃজন (belief formation)-এর ক্ষেত্রটির সঙ্গে যৌক্তিক নীতির সাক্ষাৎ সম্পর্কের প্রেক্ষাপটটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

ল্যাংটনের বক্তব্য হল - যদি বলা হয় যে, 'P' হয় 'A'-এর স্বার্থ, তাহলে সেক্ষেত্রে 'P'-কে লাভ করার জন্য 'A'-এর ক্রিয়াশীলতার একটি আপাত ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতেই পারে। ('A' বলতে এখানে কোনও জ্ঞাতা বা বিষয়ীকে এবং 'P'

বলতে কোনও বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।) তাঁর মতে সাধারণত মানুষের স্ব-স্বার্থ বলতে বোঝায় তার কামনা-বাসনাকে, যা কিনা সেই মানুষটি পূরণ করতে চায়। এই কাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলিকে লাভ করার উদ্দেশ্যে মানুষ তৎপর হয়ে ওঠে, এবং তার মধ্যে ক্রিয়াশীলতা (action) দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীলতাকে মানুষের স্ব-স্বার্থ চরিতার্থতার একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা গেলেও, ল্যাংটন কিন্তু ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রটিকে যৌক্তিক নীতির অভিমুখে প্রসারিত করতে আগ্রহী নন। যৌক্তিক নীতি মানুষের ক্রিয়া এবং বিশ্বাস উভয়কেই প্রাণিত করলেও, তিনি বিশ্বাসের ক্ষেত্রটিতেই অধিক মনোযোগ দিতে চাইছেন। তাঁর লক্ষ্য হল যৌক্তিক নীতিকে বিশ্বাস সৃজনের একটি কৌশল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল মানুষ যখন তার বিশ্বাসের ক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করে, তখন সে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যপূরণের জন্য পৃথক পৃথক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করে থাকে। প্রস্তাবিত স্থলে ‘P’ যেহেতু ‘A’-এর স্বার্থ, তাই ‘P’-কে লাভ করার জন্য ‘A’-এর ক্রিয়াশীলতার একটি আপাত ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও, এক্ষেত্রে ‘P’-এর প্রতি ‘A’-এর বিশ্বাস আছে, এমন কোনও ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা নাও পাওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে যথার্থ ব্যাখ্যা পেতে হলে আমাদের জগৎ ও বিশ্বাস কীভাবে একে-অপরের সঙ্গে খাপ খায় (fit), সেই খাপ খাওয়ার প্রক্রিয়া বা অভিমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে বলেই ল্যাংটনের অভিমত।

ল্যাংটনের মতে প্রতিটি বিশ্বাসের লক্ষ্য হল সত্য হওয়া, এবং বিশ্বাসগুলি তখনই সত্য হয়ে উঠবে যখন জগতে সেগুলি খাপ খাবে। প্রতিতুলনায় মানুষের কামনা-বাসনাগুলির লক্ষ্য হল চরিতার্থতা। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন জগৎ সেগুলিতে খাপ খাবে। অর্থাৎ বিশ্বাসগুলি সুবিন্যস্ত হয় জগতে খাপ খাওয়ার জন্য, এবং জগৎ সুবিন্যস্ত হয় কামনা-বাসনাগুলিতে খাপ খাওয়ার জন্য।^{১০} এটি হল খাপ খাওয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বা অভিমুখ। এই প্রসঙ্গে ল্যাংটন-এর বক্তব্যকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। তাঁর মতানুসারে প্রাপ্ত খাপ খাওয়ার প্রক্রিয়া বা অভিমুখটিকে যেমন গঠনগত (constitutive) দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনই আবার আদর্শগত

^{১০} Rae Langton, 1993, p. 366.

(normative) দিক থেকেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যদি গঠনগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে বলতে হবে - 'বিশ্বাসের লক্ষ্য হল জগতে খাপ খাওয়া' (belief aim to fit the world), কিন্তু যদি আদর্শগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে বলতে হবে - বিশ্বাস মাত্রেই তা জগতে খাপ খাওয়া উচিত' (belief ought to fit the world)। প্রথমটির ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় হল 'বিশ্বাস' বলতে কী বোঝায়? এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় হল 'ভালো বিশ্বাস' বলতে কী বোঝায়? এক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে যে, বিশ্বাস হল এমন কিছু যার লক্ষ্য হল জগতে খাপ খাওয়া, এবং ভালো বিশ্বাস হল তাই যা জগতে খাপ খায়। ল্যাংটন কিন্তু বিশ্বাসের এইজাতীয় শ্রেণীকরণ নিয়ে মনোযোগী নন। অর্থাৎ তিনি এমন কথা বলতে চাইছেন না যে, যদি একটি বিশ্বাসকে 'ভালো বিশ্বাস' হতে হয়, তাহলে তার লক্ষ্য হওয়া উচিত জগতে খাপ খাওয়া। (...a belief to be a good belief it should aim to fit the world;..)। বরং তাঁর দাবি হল কোনো কিছুকে আদৌ 'বিশ্বাস' পদবাচ্য হতে হলে, তার আবশ্যিক লক্ষ্যই হল জগতে খাপ খাওয়া (... to be a belief at all, it must aim to fit the world, ...)। অন্যভাবে বলতে গেলে সত্য হয়ে ওঠাটাই বিশ্বাসের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম।¹¹

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্বাসগুলি জগতে খাপ খাবে এবং জগৎ কামনা-বাসনাগুলিতে খাপ খাবে; এটি খাপ খাওয়ার প্রত্যাশিত স্বাভাবিক অভিমুখ হলেও বাস্তবে চিত্রটা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, বিশ্বাসগুলি তাদেরকে সুবিন্যস্ত করে কামনা-বাসনাগুলিতে খাপ খাওয়ার জন্য, এবং জগৎ নিজেকে সুবিন্যস্ত করে বিশ্বাসগুলিতে খাপ খাওয়ার জন্য।¹² ল্যাংটন খাপ খাওয়ার এইপ্রকার অভিমুখ বা প্রক্রিয়াটিকে যথার্থ বলে মনে করেন না, এর জন্য তিনি পরিস্থিতিকেই দায়ী করে থাকেন। কোনো যৌক্তিক নীতি কখনোই এই ধরনের অবৈধ খাপ খাওয়ার প্রক্রিয়ার উৎস হতে পারে না বলেই তাঁর অভিমত। যেমন কোনো বিশ্বাস যদি ক্ষমতামূলক ব্যক্তির প্রেক্ষিত থেকে গড়ে ওঠে, তাহলে সেই ব্যক্তি নিজের কামনা-

¹¹ Ibid, p. 367.

¹² Ibid, p. 368.

বাসনার অনুকূলেই তার ওই বিশ্বাসগুলিকে গড়ে তুলতে চায়। এক্ষেত্রে জগৎ ক্ষমতামূলক ব্যক্তির কামনা-বাসনা অনুযায়ী গড়ে ওঠা বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। ফলত ক্ষমতামূলক প্রেক্ষিত থেকে ‘জগৎ’-কে যে রূপে দেখতে চাওয়া হয় জগৎ সেইরূপেই সুবিন্যস্ত হয়। এইভাবে ‘জগৎ’-কে বিষয়নিষ্ঠ হিসাবে দেখার পরিবর্তে তাকে ‘বিষয়করণ’ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনও ক্ষমতামূলক ব্যক্তি কামনা করে যে - ‘P’, তখন সে বিশ্বাস করে যে - ‘P’। এইস্থলে জগতে খাপ খাওয়ার পরিবর্তে, বিশ্বাসগুলি সুবিন্যস্ত হয় কামনা-বাসনাতে খাপ খাওয়ার জন্য। একই কৌশলে যখন কোনো ক্ষমতামূলক ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে - ‘P’, তখন জগৎ নিজেকে সুবিন্যস্ত করে - ওই বিশ্বাসগুলিতে খাপ খেয়ে সেগুলিকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে। সুতরাং বিশ্বাস সৃজনের এই কৌশলের দ্বারা বিষয়নিষ্ঠতার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে ‘বিষয়করণতা’ (objectification) প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারীবাদী দর্শনের কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল এই ‘বিষয়করণতা’। সাধারণত ‘বিষয়করণতা’ বলতে বোঝায় এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো মানুষকে একটি ‘বিষয়’ হিসাবে গণ্য করা হয়। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বোঝা যায় যে, মূলত নারীই হল সেই ‘বিষয়’। এক্ষেত্রে নারীর ‘যৌন বিষয়করণতা’ মুখ্য আলোচ্য উপাদানরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। মার্থা নুসবাম (Martha Nussbaum, 1947-) কোনো মানুষকে ‘বিষয়’ হিসাবে গণ্য করার যে ধারণা (idea), তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন।^{১০}

১. সাধনযোগ্যতা (instrumentality) : এক্ষেত্রে একজন মানুষের প্রতি এমন আচরণ করা হয়, যেন সে বিষয় নির্ধারকের উদ্দেশ্য সাধনের একটি হাতিয়ার (tool) মাত্র।

২. অস্বীকৃত স্বাভাবিকতা (denial of autonomy) : এক্ষেত্রে একজন মানুষের প্রতি এমন আচরণ করা হয়, যেন তার মধ্যে স্বাভাবিক এবং স্ব-নির্ধারণের ক্ষমতার অভাব রয়েছে।

^{১০} Martha Nussbaum, “Objectification”, in *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 24, No. 4, 1995, p. 257.

৩. নিষ্ক্রিয়তা (inertness) : এক্ষেত্রে একজন মানুষের প্রতি এমন আচরণ করা হয়, যেন তার মধ্যে কর্তৃত্ব এবং সক্রিয়তার অভাব রয়েছে।

৪. বিনিময়যোগ্যতা (fungibility) : এক্ষেত্রে একজন মানুষের প্রতি এমন আচরণ করা হয়, যেন সে অপর কোনো 'বিষয়' -এর সঙ্গে বিনিময়যোগ্য পদার্থ।

৫. লঙ্ঘনযোগ্যতা (violability) : এক্ষেত্রে একজন মানুষের প্রতি এমন আচরণ করা হয়, যেন তার কোনো সীমারেখা নেই এবং অখণ্ডতার অভাব রয়েছে, অর্থাৎ সে একীভূত নয়।

৬. স্বত্ত্বাধিকার (ownership) : এক্ষেত্রে একজন মানুষের প্রতি এমন আচরণ করা হয়, যেন সে অন্যের অধিগত সম্পত্তি, যা কিনা ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য।

৭. অস্বীকৃত বিষয়ীনিষ্ঠতা (denial of subjectivity) : এক্ষেত্রে একজন মানুষের প্রতি এমন আচরণ করা হয় যেন তার যাপনের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি বলে আদৌ যদি কিছু থেকে থাকে, সেগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনার কোনো প্রয়োজনই নেই।

নুসবাম প্রদত্ত উপরোক্ত তালিকাটিকে ল্যাংটন পর্যাপ্ত বলে মনে করেন না। তাই তিনি উক্ত তালিকাটির সম্পূর্ণতার উদ্দেশ্যে আরও তিনটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। সেগুলি হল -

৮. দৈহিক পর্যাবসান (reduction to body) : এক্ষেত্রে একজন মানুষের প্রতি এমন আচরণ করা হয়, যেন সে শুধুমাত্র তার দেহ বা দেহাংশের নিরিখেই চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য।

৯. অবভাসিক পর্যাবসান (reduction to appearance) : এক্ষেত্রে একজন মানুষ প্রধানত, কীভাবে দৃষ্টিগোচর হয় বা কীরূপে বোধগম্য হয় তার ভিত্তিতেই বিশেষ আচরণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

১০. নৈঃশব্দ্য (silencing) : এক্ষেত্রে একজন মানুষের প্রতি এমন আচরণ করা হয় যেন সে শব্দহীন এবং তার বলার ক্ষমতার অভাব রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্যালী হাসলাঙ্গার মনে করেন যে, 'A' ব্যক্তি যদি 'B' ব্যক্তিকে 'বিষয়করণ' করতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে চারটি শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যিক।^{১৪} সেই শর্তগুলি হল -

প্রথমত, 'A' ব্যক্তি 'B' ব্যক্তি-কে 'বিষয়'রূপে দেখবে এবং সেই হিসাবেই আচরণ করবে নিজের কামনা-বাসনার সন্তুষ্টির জন্য।

দ্বিতীয়ত, 'A' ব্যক্তি 'B' ব্যক্তি-কে কাম্যবস্তু হিসাবে গণ্য করে তার কিছু বিশেষ ধর্মের নিরিখে, এবং সেই ধর্মগুলি ওই ব্যক্তির মধ্যে থাকাটাকে বাধ্যতামূলক করে তুলবে।

তৃতীয়ত, 'A' ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, 'B' ব্যক্তির মধ্যে সেই ধর্মগুলি আছে।

চতুর্থত, 'A' ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, 'B' ব্যক্তির মধ্যে যে ধর্মগুলি আছে, সেগুলি তার স্বভাবজাত।

এখন দেখে নেওয়া যাক সামাজিক স্তরে প্রাপ্ত চারটি শর্তকে যদি পুরুষের দ্বারা নারীর 'যৌন বিষয়করণ'-এর ক্ষেত্রটিকে প্রয়োগ করা হয় তাহলে ব্যাপারটি কীরকম দাঁড়ায়। এইস্থলে 'A' ব্যক্তি হিসাবে পুরুষকে, এবং 'B' ব্যক্তি হিসাবে নারীকে বুঝতে হবে। সুতরাং বলা যেত পারে, পুরুষের দ্বারা নারীর যৌন বিষয়করণের ক্ষেত্রে চারটি আবশ্যিক শর্ত হল -

প্রথমত, পুরুষ নারীকে 'বিষয়'রূপে দেখতে চায় এবং সেই হিসাবেই আচরণ করে নিজের কামনা-বাসনার সন্তুষ্টির জন্য।

দ্বিতীয়ত, পুরুষ নারীকে অধীনস্থ ও বিষয়বৎ (object like) রূপে কামনা করে এবং বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে।

তৃতীয়ত, পুরুষ বিশ্বাস করে যে, নারী প্রকৃতপক্ষেই অধীনস্থ এবং বিষয়বৎ।

চতুর্থত, পুরুষ বিশ্বাস করে যে, নারী প্রকৃতপক্ষে অধীনস্থ এবং বিষয়বৎ, কারণ এটাই তাদের স্বভাবজাত ধর্ম।

^{১৪} Sally Haslanger, "On Being Objective and Being Objectivity", in *A Mind of One's Own : Feminist Essays on Reason and Objectivity*, eds. by Louise M. Antony and Charlotte E. Witt, Westview Press, Oxford, 1993, pp. 102-3.

আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো যৌক্তিক নীতিকে তখনই নস্যাৎ করা যাবে, যখন কোনো ব্যক্তি সেই নীতিটিকে স্ব-স্বার্থ চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে, এবং একইসঙ্গে ওই নীতিটি একটি কু-ফলাফলের জন্ম দেবে। ফলত সমাজে লিঙ্গ-অসাম্যের বাস্তব পরিস্থিতিতে কোনো যৌক্তিক নীতি অনুসরণের ফলে যদি দেখা যায় যে, সেক্ষেত্রে পুরুষের স্বার্থ চরিতার্থ হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে নারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তাহলে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ সাপেক্ষে সেই নীতিটিকে অবশ্যই নস্যাৎ করে দেওয়া উচিত। কারণ নারীকে বিষয়বৎ হিসাবে দেখাটা কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, এটি সমাজে লিঙ্গ অসাম্যজনিত ফলাফল থেকেই উঠে আসে। এক্ষেত্রে লিঙ্গ অসাম্যের বাস্তব পরিস্থিতিটিকে অগ্রাহ্য করেই নারীর স্বভাবকে উপস্থাপিত করা হয়। যদিও এটি কখনোই কারোর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় যে, কোনো যৌক্তিক নীতির দ্বারা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ হচ্ছে বলেই সেটি অনুসরণযোগ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক।

উক্তপ্রকার স্ব-স্বার্থ পূরণকারী এবং অপরের স্বার্থের পক্ষে হানিকর যৌক্তিক নীতিগুলিকে যদি প্রায়োগিক দিক থেকে সমালোচনা করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, যেহেতু যৌক্তিক নীতির ব্যবহার নারীর স্বার্থকে আঘাত করে তাই তা অবশ্যই নস্যাৎযোগ্য। কারণ যৌক্তিক নীতির এইরূপ ব্যবহারের ফলে যৌক্তিকতার অবমাননা ঘটে। এটি কখনোই কাম্য নয়। প্রায়োগিক আপত্তির ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আপত্তি করা হয়ে থাকে, তাই এই প্রেক্ষিত থেকে কোনো যৌক্তিক নীতি কী ফলাফলের জন্ম দিচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে ওই যৌক্তিক নীতিটিকে দোষদুষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করাটা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ এক্ষেত্রে তা পুরুষের স্বার্থপূরণের পাশাপাশি নারীর স্বার্থকে আঘাতের মধ্য দিয়ে কু-ফলাফলের জন্ম দিয়ে থাকে। সমস্যার বিষয় হল একদল প্রায়োগিক তাত্ত্বিক আবার মনে করেন যে, কোনও যৌক্তিক নীতি অনুসরণ করার ফলে যদি দেখা যায় যে, ব্যবহারকারীর স্বার্থপূরণ হচ্ছে, তাহলে সেই নীতিটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে; এমনকি বাস্তবে তা যে ফলাফলেরই জন্ম দিয়ে থাকুক না কেন। ফলস্বরূপ কোনো যৌক্তিক নীতি ব্যবহারের ফলে যদি পুরুষের স্বার্থ চরিতার্থ হয়, তাহলেও সেই নীতিটি যথার্থ হিসাবে গৃহীত হতে

পারবে। সুতরাং এই মতে ফলাফল নির্বিশেষে ব্যবহারকারী ব্যক্তির স্বার্থপূরণ হওয়াটাই কোনো যৌক্তিক নীতির গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ডস্বরূপ। এতদতিরিক্তভাবে কান্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে থেকেও যৌক্তিক নীতির বিরোধিতা করা কঠিন। কারণ কান্টের মতে কোনো নীতি অনুসরণের ফলে সেটি কী ফলাফলের জন্ম দিচ্ছে, তার ভিত্তিতে সেই নীতির মূল্যায়ন অসম্ভব। এই মতানুসারে কোনো যৌক্তিক নীতি দৃশ্য কিনা তা সেই নীতির আপন আলোতেই প্রকাশ পায়।

পূর্বে উল্লিখিত ম্যাককিনন-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি যুক্তি তথা যৌক্তিক নীতিগুলিকে লিঙ্গ সাপেক্ষ বলেই মনে করেন, এবং এইপ্রকার যৌক্তিক নীতিগুলিকে অনুসরণের মাধ্যমে কখনোই ‘বিষয়নিষ্ঠতা’কে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই তাঁর অভিমত। এক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টতই দাবি করেন যে, ওই সমস্ত লিঙ্গ সাপেক্ষ যৌক্তিক নীতিগুলি হল একদল মানুষ কর্তৃক অপরদলকে শোষণের মাধ্যম। তাই এহেন যৌক্তিক নীতি অনুসরণ করার অর্থ হল এক্ষেত্রে ‘বিষয়নিষ্ঠ’ না হয়ে ‘বিষয় নির্ধারক’ (objectifier) হওয়া। ম্যাককিনন ‘বিষয়নিষ্ঠতা’ বলতে বুঝতেন একপ্রকার ‘নিরপেক্ষ (neutral) ভঙ্গি’ এবং ‘পরিস্থিতি অনপেক্ষ দূরবর্তী অবস্থানকে’ (nonsituated distanced standpoint)। তাঁর মতে জগৎ স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষভাবেই অস্তিত্বশীল, আমাদের উপর নির্ভরশীল নয়। এই প্রসঙ্গে হ্যাসলাঙ্গার মনে করেন যে, জগৎ সম্বন্ধীয় ‘বিষয়নিষ্ঠতা’ অর্জন করতে গেলে প্রথমেই বস্তু বা বিষয় (object)-এর স্বভাব (nature) আবিষ্কার করা প্রয়োজন। একটি ‘বিষয়’-এর স্বভাব হল তার অপরিহার্য ধর্ম, এমনকি এটির কোনোরূপ পরিবর্তন সেই ‘বিষয়’-এর ধ্বংসের কারণ হতে পারে। কোনো বিষয়ই তার সেই সমস্ত ধর্ম ব্যতিরেকে অস্তিত্বশীল হতে পারে না - যেগুলি কিনা তার স্বভাবের মধ্যে নিহিত থাকে। এক্ষেত্রে কোনো ‘বিষয়’-এর স্বভাব উদ্ঘাটন করতে পারলেই, সেটি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কীরূপ আচরণ করবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হতে পারে। এর অর্থ হল ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই বস্তু বা বিষয়-এর স্বভাবের দিকে নজর দিতে হবে।^{১৫}

^{১৫} Ibid, pp. 103-5.

উপরোক্ত মতানুযায়ী কোনও বিষয়-এর স্বভাব জানার বা আবিষ্কার করার জন্য একটি আপাত ন্যায়সঙ্গত কৌশল হল তার নিয়ত আচরণের পর্যবেক্ষণ। কারণ পারিপার্শ্বিক স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোনো বিষয়-এর স্বভাবই তার নিয়ত আচরণের প্রতি দায়বদ্ধ। তাই বস্তু বা বিষয়ের আচরণের নিয়মানুবর্তিতা থাকলেই তা তাদের প্রকৃত স্বরূপ হিসাবে ব্যাখ্যাত এবং গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে যুক্তির ভূমিকা হল ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন আচরণ ও সিদ্ধান্তগুলিকে বস্তু বা বিষয়-এর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - ধরা যাক, আমি পর্যবেক্ষণ করলাম যে, যদি জলের অভাব ঘটে, তাহলে আমার গাছপালা মারা যায়। এর ভিত্তিতে আমি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করি, গাছপালার প্রকৃতিই হল এমন যে - তা জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। এই ঘটনার নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ করে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, জলই আমার গাছগুলিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। আবার, গাছপালা তখনই মারা যায়, যখন জলের অভাব দেখা দেয় - এই নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ করে আমি সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করি যে, উক্ত ঘটনাটি ঘটে গেছে স্বভাবের জন্যই।

বস্তু বা বিষয়ের স্বভাব আবিষ্কারের উক্ত কৌশল বা প্রক্রিয়াটি যদি সমাজজীবনে নারীর স্বভাব নির্ণয়ে কার্যকরী করা হয়, তাহলে তা প্রভূত সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। যেমন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্বভাব বিষয়ক একটি পর্যবেক্ষিত নিয়মানুবর্তিতা হল এই যে - নারী হল অধীনস্থ এবং বিষয়বৎ। ফলত এক্ষেত্রে বিশ্বাস করে নেওয়া হয় যে, নারী অধীনস্থ এবং বিষয়বৎ রূপে পরিগণিত হয় তাদের স্বভাবের জন্যই। কারণ পুরুষ বিশ্বাস করে যে, তার পর্যবেক্ষণ কোনোভাবেই নিজের সামাজিক অবস্থান বা পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত নয়, এবং তার পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় সেইসবের কোনো প্রভাবও পড়ে না। সুতরাং নারীর প্রতিনিয়ত একই প্রকার আচরণ লক্ষ করে তাকে অধীনস্থ এবং বিষয়বৎ রূপে দেখাটা কোনো সামাজিক অবস্থান বা পরিস্থিতি নির্ভর সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটাই নারী-স্বভাব সম্পর্কিত বিষয়নিষ্ঠ আবিষ্কার।

এই প্রসঙ্গে ল্যাংটন-এর বক্তব্য হল, যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নিয়মিত একপ্রকার আচরণকে তার স্বভাবগত আচরণ বা স্বরূপ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়,

তাহলে সেক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করতে হবে যে, ওই আচরণ বা স্বরূপটি স্বাভাবিক, নাকি কৃত্রিম। অর্থাৎ উক্ত আচরণ বা স্বরূপটি যেন, কোনো পরিস্থিতির দ্বারা কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রিত না হয়ে থাকে, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যিক। সুতরাং একই প্রকার আচরণের পুনরাবৃত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশ্বাসটি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর স্বরূপের মূলানুগ, নাকি পরিস্থিতির দ্বারা সৃজিত স্বরূপানুগ সেটি তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। কারণ যেকোনো ক্ষেত্রে যখন যৌক্তিক-নীতি প্রযুক্ত হয় তখন সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক, কিন্তু সর্বদাই এমনটা নাও হতে পারে, এর বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তও সম্ভব।

হ্যাসলাঙ্গার উক্তপ্রকার অনুধারণা সাপেক্ষ বিষয়নিষ্ঠতাকে ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’ (assumed objectivity) নামে অভিহিত করেছেন। তিনি এইরূপ বিষয়নিষ্ঠতার চারটি সহনীতির কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল¹⁶ -

১. জ্ঞানতাত্ত্বিক নিরপেক্ষতা (epistemic neutrality) : এই নীতি অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আচরণের নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ করা যায়, তাহলে সেটি তার স্বভাব হিসাবে গৃহীত হয়।

২. প্রায়োগিক নিরপেক্ষতা (practical neutrality) : এই নীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তকে তার স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা হয়।

৩. একান্ত প্রেক্ষিত অনপেক্ষতা (absolute aperspectivity) : এই নীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আচরণের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে যেগুলিকে প্রকৃত নিয়মানুবর্তী হিসাবে লক্ষ করা গেছে, সেগুলি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

৪. পরিগৃহীত প্রেক্ষিত অনপেক্ষতা (assumed aperspectivity) : এই নীতি অনুযায়ী যখন কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর আচরণের নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ করা হয়, তখন ধরে নেওয়া হয় যে, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিগুলি স্বাভাবিক।

¹⁶ Ibid, pp. 106-7.

‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র উপর্যুক্ত সহনীতিগুলির মধ্যে চতুর্থ সহনীতি অর্থাৎ ‘পরিগৃহীত প্রেক্ষিত অনপেক্ষতা’র নীতিটিকে ল্যাংটন গ্রহণ করেন না। তাঁর বক্তব্য হল ‘পরিগৃহীত প্রেক্ষিত অনপেক্ষতা’র নীতিটির দ্বারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হিসাবে ধরে নেওয়া হলেও, তা কেবল আপাতদৃষ্টিতেই স্বাভাবিক। এর অন্তরালে কোনো অস্বাভাবিক প্রেক্ষিত জড়িয়ে থাকাকাটা অসম্ভব নয়। ল্যাংটন-এর মতে ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’ হল এমন এক বিশেষ নীতি, যেটিকে প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর সামাজিক লিঙ্গ ভূমিকাকে বৈষম্যমূলক করে তোলা হয়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিয়ম-নীতির সঙ্গে একটি বিশেষ সামাজিক লিঙ্গ ভূমিকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে। ল্যাংটন এইপ্রকার সম্পর্ককেই ‘বিষয়করণতা’র সম্পর্ক বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের বাস্তব পরিস্থিতিতে পুরুষ, নারীকে অধীনস্থ হিসাবে দেখতে চায়। এক্ষেত্রে পুরুষ -

প্রথমত, ‘পরিগৃহীত প্রেক্ষিত অনপেক্ষতা’র দ্বারা ধরে নেবে যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক।
দ্বিতীয়ত, ‘একান্ত প্রেক্ষিত অনপেক্ষতা’র দ্বারা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, নারীর আচরণের মধ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা আছে তা প্রকৃত নিয়মানুবর্তিতা।
তৃতীয়ত, ‘জ্ঞানতাত্ত্বিক নিরপেক্ষতা’র দ্বারা সে নারীর আচরণের প্রকৃত নিয়মানুবর্তিতাকে তার স্বভাব হিসাবে বিবেচনা করবে।
চতুর্থত, ‘প্রায়োগিক নিরপেক্ষতা’র দ্বারা পুরুষ তার গৃহীত সিদ্ধান্তকে নারীর স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে।^{১৭}

সুতরাং লক্ষ করা গেল যে, ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র দ্বারা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক হিসাবে ধরে নিয়ে পুরুষ যে ভূমিকা পালন করে, তা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। এক্ষেত্রে পুরুষ বিষয়নিষ্ঠ হওয়ার পরিবর্তে, বিষয় নির্ধারক-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, নারীকে একটি ‘বিষয়’-এ পরিণত করে। এইজাতীয় সম্পর্ককে ল্যাংটন ‘বিষয়করণতা’র সম্পর্ক বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, শুধুমাত্র বিষয়নিষ্ঠ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কোনো ব্যক্তির বিষয় নির্ধারকের ভূমিকা পালনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। বিষয় নির্ধারক হতে গেলে

^{১৭} Rae Langton, 1993, p. 376.

সেই ব্যক্তির পক্ষে সামাজিকভাবে ক্ষমতামূলী হওয়াটাও জরুরী। তাঁর মতে ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র সঙ্গে যেহেতু লিঙ্গ প্রেক্ষিত জড়িয়ে থাকে, তাই এগুলিকে ‘প্রকৃত বিষয়নিষ্ঠতা’ বলা যায় না। ল্যাংটন ‘বিষয়নিষ্ঠতা’ বলতে বোঝেন ‘অসম্বন্ধ অবস্থা’-কে এবং তিনি মনে করেন যে, এই প্রেক্ষিত থেকেই ‘প্রকৃত সত্তা’ বিষয়ক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব।

প্রাণ্ডক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র নীতিটি কার্যত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মদতপুষ্ট যা পুরুষের সামাজিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করে এবং ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায়। এই নীতিটির দ্বারা পুরুষের স্বার্থ চরিতার্থ এবং নারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এটি নারী-পুরুষের সামাজিক লিঙ্গ ভূমিকার মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করলেও তা গ্রহণীয় হওয়ার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। সামাজিক পটভূমিকাতে একজন পুরুষ যেমন এই নীতিটি অনুসরণের মাধ্যমে আদর্শ পুরুষ হয়ে ওঠে, ঠিক একইভাবে একজন নারীও এই নীতিটিকে পালনের মাধ্যমে আদর্শ নারী হয়ে ওঠে। এছাড়াও নীতিটি গ্রহণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল এই যে, পুরুষ ও নারী কেউই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন নয়। ফলে পুরুষ হয়তো এই ব্যাপারে সচেতন নয় যে, সে বিষয় নির্ধারকের ভূমিকা পালন করছে। অপরপক্ষে নারীও জানে না যে, তাকে ‘বিষয়করণতা’র মাধ্যমে বিষয়-এ পরিণত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ল্যাংটন মনে করেন যে - ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র নীতিটি অনুসরণ করলে নারী তার লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক ভূমিকাটিতে সফল হয়ে উঠতে পারবে ঠিকই, কিন্তু সেটি তার জন্য আদর্শ বা তার কাম্য স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক নাও হতে পারে। এই নীতিটি যেহেতু পুরুষ তথা শক্তিমানের স্বার্থকে পূরণ করে থাকে, এবং তার বিশ্বাসগুলিকে জগতে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে, তাই এই নীতিগুলি পুরুষ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে থাকে। যদিও ল্যাংটন মনে করেন যে, কোনো যৌক্তিক নীতি কখনোই এইপ্রকার শক্তির উৎস হতে পারে না। সুতরাং ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র নীতিটি কিছু সংখ্যক বিশ্বাসকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারলেও তা সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং এই নীতিটিকে বাতিল করার ব্যাপারে কোনও প্রশ্নের অবকাশ থাকতে পারে না।

হ্যাসলাঙ্গার উক্ত ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র নীতিটিকে প্রায়োগিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বাতিলযোগ্য বলে মনে করেন। এটি প্রায়োগিক দিক থেকে বাতিলযোগ্য, কারণ এই নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপন্ন ফলাফল নারীর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক, উপরন্তু পুরুষের স্বার্থ পূরণের সহায়ক। এছাড়াও এটি জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকেও বাতিলযোগ্য, কারণ এই নীতি মিথ্যা বিশ্বাস প্রদান করে থাকে। যেমন নারী স্বভাবগতভাবে অধীনস্থ এবং বিষয়বৎ - এটি নারী সম্পর্কিত একটি মিথ্যা বিশ্বাস, যা ওই নীতিটির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ল্যাংটন এই ব্যাপারে হ্যাসলাঙ্গারের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন যে, সামাজিক ‘উচ্চ-নীচ’ স্তরবিন্যাসের দিকে নজর রাখলে ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র নীতিটিকে অবশ্যই বাতিল করা প্রয়োজন, কিন্তু এই প্রেক্ষিতে তিনি যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা একটু ভিন্নতর। ল্যাংটন ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র নীতিটি গৃহীত না হওয়ার সপক্ষে মূলত দুটি যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমত, এই নীতি নির্ভরযোগ্যভাবে (reliably) এমন বিশ্বাস প্রদান করতে পারে যা মিথ্যা। এক্ষেত্রে মিথ্যা বিশ্বাস বলতে সেই বিশ্বাসগুলিকেই বুঝতে হবে যেগুলি কখনোই জগতে খাপ খায় না। যেমন নারী স্বভাবগতভাবেই (by nature) বিষয়বৎ, এটি হল একটি মিথ্যা বিশ্বাস, কারণ এই বিশ্বাসটি কখনোই জগতে খাপ খায় না।

দ্বিতীয়ত, এই নীতি নির্ভরযোগ্যভাবে এমন বিশ্বাস প্রদান করতে পারে যা সত্য, কিন্তু যুক্তিযুক্ত নয়, অযথার্থ যুক্তির প্রভাবেই বিশ্বাসগুলি সত্য হয়ে ওঠে। যেমন নারী প্রকৃতপক্ষে (actually) অধীনস্থ এবং বিষয়বৎ - এটি এমন এক বিশ্বাস যা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এর খাপ খাওয়ার অভিমুখটি সঠিক নয়। এক্ষেত্রে মানুষ (পুরুষ) তাদের বিশ্বাসগুলিকে জগতে খাপ খাওয়ার জন্য সুবিন্যস্ত করার পরিবর্তে দেখা যায় যে, জগৎ সুবিন্যস্ত হয় মানুষের (পুরুষের) বিশ্বাসগুলিতে খাপ খাওয়ার জন্য।

ল্যাংটনের বক্তব্য হল, যে সমস্ত মানুষ ক্ষমতার স্থান অধিকার করে থাকেন এবং ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র নীতিটিকে অনুসরণ করেন, তারা নিজেদের বিশ্বাসগুলির পরিণতি লাভের উদ্দেশ্যেই জগৎকে গড়ে তোলেন।^{১৮}

এ যাবৎ আলোচিত বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’র নীতিটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ওই নীতির সাহায্যে ‘যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস’ পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, যেহেতু তা পরিস্থিতি সাপেক্ষ। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি সাপেক্ষতা বলতে ল্যাংটন লিঙ্গ সাপেক্ষতাকেই বোঝাতে চেয়েছেন, যা কিনা সমগ্র নারীবাদী তত্ত্বালোচনার প্রেক্ষিতে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাঁর মতানুসারে ‘চরম বিষয়নিষ্ঠ’ জ্ঞান আমরা কেবলমাত্র যুক্তির সাহায্যেই লাভ করতে পারি। সুতরাং কেউ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে যুক্তির অধিকারী হয়, তাহলে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে কোনোপ্রকার ‘বিষয়করণতা’ ঘটা সম্ভবপর নয়। তিনি মনে করেন, যুক্তির ব্যবহার পরোক্ষভাবে ‘বিষয়নিষ্ঠতা’ সুনিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে ল্যাংটন কিন্তু যুক্তির বিভিন্ন মাত্রা প্রয়োগের পরামর্শ দেননি। তিনি বলবেন হয় যুক্তি তথা বিষয়নিষ্ঠতা উপলব্ধ হয়েছে অথবা হয়নি। ফলত যুক্তি তথা যৌক্তিক নীতিগুলি স্বরূপত লিঙ্গ সাপেক্ষ নয়। তত্ত্বগতভাবে বা আদর্শের দিক থেকে যুক্তি বা যৌক্তিক নীতিগুলি বিশুদ্ধ হলেও, সদাই সতর্ক থাকতে হবে যাতে যৌক্তিক নীতির দ্বারা বিশ্বাস সৃজনের প্রক্রিয়াটির মধ্যে কোনোপ্রকার জ্ঞাতানির্ভর প্রেক্ষিত অনুপ্রবেশ করতে না পারে। কারণ ল্যাংটন মনে করেন জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত মাত্রই তা বিষয়নিষ্ঠতার দাবি রাখে।

নীতিবিদ্যা :

বিচিত্র নারীবাদী তত্ত্বগুলিতে যে সাধারণ বিশ্বাস থেকে তত্ত্ব নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয় তা হল - পিতৃতন্ত্রের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনাগুলিতে নারীর জীবনচর্যাকে যেভাবে আকারিত করা হয়ে থাকে, তা অন্যায় এবং অন্যায়্য। মনে

^{১৮} Ibid, pp. 381-4.

করা হয় মানুষের যৌন শরীর হল তার সামাজিক অবস্থার প্রধান নির্ধারক, যার কারণে নারী সুসামঞ্জস্যভাবে পুরুষের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। ধ্রুপদী ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলি হয় নারীর এই অধীনতাকে ন্যায্য হিসাবে প্রতিপাদন করে, অথবা এই বিষয়টিকে তত্ত্বের পরিসর থেকে অদৃশ্য করে দেয়। পিতৃতান্ত্রিক নীতির প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তথাকথিত ন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারীর প্রতি পুরুষের কর্তৃত্ব বৈধরূপে স্বীকৃত হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, নারীজাতির উল্লেখের বিষয়টিকেও সম্পূর্ণভাবে ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিকতার আওতার বাইরে রেখে, তাদের স্থান নির্দিষ্ট করা হয় ঘরের এক কোণে।^{১৯}

ধ্রুপদী ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বানুসারে, ন্যায়নিষ্ঠতা (Justice) হল এমন একপ্রকার নৈতিক সদৃশ্য বা নীতি, যার দ্বারা সকল মানুষ তাদের ন্যায্য প্রাপ্যের অধিকার লাভ করে থাকে। ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলির কাজ হল যথাযথ বন্টনের প্রযুক্তি সুনির্দিষ্ট নৈতিক নীতি প্রদান করা, যার দ্বারা সমাজ-সভ্যতার বিবিধ উপকরণের সঠিক বন্টন সম্ভব হয়ে উঠবে। নারীবাদীরা ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রতি বৈষম্যের বিষয়টিকে সর্বাত্মে একটি সমস্যা হিসাবে তুলে ধরতে চান। সেই কারণে তাঁরা যৌন পার্থক্যের রাজনীতিকরণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের যুক্তি হল নারীর অধীনতা কোনো জন্মগত নিয়তি নয়, বরং এটি হল সামাজিক স্তরায়নের প্রাতিষ্ঠানিকরণের ফল। নারীবাদীদের এই যুক্তি, যৌনতা এবং ন্যায়নিষ্ঠতার সম্পর্কটিকে নতুন মাত্রায় ভাবতে শেখায়। তাঁদের উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে, নারীর জৈবিক আচরণ ও লৈঙ্গিক আচরণের কোনোপ্রকার সরল মাত্রা নেই। বাস্তবে তা হল লিঙ্গ-যৌন-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এক জটিল সমীকরণ, যা কিনা আন্তবন্ধ (interlocking) সামাজিক শক্তির দ্বারা নির্মিত। তাই নারীবাদীরা সমাজ নির্ধারিত ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক পরিসরটিকে পুনর্বিবেচনা করতে চান। এক্ষেত্রে তাঁরা যৌন পার্থক্যের সঙ্গে লিঙ্গভিত্তিক স্তরায়নের সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে দাবি করেন যে, ‘যা ব্যক্তিগত তাই

^{১৯} Elizabeth Kiss, “Justice”, in *A Companion to Feminist Philosophy*, eds. by Alison M. Jaggar and Irish Marion Young, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2000, p. 487.

রাজনৈতিক’ (the personal is political)। ক্ষমতার রাজনীতিটি নারীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে সমানুপাতেই পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে বলেই তাঁদের অভিমত। এই কারণে সকল নারীবাদী একসুরে বলে থাকেন যে, লৈঙ্গিক স্তরবিন্যাস অন্যায্য, এবং এর প্রতিকার ও বিশ্লেষণের নিমিত্ত তাঁরা নানাধরনের মত উত্থাপন করে থাকেন। যদিও তাঁরা সকলে এই ব্যাপারে সহমত যে, একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজে নারী ও পুরুষের সম অবস্থান থাকাটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।^{২০} এইস্থলে নারীবাদীরা যৌন সাম্যের আদর্শ এবং যৌন পার্থক্যের আপাত বাস্তবতা-এর মধ্যে নিহিত যে উদ্বেগ, তার উর্দে উঠে নারীর জন্য সম অবস্থান ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, লিঙ্গ সাম্যের উপায় ও লক্ষ্যটিকে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হন।

ন্যায়নিষ্ঠতা লাভের উপায় কী? লিঙ্গ অনপেক্ষ নিয়ম-নীতি, নাকি লিঙ্গ সচেতন নিয়ম-নীতি, সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নারীবাদে একাধিক বিতর্ক দেখতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত নারীবাদীরা লিঙ্গ অনপেক্ষ নিয়ম-নীতি গ্রহণ করার সপক্ষে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, তাঁরা নারীর প্রতি ভিন্ন আচরণকে লিঙ্গ সাম্যের পরিপন্থী হিসাবে মনে করেন এবং এইরূপ আচরণের দ্বারা লিঙ্গ পরিচয়ের গতানুগতিক দিকটি আরও মজবুত হয়ে যেতে পারে বলেই তাঁদের অভিমত। অপরদিকে যাঁরা লিঙ্গ সচেতন নিয়ম-নীতির প্রবক্তা, তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করেন যে, লিঙ্গ অনপেক্ষতা অবলম্বনে গড়ে ওঠা নিয়ম-নীতির দ্বারা কীভাবে নারীকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার প্রেক্ষাপট রচিত হতে পারে।

নারীবাদীদের কাছে লিঙ্গ অনপেক্ষ নিয়ম-নীতির দ্বারা বৈষম্যমূলক ফলাফল উৎপন্ন হওয়ার বিষয়টি একটি সাধারণ সমস্যা হিসাবেই গৃহীত হয়ে থাকে। ফলত যেকোনো নারীবাদী তত্ত্বকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতেই হয়। সেক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে লিঙ্গ অনপেক্ষ নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই - একথা নারীবাদীরা স্বীকার করেন না। সাম্প্রতিককালে কোনো কোনো নারীবাদী এই মতের বিরোধিতাও করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ অনপেক্ষ

^{২০} Ibid, p. 488.

নিয়ম-নীতিগুলি সংজ্ঞায়িত হয়েছে পুরুষসুলভ গুণাবলীর উপর নির্ভর করে, এবং সেখানে লিঙ্গ পার্থক্যকে দেখা হয় একটা মামুলী সমস্যা হিসাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা হয়, কেবলমাত্র অপরীক্ষিত পক্ষপাত যেখানে থাকবে, সেই ক্ষেত্রগুলিতেই বিশেষ আচরণের প্রয়োজন হতে পারে, অন্যথা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে এমনও দেখতে পাওয়া যায় যে, নারীর প্রতি বিশেষ আচরণ প্রদর্শনের বিষয়টি আসলে একধরনের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন কোনো কর্মক্ষেত্রে কম উচ্চতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবহারের সুবিধার জন্য যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করার বিষয়টিকে এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতেই পারে। যেখানে কম উচ্চতার কারণে বহু নারী, লিঙ্গ অনপেক্ষভাবে নির্ধারিত নূন্যতম উচ্চতার মাপকাটিতে অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়, জীবিকার্জনের ক্ষেত্র থেকে বহিস্কৃত হয়েছিল, তারাও যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ পাবে। উক্ত নারীবাদী মতানুসারে এটিকে নারীর প্রতি একটি বিশেষ আচরণ হিসাবে মনে করার কোনো কারণ নেই। এমন নয় যে, প্রতিষ্ঠিত কোনো নিয়ম-নীতি থেকে নারীর বিচ্যুতি ঘটেছে বলে, তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ ওইরূপ আচরণ অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত নিজেদের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার একটা কৌশল হিসাবে এটি হল একপ্রকার লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুশীলন। এর উদ্দেশ্য হল পার্থক্য বা বিভিন্নতাগুলিকে সমন্বিত করা। এই মতাদর্শীগণ যুক্তিপূর্বক দেখাতে সচেষ্ট হন যে, আইন ও নীতি কখনোই লিঙ্গ অনপেক্ষ সূত্রের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। তার পরিবর্তে এরা বৃহত্তর লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লিঙ্গ সচেতন নিয়ম-নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে নারীর প্রকৃত অসুবিধাগুলি দূর করার দাবি জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এক্ষেত্রে সাম্য বলতে, সমতা বা সমানধর্মকে নির্দেশ করা হয় না। লিঙ্গ সাম্যের ক্ষেত্রে, সাম্য বা সমতা বলতে সামাজিক উচ্চ-নীচ স্তরভেদের অভাবকেই বুঝতে হবে। নারীবাদীরা মনে করেন এটি এমন একপ্রকার অন্তর্দৃষ্টি যা লিঙ্গ প্রেক্ষিত অতিরিক্ত অন্যান্য অনেক বিষয় সম্পর্কেও প্রযোজ্য হতে পারবে।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিপাদনের উপায় হিসাবে লিঙ্গ-অনপেক্ষতা অবলম্বন করা উচিত, নাকি লিঙ্গ সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, সেই

বিতর্কের সম্পূর্ণ সমাধান না হওয়ার বিষয়টির প্রতি কিস (Elizabeth Kiss, 1961-) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। সেক্ষেত্রে লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতা লাভের একটি উপায় হিসাবে যদি দুটি বিকল্পের মধ্য থেকে কোনো একটিকে নির্বাচন করার প্রয়োজন দেখা যায়, তাহলে উক্ত বিতর্কের অবসান হওয়া আবশ্যিক। কারণ বিতর্কের মধ্যে থেকে সমস্যা সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই কিস মনে করেন। এমনকি লিঙ্গ সচেতন উপায়গুলি আদৌ লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক নাকি প্রতিবন্ধক, সেই বাদানুবাদ অদূর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থেকে যেতে পারে বলে কিস-এর পর্যবেক্ষণ।

এখন দেখা প্রয়োজন যে, নারীবাদী ন্যায়নিষ্ঠতার অনুষ্ণে লিঙ্গ প্রেক্ষিতের ভবিষ্যৎ কী? বা সহজ কথায় লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতার লক্ষ্য কী? এই প্রশ্নে কিস মনে করেন, লিঙ্গ সাম্য এবং লিঙ্গ পার্থক্যের মধ্যে যে দোলাচল, তা নারীবাদী ন্যায়নিষ্ঠতার লক্ষ্যকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লিঙ্গ পার্থক্যের বিলুপ্তিকরণ প্রয়োজন, নাকি লিঙ্গ পার্থক্যকে বহাল রাখা উচিত, সেই বিষয়টি নিয়ে নারীবাদীরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, ‘লিঙ্গ’ উচ্চ-নীচ স্তরবিশিষ্ট একটি সামাজিক নির্মাণ, যা নারীকে পুরুষানুগত করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে, তাহলে ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার জন্য ভবিষ্যতে লিঙ্গ বর্জিত সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন হবে। যেক্ষেত্রে সমাজ কাঠামো এবং চর্যাগুলি কোনও বিশেষ লিঙ্গ ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না, বা দেওয়ার সুযোগ পর্যন্তও থাকবে না। প্রকারান্তরে যে সমস্ত নারীবাদীরা লিঙ্গ সচেতন নিয়ম-নীতির সপক্ষে কথা বলেন, তাঁদের যুক্তি হল এই যে, লিঙ্গ বর্জিত সমাজ ব্যবস্থা যদি গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে লিঙ্গ সচেতন নিয়ম-নীতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। যদিও তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল লিঙ্গ ধর্মের উত্তরণ। আবার কোনো কোনো নারীবাদী বলেন যে, ভুলে গেলে চলবে না, নারীবাদের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হল, নারীর যে সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং সক্ষমতাগুলি সমাজে উচ্চ-নীচ স্তরবিশিষ্ট লিঙ্গ ব্যবস্থার অধীনে এযাবৎ অবমূল্যায়িত হয়েছে, সেগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এই কারণে তাঁরা নারীর সঙ্গে অনুষ্ণবদ্ধ চর্যা বা অনুশীলনের ক্ষেত্রগুলিকে পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

অপরপক্ষে অন্য একদল নারীবাদী এমনও মনে করেন যে, যে সমস্ত লিঙ্গ ধর্মগুলি নারীর সঙ্গে প্রথাগতভাবেই অনুষঙ্গবদ্ধ, সেই লিঙ্গ ধর্মগুলিকে বিলুপ্ত করার বা সেগুলিকে মহিমাম্বিত করার দাবির মধ্যে কোনোপ্রকার বিরোধিতাই থাকে না। উদাহরণস্বরূপ নারীর মাতৃত্ব পালনের ভূমিকাটির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করাটা নারীর চিরাচরিত একটি লিঙ্গ ধর্ম। এমন হতেই পারে যে, মাতৃত্বকে অধিক মূল্য দিয়ে বলা হল যে, একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েরই কম-বেশী সমানভাবে মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করা উচিত। এক্ষেত্রে মাতৃত্বের প্রতি বিশেষ মূল্য আরোপ করে সেটিকে মহিমাম্বিত করা হল, অর্থাৎ লিঙ্গ পার্থক্য বহাল থাকলো। আবার নারী-পুরুষ উভয়কেই সমাজে মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে - একথা বলার মধ্যে দিয়ে লিঙ্গ পার্থক্যকে বিলুপ্ত করা হল। এইরূপ আপাত বিরোধহীন কিছু সাধারণ দৃষ্টান্তকে যদি লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করাও হয়, তাহলেও লিঙ্গ ধর্মের বিলুপ্তিকরণ এবং লিঙ্গ ধর্মের পার্থক্যকে বহাল রাখার দাবিটিকে নিয়ে নারীবাদীদের যে উদ্বেগ, তা দূর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় না।

প্রসঙ্গত কিস মনে করেন যে, যে সমস্ত নারীবাদীরা, নারীর লিঙ্গ ধর্মের প্রতি অন্যায়া-অবিচারের বিষয়টিতে জোর দিতে চান, তাঁরা নারীর সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ যেকোনো অনুশীলন বা সদগুণগুলিকে সংশয়ী এবং সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, নারীর সমাজ আরোপিত লিঙ্গ ধর্মের দ্বারা সর্বদাই, হয় বাঁধাগতের যৌন পরিচয় প্রকাশ পায়, অথবা তার অধীনতার ইতিহাস ব্যক্ত হয়। এইস্থলে তাঁরা লিঙ্গ বৈষম্যের সঙ্গে ক্ষমতার বৈষম্যের যে অনুরূপতার সম্পর্ক, সেই বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে চান। বিপরীত পক্ষে যে সকল নারীবাদী, নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত অনুশীলনগুলির পুনর্মূল্যায়নের উপর নজর দেওয়ার কথা বলেন, তাঁরা ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লিঙ্গ সাম্যের আদর্শটি নারীবাদী আকাঙ্ক্ষাগুলিকে পর্যাণ্ডভাবে প্রকাশ করতে পারবে কিনা, সেই বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তাঁদের কাছে এই

সমস্যাটি নেহাৎ নারী-পুরুষের লিঙ্গ ধর্মের গুণগত মান সম্পর্কিত কোনো সমস্যা নয়। উপরন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের জীবনের গুণগত মান বিষয়ক প্রশ্ন।

কিস ন্যায়নিষ্ঠতাকে নারীবাদের একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসাবে দেখতে চান। যদিও মূলস্রোতের প্রতিষ্ঠিত ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলিকে নিয়ে নারীবাদীরা যথেষ্ট সন্দেহান, তবুও তাঁরা সবাই এটা স্বীকার করেন যে, সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে অন্যান্য-অবিচার দূর করতে হলে ন্যায়নিষ্ঠ নিয়ম-নীতির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সেক্ষেত্রে মূলস্রোতীয় ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলিকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে মনে না করার কারণ হল, ওইসব তত্ত্বগুলিতে লিঙ্গ প্রেক্ষিত এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবন চর্যাগুলিকে ন্যায়নিষ্ঠ নীতির পরিধিতে স্থান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবাই হয় না।

এমতাবস্থায় নারীবাদীদের নৈতিক উদ্বেগগুলিকে যদি মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বের পরিসরে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হয়, তাহলে ওই ন্যায়নিষ্ঠতার অনুশঙ্গে প্রযুক্ত নৈতিক যুক্তির যে ধারণা, তার পরিবর্তনও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। কারণ ধ্রুপদী নৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে যে ন্যায়নিষ্ঠতা গৃহীত হয় তা অত্যন্ত বিমূর্ত প্রকৃতির। সেক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠতা এমন ধরনের অনপেক্ষতা বা সার্বিকতার ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে যা অবাস্তব। তাছাড়াও এই ধরনের ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলিতে বন্টনের ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়, তা খুবই সংকীর্ণ প্রকৃতির হয়ে থাকে বলেই এদের অভিমত।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত নারীবাদীরা ন্যায়নিষ্ঠতাকে অধিক পরিমাণে প্রসঙ্গ নির্ভর করে তুলতে চান। তার ফলে বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষিত এবং অবস্থানগুলিকে মান্যতা দেওয়ার সুযোগ থাকবে, সেইসঙ্গে হিংসা, অবদমন, এবং সাংস্কৃতিক অন্যান্য-অবিচারগুলির প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। ন্যায়নিষ্ঠতার ধ্রুপদী ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত নারীবাদী বিশ্লেষণ থেকে এমন মনে করা ঠিক হবে না যে, নারীবাদীরা কেবলমাত্র লিঙ্গায়িত মাত্রাকেই ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বের অনুশঙ্গে যুক্ত করতে চান। এই প্রসঙ্গে কিস-এর বক্তব্য হল, নারীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যে ধরনের ন্যায়নিষ্ঠতা কাম্য বলে মনে হয়, সেখানে লিঙ্গ প্রেক্ষিতের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক প্রকার, যেমন-

শ্রেণী, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদিও আবশ্যিক মাত্রা হিসাবে যুক্ত হওয়া উচিত। ফলত নারীবাদে লিঙ্গ ছাড়া অন্যান্য সামাজিক প্রেক্ষিতগুলির দিকে কোনোরকম দৃষ্টিপাত করাই হয় না, এমন অভিযোগ নস্যাত করা যাবে। বরং লিঙ্গ প্রেক্ষিতের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক প্রেক্ষিতগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কীরূপ হতে পারে, সেই বিষয়ে নজর দিতে পারলে, ন্যায়নিষ্ঠতার এক উৎকৃষ্ট রূপ আমাদের সামনে উপস্থিত হতে পারে বলেই কিস মনে করেন। যেহেতু ন্যায়নিষ্ঠতার দ্বারাই সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তির সমানাধিকার সুরক্ষিত হয়, তাই নারীবাদীরা ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বিশেষ ধরনের যুক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও, তাঁরা নৈতিক প্রেক্ষাপটে ন্যায়নিষ্ঠতার প্রয়োজনীয়তাকে কখনোই অস্বীকার করেন না। তাঁরা চান ধ্রুপদী ন্যায়নিষ্ঠতার ধারণাটির সমালোচনাপূর্বক পুনর্নির্মাণ।^{২১}

প্রসঙ্গত কিস মনে করেন যে, ধ্রুপদী ন্যায়নিষ্ঠতার আদর্শটিকে বিকৃত না করে এবং সেই অনুসঙ্গে নারীবাদীকৃত সমালোচনাকে অতিরঞ্জিত না করেও, কীভাবে উক্ত ন্যায়নিষ্ঠতার আদর্শটির পুনর্নির্মাণ করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে নারীবাদীদের সর্বাধিক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তিনি আলোচ্য বিষয়টিকে তিনটি ভিন্ন শিরোনামে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

বিমূর্ততা বনাম প্রসঙ্গ নির্ভরতা :

কিস-এর মতে নারীবাদের সমসাময়িক ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলিতে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে ধরনের উচ্চ পর্যায়ের বিমূর্ততা লাভের দাবি জানানো হয়, তা ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিপাদনে কার্যত অনুপযোগী। এর ফলস্বরূপ সমাজবদ্ধ মানুষের সেইসকল অভিজ্ঞতা ও পার্থক্য তথা বিভিন্নতাগুলিকে অবজ্ঞা করা হয়ে থাকে, যেগুলি নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।^{২২} এই কারণেই ন্যায়নিষ্ঠতায় যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রটিকে অধিক প্রসঙ্গনির্ভর করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রের অভিমুখে যাওয়ার একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব

^{২১} “Theorist engaged in projects of criticism and reconstruction often exaggerate the contrast between their own position and the object of their critique.”, Ibid, p. 493.

^{২২} Ibid, p. 493.

হবে, যা মানুষের মূর্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্মিত, বিমূর্ত যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। নারীবাদীরা প্রতিষ্ঠিত ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলির মধ্যে থেকে এমন অনেক নিদর্শন খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন, যেখানে দেখা গেছে যে, সামাজিক সুবিধা এবং দায়-দায়িত্বগুলি বন্টিত হয় সুস্থ-সবল-প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গের নিরিখে, কিন্তু মানুষের জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপটে নিহিত নির্ভরতা বা দুর্বলতারূপ যাবতীয় মানবীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়, যেগুলি কিনা সার্বিক, এবং অপরিহার্য।

বাস্তবে পূর্বোক্ত বিমূর্ততা যেকোনো নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। ফলত নারী, ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলিতে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যই থেকে যায়, এবং তার নিজের জন্য যা কিছু ক্ষতিকারক বা প্রতারণামূলক, সেই দিকগুলিকে অন্যায় হিসাবে উপলব্ধি করাটা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই প্রসঙ্গে কিস মনে করেন, ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলির নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উচিত মানুষের জীবনের বিবিধ মূর্ত বোঝাপড়ার ক্ষেত্র থেকে। সেই কারণেই প্রসঙ্গনির্ভর বিশ্লেষণ অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। তাঁর মতে অনুপযোগী বিমূর্ততার ধারণাটিকে সমালোচনার অর্থ এই নয় যে, নারীবাদীরা যেকোনো ধরনের বিমূর্ততাকেই ন্যায়নিষ্ঠতার প্রেক্ষাপট থেকে বাতিল করতে চান, অথবা এমন দাবিও সঙ্গত নয় যে, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ সাপেক্ষে প্রসঙ্গনির্ভর বিশ্লেষণ করা হলেই অপেক্ষকৃত উৎকৃষ্ট ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্ব নির্মাণ করা সম্ভব হবে। কিস বিমূর্ততাকে যেকোনো তত্ত্বের প্রেক্ষিতেই অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গণ্য করে থাকেন। এমনকি নারীবাদী তত্ত্বগুলিকেও তিনি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলে মনে করেন না। উদাহরণস্বরূপ তিনি লিঙ্গের উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাসকে সর্বত্র চিহ্নিতকরণের বিষয়টিকে একটি শক্তিশালী বিমূর্ত ক্রিয়া হিসাবে তুলে ধরতে চান। আবার সকল মানুষের ক্ষেত্রে ‘দরদ’কে অন্যতম প্রয়োজনীয় ক্রিয়া হিসাবে গণ্য করাটাও বিমূর্ততার অপর একটি উদাহরণ হতেই পারে। এই মতানুসারে এমন দাবিকে বিমূর্ততার অন্তর্ভুক্ত করা যেতেই পারে যে, সকল মানুষের স্ব-স্বার্থের অন্বেষণ করার অধিকার আছে। এহেন বিমূর্ততাকে যদি তত্ত্বের প্রেক্ষিতে স্থান দেওয়া যায়, তাহলে প্রসঙ্গনির্ভর তত্ত্ব অপেক্ষা একটি বিমূর্ত ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্ব থেকেই নারীবাদীদের অধিক

উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে কোনো কোনো নারীবাদী মনে করেন। সেক্ষেত্রে লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতার উদ্ভূত সমস্যাটিকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখার সুযোগও থাকবে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যিক যে, ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলির যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রটিকে যখন প্রসঙ্গনির্ভর করে তোলার দাবি জানানো হয়, তখন তা কার্যত শূন্যতায় পর্যবসিত হতে পারে, যদি কোন্ প্রসঙ্গটি নৈতিক প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য, কোন্টি গ্রহণযোগ্য নয়, তা নির্বাচন করার জন্য কোনো নির্দেশিকা না থাকে। সেক্ষেত্রে নৈতিক নীতিগুলিই এইরূপ নির্দেশিকা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয় যে - ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলিতে সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগণের জীবন-যাপনের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, তাহলে এইরূপ দাবির সপক্ষে যে যুক্তিই প্রদান করা হোক না কেন, তা সাম্যতার একটি নীতিগত প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে থাকে। তা না হলে ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলিতে কেনই বা ব্যক্তিজীবনের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে, তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। সাম্যতার নীতিটি এক্ষেত্রে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। তাই এই নীতিগুলিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বলতে কী বোঝায়, সেই সম্পর্কিত কোনো ধারণা না থাকলে আমরা সেগুলিকে মূল্যায়ন করতে পারবো না। এই পর্যালোচনা থেকে বলা যেতেই পারে যে, নৈতিক প্রবণতা ব্যতীত নীতিগুলি কার্যত অর্থহীন, অপরদিকে নীতিগুলি ব্যতীত নৈতিক প্রবণতাগুলি প্রকৃতই অন্ধ।^{১৩} মানুষের নৈতিক প্রবণতা বা স্বভাবগুলি সর্বদাই নৈতিক নীতি দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। কিস প্রাণ্ডু আলোচনার ভিত্তিতে মনে করিয়ে দিতে চান যে, নারীবাদীরা নির্বিচারে বিমূর্ততার উদ্ভে প্রসঙ্গনির্ভরতাকে স্থান দিতে চাইছেন এমনটা নয়। এর পরিবর্তে তাঁরা সমালোচনাপূর্বক এটাই দেখাতে চান যে, আপাতভাবে অমায়িক বা নিষ্কলঙ্ক বলে মনে হওয়া বিমূর্ততার ধারণাটি, কীভাবে ভয়ানক নৈতিক অনবধানের জন্ম দিতে পারে। কিস-এর বক্তব্য হল এই ধরনের অনবধান দোষ দূর করতে বা সংশোধিত করতে হলে, ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিক তত্ত্বের

^{১৩} “Principles without moral dispositions may be worthless,... But without principles, moral dispositions are blind.”, Ibid, p. 494.

প্রবর্তকদের অপরাপর জীবন-যাপনের মূর্ত পরিস্থিতিগুলির প্রতি অবশ্যই মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

নৈর্ব্যক্তিক মূল্য ও সম্ভাব্যতা :

ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলিতে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে অপরিহার্য রূপে গণ্য করার মানসিকতাকে নারীবাদীরা প্রশ্নবিদ্ধ করে থাকেন। ধ্রুপদী নৈতিক তত্ত্বগুলিতে নৈর্ব্যক্তিক এবং সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই নৈতিক নীতি নির্ধারণের দাবি জানানো হয়। কোনো কোনো নারীবাদী এহেন দাবি খারিজ করে দেন। তাঁরা মনে করেন যে, সকল নৈতিক তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি আকারিত হয়ে থাকে বিশেষ বিশেষ এবং আংশিক প্রেক্ষিত দ্বারা। সুতরাং সাপেক্ষ প্রেক্ষিতকে অগ্রাহ্য করে নৈর্ব্যক্তিকতা লাভ করা অসম্ভব। অধিকন্তু তাঁরা দাবি করেন যে, এমতবস্থায় যদি নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে লাভ করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেই প্রচেষ্টাও ক্ষতিকারক ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে। যেহেতু নৈর্ব্যক্তিক মূল্যগুলি অনিবার্যভাবে সামাজিক উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাসকে আড়াল করে, এবং অবদমনকারীর স্বার্থকে চরিতার্থ করতে সাহায্য করে, তাই নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ ও সেই সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকা সার্বিকতাবাদকে নির্দোষ হিসাবে ধরে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে এই মতাবলম্বীগণ মনে করেন না। সেই কারণে ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলি থেকে উক্ত মূল্য বা আদর্শগুলিকে বাদ দিয়ে, সরাসরি মানুষের বিশেষত্ব, বিষমতা এবং আংশিক প্রকরণগুলিকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করা উচিত বলে কিস এর অভিমত। তাঁর মতে লিঙ্গ অনপেক্ষ নিয়ম-নীতিগুলিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রয়োগ করা হলে, তার দ্বারা পুরুষ বিশেষভাবে উপকৃত হলেও, নারীর ক্ষেত্রে তা নিয়মিত অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। কারণ এগুলি এমন ব্যক্তিবর্গের উপর প্রয়োগের নিমিত্ত পরিকল্পিত হয়ে থাকে, যারা কোনোদিনই অন্তঃসত্তা হতে পারবে না এবং যাদের গৃহে স্ত্রী আছে। বলাই বাহুল্য যে, এগুলি প্রযুক্ত হয় পুরুষের নিমিত্ত। সুতরাং এইপ্রকার নিয়ম-নীতির দ্বারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের অধীনস্থ নারীর সুবিচার পাওয়ার আশা করাটা নিরর্থক। সেক্ষেত্রে ধ্রুপদী ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বের অনুগামীদেরও এই বোধ থাকাটা দরকার যে, নৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বীকৃত নৈর্ব্যক্তিকতারূপ যে আদর্শ, তা আংশিক,

কখনোই সার্বিক নয়, যেহেতু এর দ্বারা পুরুষের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়, কিন্তু নারীর স্বার্থ অবহেলিত হয়। তাই কিস মনে করেন, নারীর অধীনতা নির্মূল করতে হলে এইজাতীয় স্বার্থান্বিত প্রেক্ষিতগুলিকে চিহ্নিত করাটা, নারীবাদের প্রগতির ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে কিস, নৈতিক প্রেক্ষাপটে ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে কেন্দ্র করে যে দাবিগুলি উত্থাপিত হয়ে থাকে, সেগুলির মধ্যে পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর মতে 'নৈর্ব্যক্তিকতা কখনোই সম্পূর্ণত উপলব্ধিযোগ্য নয়' এমন দাবির সঙ্গে 'সর্বাধিক নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্বদাই নৈতিকভাবে বিপজ্জনক'- এই দাবিটির পার্থক্য যথেষ্ট স্পষ্ট।²⁴ এই দুটির মধ্যে দ্বিতীয় দাবিটিকে নিয়ে কিস অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন। তিনি মনে করেন, দ্বিতীয় দাবিটির ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের ক্ষতিকারক দিকটিকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা হয়, যার পরিণামস্বরূপ নারীবাদী ন্যায়নিষ্ঠতার লক্ষ্যগুলি অবমূল্যায়িত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এইস্থলে কিস এর প্রশ্ন হল নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার অর্থ কি সর্বদাই অবদমনকারীর স্বার্থ চরিতার্থ হওয়া? তিনি নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটির সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে এই ধরনের সমালোচনাকে যথাযোগ্য বলে মনে করেন না। নারীবাদী ন্যায়নিষ্ঠতার লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত উক্ত সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি একপ্রকার অভাবনীয় এবং মাত্রাজ্ঞানহীন মন্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করেন।

কিস-এর মতে নৈতিক প্রেক্ষাপটে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে অস্বীকার করা হলে, তা দার্শনিকতার প্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত হবে না। বরং নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার ব্যাপারে সকলেরই একটা দায়বদ্ধতা থাকা দরকার।²⁵ বেশকিছু ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার চেষ্টা করাটা শুধুমাত্র ফলপ্রসূ তাই নয়, সেটি বাধ্যতামূলকও বটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো গোষ্ঠীর দলনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যেরই নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কোনো পরীক্ষক যখন পরীক্ষাপত্র মূল্যায়ন করবেন, বা যখন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমালোচনার প্রয়োজন হবে, তখন নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান গ্রহণ করাটাই

²⁴ Ibid, p. 495.

²⁵ Ibid, p. 495-6.

অভিপ্রেত। কেউ যদি কারোর প্রতি কখনো অমানবিক আচরণ করে, তাহলে লিঙ্গ-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে কাজটিকে অনৈতিক হিসাবে চিহ্নিত করাটাই বাঞ্ছনীয়। বরং কোথাও যদি স্বজন-পোষণ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচারের দাবি জানানো উচিত বলেই কিস এর অভিমত। তাঁর মতে যদি নারীবাদী ন্যায়নিষ্ঠতার লক্ষ্য হয় - নৈতিকতা ও সামাজিক জীবনচর্যায় প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্তি, তাহলে তা পূরণ করার জন্য এমন নীতি প্রণয়ন ও অনুশীলনের প্রয়োজন, যা বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা বা পরিচয় নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়নিষ্ঠতা প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে নারীবাদী ন্যায়নিষ্ঠতার প্রেক্ষাপটে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি তখনই গড়ে উঠবে, যখন সেখানে সমাজে বসবাসকারী সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হবে। এই নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে নৈর্ব্যক্তিক বলা যেতেই পারে কারণ, এটি কোনো ব্যক্তিকেই অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয় না। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নৈর্ব্যক্তিক আদর্শটির পুনর্নির্মাণ ঘটে থাকে, যেখানে ন্যায্যতা প্রতিপাদনের প্রয়োজনে বিভিন্নতাগুলির প্রতি মনোযোগী হওয়াটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।^{২৬} এইরূপ বিভিন্নতা এবং উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাসের বাস্তব পরিস্থিতিতে কোনো তত্ত্বায়ন করতে হলে, নারীবাদীদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত বলে কিস মনে করেন। যদিও নৈতিক প্রেক্ষাপটে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটি সর্বদাই বিপজ্জনক, এমন দাবি তিনি নস্যাত্ন করে দেন, এবং নারীবাদী ন্যায়নিষ্ঠতার আদর্শ প্রতিস্থাপনে নৈর্ব্যক্তিকতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই প্রসঙ্গে কিস-এর বক্তব্য হল, নৈতিকতার পরিসরে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে পরিহার করলে, সুবিচার বা ন্যায়নিষ্ঠতার দাবিটিকেও ত্যাগ করতে হবে।

বন্টনের রাজনীতি ও ন্যায়নিষ্ঠতা :

নারীবাদীগণ ধ্রুপদী ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনাপূর্বক দাবি করেন যে, ওই তত্ত্বগুলিতে বন্টনের বিষয়টিকে নিয়ে যে ধরনের মানসিকতা লক্ষ করা যায়, তা খুবই সংকীর্ণ প্রকৃতির। তার ফলে অন্যায-অবিচারের নানান গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অস্পষ্টই থেকে যায়। ইদানীং সমসাময়িক ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলিতে সামাজিক নানা অধিকার

^{২৬} “It reconstruct motions of impartiality by stressing that fairness requires that we be mindfull of difference”, Ibid, p. 496.

ও সম্পদের বন্টন প্রাথমিকভাবে যথেষ্ট গুরুত্ব পেলেও, অর্থনৈতিক বন্টনের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটে না। বিশেষত লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আরও জটিল রূপ ধারণ করে। সেক্ষেত্রে নারীবাদীদের পক্ষে, নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক মূল্য ও অর্থগুলির রূপান্তর ঘটিয়ে সেগুলিকে একটি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসে, অর্থনৈতিক পুনর্বন্টনের দাবি জানানোটা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ বলেই কিস মনে করেন। অন্যায়-অবিচারের নানান রূপ যেমন শোষণ (exploitation), প্রান্তিকীকরণ (marginalisation), ক্ষমতাহীনতা (powerlessness), সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ (cultural imperialism), এবং হিংসা (violence) ইত্যাদি বন্টনের পদ্ধতিতে পর্যাণ্ডভাবে ধরা না পড়ার কারণে, কোনো কোনো নারীবাদী উক্ত অন্যায়-অবিচারগুলি দূর করার অভিপ্রায়ে ন্যায়নিষ্ঠতার একটি পৃথক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিস ন্যায়নিষ্ঠতার দুই ধরনের দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। একটি হল পুনর্বন্টনমূলক ন্যায়নিষ্ঠতা (redistributive Justice), এবং অপরটি হল স্বীকৃতিমূলক ন্যায়নিষ্ঠতা (Justice as recognition)। এক্ষেত্রে পুনর্বন্টনমূলক ন্যায়নিষ্ঠতার উদ্দেশ্য হল সামাজিক অসাম্য এবং উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাসকে অতিক্রম করে যাওয়া, কিন্তু স্বীকৃতিমূলক ন্যায়নিষ্ঠতার ক্ষেত্রে বিশেষত্বগুলিকে নিশ্চিতকরণ ও পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অবদমনগুলিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করা হয়। যেমন, সামাজিক কল্যাণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত অধিকারগুলির দাবি হল পুনর্বন্টনমূলক দাবির দৃষ্টান্ত। আবার সমকামী গোষ্ঠীর পক্ষে জনমানসে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার যে প্রচেষ্টা, সেটিকে স্বীকৃতিমূলক রাজনীতির উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যেতেই পারে। এইস্থলে যে সকল মানুষজন উল্লিখিত উভয় প্রকারের অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়ে থাকেন, তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই দ্বিধাগ্রস্ততার মধ্যে আসলে, ‘লিঙ্গপ্রেক্ষিত বাতিল করার প্ররোচনা’ এবং ‘লিঙ্গ পার্থক্যকে বহাল রাখার দাবি’ নিয়ে নারীবাদীদের মধ্যে যে উৎকর্ষা, তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বলেই কিস-এর অভিমত। যদিও কিস

উক্ত দুই ধরনের দাবির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, একটিকে অপরটির পরিপন্থী হিসাবে না দেখে, সহায়ক হিসাবে দেখতে চান। তার ফলে কোনোটির দ্বারা অন্যটির অবমূল্যায়নের সম্ভাবনা দূর হবে, এবং সুবিচারের পথ প্রশস্ত হবে।

এইস্থলে যাঁরা মূলস্রোতের ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলির বন্টন কাঠামোর প্রবক্তা, তাঁদের বক্তব্য হল - যদি অধিকার এবং অর্থনৈতিক সম্পদগুলির ন্যায্য বন্টন করা যায়, তাহলে পূর্বে উল্লিখিত অন্যায়-অবিচারগুলির অবসান ঘটানো সম্ভব। কিস এই মতামতটিকে অন্তত আংশিক সত্য হিসাবে মেনে নেন, এবং ন্যায়নিষ্ঠতার দুই ধরনের দৃষ্টান্ত ও বন্টন কাঠামো সংক্রান্ত নারীবাদী সমালোচনা ও আন্তর বিবাদগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে, লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিপাদনের উপর জোর দেন। সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে নারীর ক্ষমতাহীনতা, হিংসা, সাংস্কৃতিক অবদমন ইত্যাদি অন্যায়গুলির প্রতিকারের প্রচেষ্টা, অন্তত আংশিকভাবে হলেও সম্পদের পুনর্বন্টনের মাধ্যমে করা সম্ভব হতে পারে বলে কিস মনে করেন। তাঁর মতে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণত যে ধরনের ন্যায়নিষ্ঠতার দাবি জানানো হয়, তা প্রকৃতপক্ষে পুনর্বন্টনমূলক ন্যায়নিষ্ঠতার ইঙ্গিতবাহী, যেখানে লিঙ্গ ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক সুবিধা, আভিজাত্য, এবং স্বরের যে বন্টন কাঠামো তার পরিবর্তন ঘটে থাকে।^{২৭}

কিস এমন মনে করেন না যে, সম্পদের যথাযথ বন্টন হলেই সমাজ থেকে সমস্ত অন্যায়-অবিচার দূরীভূত হবে। সমকামীদের প্রতি অত্যাচার, নারীর প্রতি অবদমনমূলক মনোভাব ইত্যাদি সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র সম্পদের যথাযথ বন্টনের মাধ্যমে করা সম্ভবপর নয়। কারণ যে সমস্ত হিংসা ও হয়রানিগুলি ব্যাপক অনুশীলনের দরুন তা বহু সংখ্যক মানুষের সামাজিক আভিজাত্য ও স্বর নির্ধারণের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে, এবং যেগুলির দ্বারা উচ্চ-নীচ স্তরবিশিষ্ট সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বের পরিসরে আবশ্যিকভাবেই বিদ্যমান থাকে। অথচ প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতি সংঘটিত উক্তপ্রকার হিংসার ক্ষেত্রগুলি ভীষণভাবে অবহেলিত হয়। তাই প্রচলিত বন্টন কাঠামোর উর্দে উঠে লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নতুন করে

^{২৭} “...in a general sense feminist demands for justice are demands for redistribution - demands, that is, to change a gendered distribution of social benefits, status and voice.”, Ibid, p. 497.

ভাবনা-চিন্তা করার যে আহ্বান, তার দ্বারা ন্যায়নিষ্ঠতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার ব্যাপারে কিস যথেষ্ট আশাবাদী।

প্রসঙ্গত কিস আরও মনে করেন যে, সাংস্কৃতিক এবং সাংকেতিক অন্যায়গুলির প্রতিকারের প্রচেষ্টার মধ্যেও বন্টনের কাঠামো অতিক্রম করে যাওয়ার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে এই ধরনের অন্যায়গুলি দূর করার জন্য কলঙ্কিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সামাজিক স্তর ও আভিজাত্যগুলিকে পুনর্বন্টন করা প্রয়োজন, নাকি ব্যাখ্যা ও কথোপকথনের মাধ্যমেই তাদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা যাবে, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যিক। মনে রাখতে হবে সাংস্কৃতিক কলঙ্ক বা মর্যাদা বলতে আমরা যা বুঝি, সেই ধারণাগুলির একটি স্বতন্ত্র মৌলিক উপাদান আছে, যেগুলি বন্টনের পরিভাষায় অনুদিত হলে সহজেই হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণে মানুষের বিভিন্ন অবস্থাগুলির প্রতি যে অন্যায়-অবিচার হয়ে থাকে, সেগুলিকে চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের প্রচেষ্টা করতে চাইলে, তাদের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা ও অভিজ্ঞতাগুলিকে তত্ত্বের প্রেক্ষিতে আবশ্যিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।^{২৬} তাই কিস ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বগুলির মধ্যে সামাজিক প্রেক্ষাপটগুলির অংশীদারিত্বের বিষয়টিকে অপরিসীম মূল্য প্রদান করে থাকেন। একইসঙ্গে তিনি, ক্ষমতার বিন্যাসগুলি ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বে কীভাবে উপেক্ষিত হয়ে থাকে, সেই বিষয়ে নারীবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। এই প্রসঙ্গে তাঁর পরামর্শ হল ন্যায়নিষ্ঠতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক অন্তহীন বাদানুবাদের মধ্যে প্রবেশ না করে, নারীবাদীদের লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিচল থাকা উচিত। তা না হলে নৈতিক প্রেক্ষাপটে নারীবাদী ন্যায়নিষ্ঠতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির অযাচিত অবমূল্যায়ন ঘটে যাবে।

ন্যায়নিষ্ঠতা বিষয়ক নারীবাদী পর্যালোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যেতেই পারে যে, উচ্চ-নীচ স্তরবিশিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার জন্য, নারী-পুরুষের লিঙ্গ ধর্মের সমান মর্যাদা থাকা আবশ্যিকভাবেই প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে নারীবাদীরা চান ন্যায়নিষ্ঠতার পরিধিটিকে প্রসারিত করতে। সেই প্রক্রিয়া

^{২৬} Ibid, p. 497.

বিভিন্ন নৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বগুলিতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতার লক্ষ্য কী হবে? এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কোন্ কৌশল বা উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, নারীবাদীরা সেই বিষয়ে নিজেদের মতামতগুলি যথেষ্ট স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। যদিও কিস মনে করেন ন্যায়নিষ্ঠতার আদর্শটিকে নৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বাতিল করা, বা সেটির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার মতো পদক্ষেপগুলি নারীবাদী লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং সেগুলি বিপরীত ফলাফলেরও জন্ম দিতে পারে। বরং ন্যায়নিষ্ঠতা প্রসঙ্গে সমালোচনামূলক যুক্তি বা পুনর্নির্মাণের পন্থাগুলি আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে বলে কিস-এর অভিমত।^{২৯}

নারীবাদী ন্যায়নিষ্ঠতার প্রগতি অব্যাহত রাখতে কিস মূলত তিনটি ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছেন।

প্রথমত : নারীবাদীদের অধিক ন্যায্য এবং স্পষ্টভাবে স্বমত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। অতিকথনের ফলে মনোগ্রাহী যুক্তিগুলি যেন গুরুত্ব হারিয়ে না ফেলে সেদিকে নজর দিতে হবে। প্রতিতুলনায় সমাপতিত বা অসম্মতির ক্ষেত্রগুলিকে আরও ভালোভাবে চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়াটি নারীবাদী যুক্তিগুলিকে পরিমার্জিত ও স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয়ত : সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রগুলিতে নারী এবং সুবিধা বঞ্চিত অন্যান্য গোষ্ঠীর উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত পরিবর্তনের সপক্ষে সুনির্দিষ্টভাবে সুপারিশ করতে হবে। এর মাধ্যমে ন্যায়নিষ্ঠতা বিষয়ক নারীবাদী পর্যালোচনার ক্ষেত্রটি অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

তৃতীয়ত : লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতা অর্জনের প্রচেষ্টায় নারীবাদী তত্ত্বগুলিকে নীতিগত এবং প্রয়োগিক সীমাবদ্ধতাগুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। তার ফলে ন্যায়নিষ্ঠতা সম্পর্কিত নারীবাদী মতামত সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারবে।

^{২৯} “arguments criticizing and reconstructing approaches to justice have yielded interesting insights.”, Ibid, p. 498.

এতদতিরিক্তভাবে কিস মনে করেন, প্রায়োগিক ক্ষেত্রটিতে ন্যায়নিষ্ঠতার অনুসন্ধান করাটাই নারীবাদী প্রকল্পের মুখ্য উপজীব্য। কিস যেহেতু লিঙ্গ ন্যায়নিষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাই তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ভিন্নতা বা বিষমরূপিতাকে নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদনযোগ্য উপাদান হিসাবে স্বীকার করে নিলেও, চূড়ান্ত পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকেই অগ্রাধিকার দিতে চাইছেন। তিনি ভিন্নতার জন্য ভিন্নতাকে স্বীকার করার পক্ষপাতী নন। কারণ সেক্ষেত্রে সাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে, ফলে সুবিচার বা ন্যায়নিষ্ঠতার আশাও ত্যাগ করতে হবে। কিস নৈর্ব্যক্তিকতার সমর্থক হলেও, ধ্রুপদী মতাদর্শীদের মতো অন্ধ সমর্থক নন। তাই বিনাবিচারে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে তিনি ন্যায্যতা প্রতিপাদনের যথাযথ মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করবেন না। তাঁর মতে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে বিচারপূর্বক সুচিন্তিতভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সুবিচার দেওয়া সম্ভব হয়। এইভাবে বিভিন্নতাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েও কীভাবে সুবিধা বা ন্যায়নিষ্ঠতা প্রদান করা যায়, সেই লক্ষ্যে কিস রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্বিন্টনের নীতিটিকে গ্রহণ করেছেন। তিনি এই নীতিটির সাহায্যে বিভিন্ন প্রান্তিক অবস্থান বা প্রেক্ষিতগুলিকে সহযোগিতার মাধ্যমে নারী তথা সকল প্রান্তিক গোষ্ঠীর শোষণের মাত্রাগুলিকে দূর করার আশা রাখেন, এবং দেখতে চান যে, ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিকতার আওতায় ভিন্নতাগুলির যথাযথ প্রতিফলন সম্ভব হচ্ছে কি না।

যুক্তিবিজ্ঞান :

উদারপন্থী নারীবাদীদের যুক্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনো স্বতন্ত্র তত্ত্ব অন্তত নীতিগত বা কৌশলগত দিক থেকে প্রদত্ত হওয়ার কথা নয়, বা তেমন কোনো দৃষ্টান্তের সন্ধান নারীবাদী দর্শনে পাওয়া যায় না। এটা মনে রাখা আবশ্যিক যে, উদারপন্থী নারীবাদে তাত্ত্বিক স্তরে কোনো দোষ স্বীকৃত নয়। যাবতীয় দোষ তথ্যভূমিতে এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তাই কোনো মূলস্রোতীয় তত্ত্বকেই তাঁরা অযথা সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তাঁদের নীতি হল প্রচলিত তত্ত্ব-কাঠামোতে নারীর লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধানের বন্দোবস্ত করা। তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করার মধ্য দিয়ে, যাবতীয় অনবধানগুলি দূর করে, উপযুক্ত

তত্ত্ব-কাঠামোতে নারীর অন্তর্ভুক্তিই তাঁদের কাম্য লক্ষ্য। অনুরূপভাবেই মূলস্রোতে প্রচলিত আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানের যে কাঠামো, তার পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে বলে উদারপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন না। যেহেতু তাত্ত্বিক স্তরে কোনোপ্রকার লিঙ্গ পক্ষপাত এদের নজরে পড়ে না, তাই যুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অবশ্য উদারপন্থী নারীবাদীরা একথা মানেন যে, সব তত্ত্বেরই কোনো না কোনো যৌক্তিক ভিত্তিভূমি থাকে, বা সেগুলি যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতির দ্বারা আবশ্যিকভাবেই প্রভাবিত হয়ে থাকে। ওইসব যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি যদিও বা দৃশ্য হয়, কিন্তু কখনোই ত্যাজ্য নয়।

দর্শনের জগতে আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞান বলতে সাধারণত অ্যারিস্টটল প্রদত্ত আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের কথাই ধরা হয়। এই যুক্তিবিজ্ঞান আকারগত, কিন্তু আকারসর্বস্ব নয়। মূর্ত বিষয়গুলিকে বিমূর্ত নিয়ম-নীতির মাধ্যমে বিচার করে বৈধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই হল এইজাতীয় যুক্তিবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বি-মানবিশিষ্ট, দ্বি-কোটিক যৌক্তিক কাঠামো প্রদান এবং পূর্বতসিদ্ধ চিন্তনবিধি প্রণয়ন এই যুক্তিবিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মূলস্রোতীয় যুক্তিবিজ্ঞান বলতে সাধারণত অ্যারিস্টটল প্রদত্ত যুক্তিবিজ্ঞানকে বোঝানো হলেও সেক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামোর হৃদিশ পাওয়া যায়। যদিও সেগুলির কোনোটি অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণত উপেক্ষা করে নিজেদের স্বতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, এমন কোনো নজির নেই। যাই হোক এক্ষেত্রে তা প্রাসঙ্গিক নয়, তাই সেই আলোচনায় ইতি টানা ভালো। এইস্থলে আবশ্যিক হল, দ্বি-মান ও দ্বি-কোটিক চিন্তা প্রকাশক মৌলিক নীতিগুলির পর্যালোচনা, যেগুলিকে সমগ্র দর্শনের জগতে অ্যারিস্টটলের এক অনবদ্য অবদান হিসাবে স্বীকার করা, এবং মান্যতা দেওয়া হয়। অ্যারিস্টটল প্রদত্ত ওইসব চিন্তার আকার বা বিধিগুলি অধুনা ‘চিন্তার নিয়ম’ (Laws of Thought)^{৩০} নামে খ্যাত।

^{৩০} Richard Mckeon, ed., *Aristotle*, The Modern Library, New York, 2001, pp. 731-51.

দর্শনের জগতে মূলত তিনটি চিন্তার নিয়মের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা তাদাত্ম্য নিয়ম (Law of Identity), বিরোধ-বাধক নিয়ম (Law of Non-Contradiction), এবং নির্মাধ্যম নিয়ম (Law of Excluded Middle)। যদিও অ্যারিস্টটল এগুলিকে 'নীতি' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারীদের হাত ধরে সেগুলি 'নিয়ম' রূপে প্রসিদ্ধ হয়। এই মৌলিক চিন্তন কাঠামো দ্বারাই মানুষের ভাবের আদান-প্রদান চলে। মানুষের বহু-বিচিত্র চিন্তা-ভাবনাগুলি কোনো না কোনো চিন্তার নিয়মকে অনুসরণ করে বলেই, একে-অপরের সঙ্গে ভাববিনিময় সম্ভব হয়। উদারপন্থী নারীবাদীরা অ্যারিস্টটলের মতো করেই মানুষকে যৌক্তিক জীব হিসাবে দেখতে চান। এক্ষেত্রে যৌক্তিক হওয়ার লক্ষণ হল নিয়মনিষ্ঠ হওয়া। তাই মানুষের চিন্তার সীমানা এবং সীমাবদ্ধতা চিন্তন নিয়মের অনুগামী হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। আমরা জানি, চিন্তন থেকেই বিশ্বাস এবং জ্ঞান গঠিত হয়। সুতরাং যে বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা যায় না, সেই বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা কখনোই সম্ভবপর হতে পারে না।

আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানের উক্ত চিন্তন-এর নিয়মগুলি, চিন্তার যাবতীয় উপাদান বা বিষয়কে দুটি নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট কোটিতে ভাগ করে। এই কারণে আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানকে দ্বি-কোটিক যুক্তিবিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এর একটি কোটি হল 'p', এটি হল ভাবকোটি এবং অপর কোটি হল '~p' যেটা কিনা অভাবকোটি। ফলে যা কিছু সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি বা যা আমাদের চিন্তায় গৃহীত হয়, সেই বিষয়গুলি হয় ভাবকোটির সদস্য অথবা অভাবকোটির সদস্য হবে। এই দুই অবস্থার অতিরিক্ত কোনো অবস্থা স্বীকৃত নয়। জগতের যাবতীয় পদার্থ সর্বদাই এই দুই কোটির মধ্যে কোনো একটিতে অবস্থান করে। এইরূপ স্পষ্টভাবে নির্ধারিত দুটি কোটির বাইরে কোনো কিছুই অবস্থান থাকতে পারে না। একইসঙ্গে এইপ্রকার যুক্তিবিজ্ঞানকে দ্বি-মানবিশিষ্ট যুক্তিবিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে। কারণ 'p' এবং '~p' অর্থাৎ ভাবকোটি এবং অভাবকোটি এই দুটির মধ্যে একটি যদি সত্য হয়, তাহলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হবে। সত্য ও মিথ্যা ছাড়া অন্য কোনো মান এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়। এখানে অনেকান্ততা, অস্পষ্টতা, বা সম্ভাব্যতার কোনো স্থান নেই। চিন্তার বিভিন্ন উপকরণগুলিকে নিয়ে

জাগতিক অনুসন্ধান, বিচার-বিশ্লেষণ ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে, যতক্ষণ এগুলিকে দ্বি-মান বা দ্বি-কোটির মধ্যে নির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা না যায়।

অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে উক্ত তিনটি চিন্তার নিয়মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

তাদাত্ব্য নিয়ম (Law of Identity) :

চিন্তন-এর তাদাত্ব্য নিয়ম অনুযায়ী কোনো একটি বচন কেবলমাত্র নিজের সঙ্গে তাদাত্ব্য সম্বন্ধে থাকতে পারে, অন্য কোনো বচনের সঙ্গে নয়। এই নিয়মের সাংকেতিক আকারটি হল $(p \supset p)$ । তাদাত্ব্যক নিয়মের সাংকেতিক আকারটিকে যদি কোনো মূর্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতেই পারে যে, কোনো ব্যক্তি কেবল নিজের সঙ্গেই তাদাত্ব্যক হতে পারবে, অন্য কারোর সঙ্গে নয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি একইসঙ্গে 'p' এবং '~p' হতে পারবে না। কারণ দুটি কোটি সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট। সেক্ষেত্রে কোনো কিছুকে 'p' বলে ধরে নেওয়া হলে, সেটি ছাড়া বাকি সবকিছুই '~p' তে অবস্থান করবে। এইস্থলে কারোর পক্ষে এরকম চিন্তা-ভাবনা করা অসম্ভব যে, 'p' এবং '~p' একইসঙ্গে অবস্থান করছে। তাহলে মেনে নিতে হবে যে, কোনো কিছু নিজেকে ছাড়া অপরের সঙ্গেও তাদাত্ব্যক হতে পারে। যৌক্তিকভাবে এইপ্রকার চিন্তা করতে পারাটা অসম্ভব। তাছাড়াও যদি সত্যমূল্যের নিরিখে বিচার করা হয়, তাহলে কোনো বচন একইসঙ্গে সত্য এবং সত্য নয়, এমনটা কখনোই হতে পারে না। সুতরাং 'p' যদি সত্য হয় তাহলে $(p \supset p)$ অবশ্যই সত্য হবে এবং এইজাতীয় বচনগুলি সর্বদাই স্বতঃসত্য।

বিরোধ-বাধক নিয়ম (Law of Non-Contradiction) :

বিরোধ-বাধক নিয়ম অনুযায়ী কোনো একটি বচন ও তার বিরোধী বচন একইসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। এই নিয়মের সাংকেতিক আকারটি হল '~(p.~p)'। অর্থাৎ কোনো কিছু 'p' এবং '~p' এই দুটি কোটিতে একইসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। মূর্ত উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয় - 'এই গাছটি সবুজ এবং সবুজ

নয়', তাহলে সেক্ষেত্রে বিরোধ-বাধক নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। কারণ কোনো কিছু 'সবুজ' এবং 'সবুজ নয়' - এই দুটি কোটিতে একইসঙ্গে, একইসময়ে অবস্থান করতে পারবে না। এইজাতীয় চিন্তা অস্পষ্ট, ফলে বোধগম্য নয়। একইভাবে যদি সত্যমূল্যের দিক থেকে চিন্তা করা হয়, তাহলে এমন ভাবটা অসম্ভব যে - কোনো বচন একইসঙ্গে সত্য ও মিথ্যা উভয়ই হতে পারে। সুতরাং (p~p) সর্বদাই মিথ্যা হবে। কারণ এক্ষেত্রে বিরোধ-বাধক নিয়মের লঙ্ঘন হয়। তাই এটিকে স্ব-বিরোধী বলা যেতে পারে। যদিও ~p~p) কিন্তু সর্বদাই সত্য। এটির অর্থ হল, এমন নয় যে, কোনো কিছু একইসঙ্গে সত্য এবং মিথ্যা উভয়ই হতে পারে। এই নিয়মের ভিত্তিতে, গৃহীত মূর্ত উদাহরণটির ক্ষেত্রে বলা যায়, এমন নয় যে, গাছটি সবুজ এবং সবুজ নয়। এইজাতীয় বচনগুলিও সত্য এবং সর্বদাই স্বতঃসত্য।

নির্মাধ্যম নিয়ম (Law of Excluded Middle) :

চিন্তার নির্মাধ্যম নিয়ম অনুযায়ী কোনো বচন অথবা তার বিরোধী বচন একইসঙ্গে অবস্থান করতে পারবে না। অর্থাৎ কোনো বচন হয় 'p' হবে অথবা '~p' হবে। কিন্তু একইসঙ্গে 'p' এবং ~p হতে পারবে না। এই নিয়মের সাংকেতিক আকারটি হল (pv~p)। এক্ষেত্রে সমস্ত কিছু হয় 'p' কোটির অথবা '~p' কোটির সদস্য হবে। মূর্ত উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'ফুলটি হয় লাল অথবা লাল নয়'। এক্ষেত্রে নির্মাধ্যম নিয়ম অনুসরণ করে স্পষ্টভাবেই চিন্তা করা যায় যে, 'ফুলটি হয় লাল হবে অথবা লাল হবে না'। সত্যমূল্যের দিক থেকে ভাবলে বলা যেতে পারে যে, নির্মাধ্যম নিয়ম অনুযায়ী সকল বচন হয় সত্য হবে অথবা মিথ্যা হবে। কখনোই একইসঙ্গে সত্য ও মিথ্যা হতে পারবে না। এইস্থলে সত্য ও মিথ্যা এই দুটি মানের মধ্যে কোনোরকমের অস্পষ্টতা নেই।^{৩১} সুতরাং (pv~p) আবশ্যিকভাবেই সত্য এবং এইজাতীয় সকল বচনই স্বতঃসত্য।

^{৩১} "The principle of excluded middle has been the object of much criticism on the grounds that it leads to a "two valued orientation", ...", I.M. Copi and Carl Cohen, *Introduction to Logic*, Prentice-Hall of India, New Delhi, 2004, p. 345.

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে, মানুষের যাবতীয় চিন্তা, উক্ত তিনটি চিন্তন-এর নিয়মকে অনুসরণ করে এবং সেই মতোই চালিত হয়। চিন্তার এই নিয়মগুলির মধ্য দিয়েই আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বি-কোটিক বিভাজন এবং দ্বি-মানবিশিষ্ট মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রকট হয়ে ওঠে। উদারপন্থী নারীবাদীরা দ্বি-কোটিক বা দ্বি-মানবিশিষ্ট আকারগত যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামো নিয়ে ভাবিত নন। এমনকি সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা বিকল্প যুক্তি বৈজ্ঞানিক কাঠামোও চান না। প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে থেকেই তাঁরা লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান চান এবং ঘৃণ্য লিঙ্গ রাজনীতির ফলস্বরূপ লিঙ্গ পার্থক্য কীভাবে লিঙ্গ বৈষম্যে পর্যবসিত হয়ে যায়, সেই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁরা মনে করেন যে, ক্ষমতার রাজনীতির কারণেই পুরুষসুলভ গুণগুলি ভাবকোটিতে স্থান পায় এবং মূল্যবান রূপে পরিগণিত হয়। অপরপক্ষে নারীসুলভ গুণগুলির স্থান হয় অভাবকোটিতে এবং সেগুলির অবমূল্যায়ন ঘটে যায়। ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বি-কোটি এবং দ্বি-মান উভয়ই নির্দিষ্ট। সেক্ষেত্রে ক্ষমতার জোরে পুরুষের লিঙ্গ ধর্ম যেহেতু সর্বদাই 'p' কোটিতে স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়, ফলত মূল্যবিচারে সেই লিঙ্গ ধর্মগুলি উৎকৃষ্ট হিসাবে বিবেচিত হয়। বিপরীতে নারীর লিঙ্গ ধর্ম হল সর্বদাই '~p', তাই মূল্যবিচারে সেগুলি নিকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

উদারপন্থী নারীবাদীদের প্রশ্ন যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বি-মাত্রিক কাঠামোকে নিয়ে নয়। তাঁদের প্রশ্ন বিভাজন নীতিটিকে নিয়ে। কারণ চিন্তন নিয়ম অনুসারে যা 'p' তা কখনোই '~p' হতে পারবে না, এবং যা '~p' তা কখনোই 'p' হতে পারবে না। সুতরাং ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বি-মাত্রিক কাঠামোর সৌজন্যে নির্ধারিত কোটি এবং নির্দিষ্ট মান বা মূল্যের স্থানান্তরকে চিন্তার অগম্য একটি বিষয় হিসাবে ধরে নিতে হবে। যদিও নারীবাদীরা এই প্রক্রিয়াটিকে অসাধ্য বলে মনে করেন না। কারণ তাঁরা লিঙ্গ উত্তরণের পক্ষপাতী। তাই যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামোর কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে, উদারপন্থী নারীবাদীরা চান নারীর লিঙ্গ লাঞ্ছিত গুণগুলিকে পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামোর যথোপযুক্ত স্থানে অন্তর্ভুক্তি। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামোর পুনর্নির্মাণে আগ্রহী।

প্রাণ্ড আলোচনায় দর্শনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় নারীবাদী চিন্তাধারার যে পরিচয় পাওয়া গেল, তার ভিত্তিতে উদারপন্থী নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্ব গঠনের সহায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদারপন্থী নারীবাদ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সেখানে আধিবিদ্যক অবস্থানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-এর উপর জোর দিয়ে, লিঙ্গ উত্তরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব-কাঠামোতে নারীর লিঙ্গায়িত গুণগুলিকে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানো হয়ে থাকে। জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে তাঁরা যুক্তির প্রাধান্যকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রটিতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। একইভাবে নৈতিকতায় তাঁরা ন্যায়নিষ্ঠতার পক্ষপাতী, এবং কোনো না কোনোভাবে নৈর্ব্যক্তিকতার দাবিটিকে বহাল রাখতে চান। এমনকি ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বি-মাত্রাবিশিষ্ট কাঠামো নিয়ে তাঁদের কোনো আপত্তি লক্ষ করা যায় না, কিন্তু নারীসুলভ গুণগুলিকে সর্বদাই অভাবযুক্ত হিসাবে মনে করার পিছনে যে লিঙ্গ রাজনীতি রয়েছে, সেই ব্যাপারে তাঁরা সর্বক্ষেত্রেই সহমত পোষণ করে থাকেন। ফলস্বরূপ প্রাথমিক পর্যায়ে সাপেক্ষতাকে স্বীকৃতি দিলেও, 'সাপেক্ষতাবাদ' প্রতিষ্ঠিত হোক এমনটা তাঁরা চান না। লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠাই তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেই কারণে উদারপন্থী নারীবাদীরা প্রতিষ্ঠিত ধ্রুপদী দার্শনিক তত্ত্ব-কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দাবি জানান না। পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে তত্ত্ব-কাঠামোর পরিধির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে নারীসুলভ গুণগুলির স্থান সুনিশ্চিত করাই তাঁদের একমাত্র অভিপ্রায়।

চতুর্থ অধ্যায়

চরমপন্থী নারীবাদী দর্শন ও দার্শনিক তত্ত্ব

আধুনিক ধ্রুপদী দর্শনের চিরাচরিত চিন্তাধারাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে জন্ম নেয় উত্তর-আধুনিকতাবাদ। দর্শনচর্চায় যুক্তির ভূমিকাকে খর্ব করা, এবং দর্শনসম্মত কোনো তত্ত্ব রচনার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা গড়ে তোলেন নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়। এই উত্তর-আধুনিকতাবাদের দোসর হল চরমপন্থী নারীবাদ। উদারপন্থী নারীবাদীদের রক্ষণশীল মনোভাবের সমালোচনা করে গড়ে ওঠে এই বিশেষ নারীবাদী চিন্তাধারা। এদের লক্ষ্য ছিল যেকোনো তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে যুক্তির আধিপত্যকে খারিজ করে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নারীর লিঙ্গ সমস্যার সমাধানের পথনির্দেশ করা। কী উপায়ে তা সম্ভব হতে পারে বুঝতে হলে চরমপন্থী নারীবাদীদের আধিবিদ্যক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আধিবিদ্যা :

চরমপন্থী নারীবাদীরা তাঁদের আধিবিদ্যক অবস্থান থেকে নারী-পুরুষের দুটি পরিচয় স্বীকার করেন, একটি হলো যৌন পরিচয় এবং অপরটি হল লিঙ্গ পরিচয়। সাধারণত মনে করা হয় যে, মানুষের যৌন পরিচয় জৈবিকভাবে নির্ধারিত, এবং লিঙ্গ পরিচয় সামাজিকভাবে আরোপিত। চরমপন্থী নারীবাদীরা এই মত সম্পূর্ণত সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন যে, মানুষের যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয়-এর মধ্যে যে সম্পর্ক তা একমুখী নয়। উভয় পরিচয়ই একে-অপরকে প্রভাবিত করে, এবং তার মধ্য দিয়েই নির্মিত হয় মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। চরমপন্থী নারীবাদীরা যৌন ও লিঙ্গ পরিচয় অতিরিক্ত কোনো অনপেক্ষ মানবধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁদের দাবি হলো, কোনো মানুষের পক্ষে লিঙ্গ পরিচয়কে ত্যাগ করা, অথবা লিঙ্গ পরিচয় এর উত্তরণ ঘটানো কোনোটাই সম্ভব নয়। তাই বলে এমনটাও মনে করার কোনো কারণ নেই যে, জন্মসূত্রেই প্রোথিত হয়ে থাকে নারী-পুরুষের সৃজিত লিঙ্গ ধর্মের বীজ। চরমপন্থী নারীবাদীরা লিঙ্গ অনপেক্ষ অবস্থান স্বীকার করেন না ঠিকই, কিন্তু লিঙ্গ সাম্য

প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস রাখেন। সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষের লিঙ্গ পরিচয়-এর মধ্যে যদি সাম্যভাবনা নিহিত থাকে, তাহলে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান সম্ভব হতে পারে বলেই এদের অভিমত।

এই মতানুসারে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পশ্চাতে রয়েছে সুচিন্তিত অভিপ্রায়, যা পিতৃতন্ত্রের সমর্থনের সযত্নে লালিত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রচলিত চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধান কখনোই সম্ভব হবে না। তাই চরমপন্থী নারীবাদীরা যুক্তিভিত্তিক তত্ত্ব-কাঠামোর বিনির্মাণে আগ্রহী। কারণ তাঁরা মনে করেন, প্রতিষ্ঠিত ধ্রুপদী তত্ত্ব-কাঠামোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে নারী-পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকৃত আখ্যান।

চরমপন্থী নারীবাদীরা যেহেতু অনপেক্ষ কোনো মানবধর্ম স্বীকার করেন না, তাই তাঁরা মানুষকে যৌক্তিক জীব হিসাবে না দেখে, তাকে অনুভূতিপ্রবণ জীব হিসাবে দেখতে চান। সেই কারণে তত্ত্বের প্রেক্ষিতে যুক্তির আধিপত্যকে তাঁরা খারিজ করে দেন, এবং লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কেবল চর্যা বা প্রতিষ্ঠান নয়, ধারণার স্তরেও পরিবর্তন আবশ্যিক বলে মনে করেন। এদের মতে লিঙ্গ বৈষম্য সর্বত্রগামী, ফলে শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের চর্যা এবং সেই চর্যায় মদতকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন হলেই সমস্যার সমাধান হবে এমন নয়। ওই প্রতিষ্ঠানের পিছনে যে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিধৃত হয়ে আছে তার পরিবর্তনও প্রয়োজন। সুতরাং কোনো তত্ত্বের লিঙ্গ বর্জিত রূপদান সম্ভব নয়।

মানুষের কোনো লিঙ্গ অনপেক্ষ ধর্ম বা ইতিহাস অনপেক্ষ অবস্থান স্বীকার করেন না বলে, চরমপন্থী নারীবাদীরা বিশুদ্ধ যুক্তি ও বিশুদ্ধ তত্ত্বের সম্ভাবনা নস্যাত্ন করে দেন। তাই চরমপন্থী নারীবাদীরা যখন লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধান চান, তখন তাঁরা অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প গ্রহণ করেন না - বরং তাঁরা প্রচলিত তত্ত্ব-কাঠামোর আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন স্বার্থচিন্তা এবং ক্ষমতার কর্তৃত্ব লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণ। চরমপন্থী নারীবাদীরা অন্তর্ভুক্তি বলতে বোঝেন ক্ষমতার ক্ষেত্রগুলিতে নারীর

স্থান সুনিশ্চিত করা। এর ফলে নারী প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা অর্জন করে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবে ঠিকই, হয়তো বা তার জীবনচর্যায় পরিবর্তনও দেখা দেবে, কিন্তু ধারণার স্তরে কোনো পরিবর্তন সম্ভব হবে না। কারণ একদল নারী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠলেও, সামগ্রিকভাবে নারী মুক্তি ঘটবে না বা নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্যভাবনা গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। প্রান্তবাসী নারী কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত হলে নারী ক্ষমতা লাভ করবে এ কথা ঠিক, কিন্তু কেন্দ্র ও প্রান্তের বিভাজন তো থেকেই যাবে। এই বিভাজন দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতার অসম বন্টন বলবৎ থাকবে। ফলত পূর্বে যে বৈষম্য শুধুমাত্র নারী-পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অন্তর্ভুক্তির ফলে নারীর পরিবর্তিত অবস্থানের ভিত্তিতে সেই বৈষম্য দেখা দেবে এক নারীর সঙ্গে অপর নারীর মধ্যেও। উপরন্তু নারীর জীবনে তার এযাবৎ চর্চিত স্বভাব ও নবার্জিত অধিকার এই দুইয়ের টানা পোড়েন জটিল আকার ধারণ করতে পারে। এমত পরিস্থিতিতে নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হবে, কিন্তু লিঙ্গ বৈষম্যের সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। তাই চরমপন্থী নারীবাদীরা তত্ত্ব-কাঠামোর সম্প্রসারণ-এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পের ভিত্তিতে নারীর লিঙ্গায়িত সমস্যার দূরীকরণের সম্ভাবনা সমর্থন করেন না।

‘যা ব্যক্তিক তা রাজনৈতিক’^১ – এই শ্লোগান চরমপন্থী নারীবাদীরাও সমর্থন করেন, যদিও লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা ব্যক্তিগত বিষয়কে আইনের পরিসরে নিয়ে এসে সুবিচার পাওয়ার আশা ত্যাগ করে থাকেন। এই নারীবাদীরা মনে করেন, নারীর ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিকে আইনের পরিসরে প্রসারিত করার অর্থ হল গৃহের পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে অধিকতর বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে আত্মসমর্পণ। তাই আইনের দ্বারস্থ হয়ে নারীর লিঙ্গভিত্তিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। চরমপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের অবদমনের ক্ষেত্রটি থেকেই লিঙ্গ বৈষম্যের সূত্রপাত। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে নিহিত ক্ষমতার অসম বন্টন, অবদমন ও বৈষম্যমূলক আচরণ পরবর্তীকালে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

^১ শেফালী মৈত্র, *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪৭-৯।

চরমপন্থী নারীবাদীরা তত্ত্বনির্মাণ ও তত্ত্বের প্রয়োগ এই দুটি বিষয়কে ভিন্ন মাত্রায় বিচার করার পক্ষপাতী নন। তাঁদের দাবি হলো তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট থেকে লিঙ্গ সমস্যার বিষয়টি বাদ পড়াটা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটি নয়, বরং তা সচেতন ক্রিয়ার ফসল। এর মূলে আছে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং লিঙ্গ রাজনীতির সক্রিয় ভূমিকা, এই ধরনের ত্রুটিকে তাঁরা ‘সম্পাদিত দোষ’ (error of commission) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এই দোষ দূর করার জন্য সাপেক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে তত্ত্বের আমূল সংস্কার করাটাই এদের নির্ধারিত লক্ষ্য।

জ্ঞানতত্ত্ব :

চরমপন্থী নারীবাদীরা প্রচলিত বা প্রথামাফিক কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতিকে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের উপযোগী বলে মনে করেন না। তাই তাঁরা জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের নিমিত্ত নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে চান এবং সেইসঙ্গে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকারগুলির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এযাবৎ যে পদ্ধতির অনুসরণের ফলে সমাজে নারীর লিঙ্গ বৈষম্য ও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর অবমূল্যায়নের সৃষ্টি হয়েছে সেই পদ্ধতিকে তাঁরা দুষ্ণ বলেই মনে করেন। তাই সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য ভিন্নধর্মী জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসন্ধান করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

চিরাচরিত জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের যে পদ্ধতি, তার বিকল্প হিসাবে চরমপন্থী নারীবাদীরা ‘অবস্থান নির্ভর জ্ঞানতত্ত্ব’ (standpoint epistemology) প্রবর্তনের কথা বলেন। এই জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী মনে করা হয় যে, জ্ঞান সর্বদাই কোনো না কোনো সামাজিক অবস্থান নির্ভর প্রেক্ষিত থেকেই গড়ে ওঠে। সুতরাং নিরালম্ব, নিরাসক্তভাবে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। আমরা জানি, দর্শনচর্চায় যে বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞানলাভের দাবি জানানো হয় তা কোনো সাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লাভ করা সম্ভব নয়, কারণ মনে করা হয় জ্ঞানের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হল বিষয়নিষ্ঠতা। এইরূপ বিষয়নিষ্ঠতার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যা সর্বদাই বিষয়নিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে চলে বলে মনে করা হয়। তাই চরমপন্থী নারীবাদীরা যখন বিকল্প জ্ঞানলাভের পদ্ধতির

অনুসন্ধান চালাতে চান, তখন সমালোচনার ক্ষেত্র হিসাবে তাঁরা বিজ্ঞানচর্চাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করে থাকেন।

নারীবাদীদের অবস্থান নির্ভর জ্ঞানতত্ত্ব বলতে কোনো একটি বিশেষ জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থানকে বোঝায় না। কারণ অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি যদি জ্ঞানতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো একটি জ্ঞানতত্ত্বের উপস্থিতি কাম্য নয়, সুতরাং এটি হল বৈচিত্রপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্বের একত্র সমাবেশ। নারীবাদীদের অবস্থান নির্ভর জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে তার কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন, তাহলে অনুধাবন করতে সুবিধা হবে যে, এইপ্রকার জ্ঞানতত্ত্ব কেন অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। চরমপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন, জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া সর্বদাই কোনো না কোনো সামাজিক অবস্থান থেকেই কার্যকরী হয়।^২ সুতরাং ঐশ্বরিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা একেবারেই কাম্য নয়। জ্ঞান যদি সামাজিক অবস্থান নির্ভর প্রেক্ষিত সাপেক্ষে গড়ে ওঠে, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে – কেন্দ্র-প্রান্ত বিশিষ্ট সামাজিক কাঠামোর কোন্ অবস্থান থেকে জ্ঞানের গ্রহণ আবশ্যিক। এই প্রসঙ্গে চরমপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন, কেন্দ্রবাসীর জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত এযাবৎ নারী তথা অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর অবদমন ও শোষণের কারণ, বিশেষত নারীর লিঙ্গ বৈষম্যের জনক। সুতরাং সেই অবস্থান থেকে জ্ঞানলাভ করা হলে তা আবশ্যিকভাবে বৈষম্যমূলক ফলাফলের সৃষ্টি করবে। এই কারণে তাঁরা মনে করেন, জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্বেষণ সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের প্রেক্ষিত থেকেই শুরু হওয়া আবশ্যিক, কারণ তাদের বিশেষ সামাজিক অবস্থানের কারণে তারা কেন্দ্র ও প্রান্ত উভয় অবস্থান সম্পর্কে সচেতন এবং ক্ষমতাহীনতার কারণে বাস্তব তথ্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম; সত্য উদঘাটনের সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং প্রান্তবাসী মানুষজনই জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

^২ “Knowledge claims are always socially situated,” Sandra Harding, “Rethinking standpoint Epistemology : What is “Strong Objectivity”?”, in *Feminist Epistemologies*, eds. by L. Alcoff and E. Potter, Routledge, London, 1993, p. 54.

নারীবাদী প্রস্তাবিত অবস্থান নির্ভর জ্ঞানতত্ত্বের পথচলা শুরু হয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ক্ষমতার অনুষ্ণকে আবশ্যিক মাত্রা হিসাবে গণ্য করার মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে স্যান্ড্রা হার্ডিং (Sandra Harding, 1935-) মনে করেন, প্রান্তবাসীর যাপনের অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে আসবে অবস্থান নির্ভর নিত্য নতুন গবেষণার প্রেক্ষিত। তাঁর মতে একজন প্রান্তিক মানুষ তার ক্ষমতাহীন প্রেক্ষিত থেকে কোনো সমস্যাকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করে তা ক্ষমতামূলক প্রেক্ষিত থেকে অনুধাবন করতে পারা সম্ভব নয়। নারীবাদী অবস্থান নির্ভর জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী একজন জ্ঞাতার সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের আবশ্যিক উপাদান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। ফলে আমাদের যাপনের অভিজ্ঞতাগুলি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত হতে পারছে কিনা তা অবস্থান নির্ভর জ্ঞানতাত্ত্বিকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। তাঁদের দাবি হলো ক্ষমতার অনুষ্ণ যখন জ্ঞানতত্ত্বের প্রক্রিয়াতে যুক্ত হয়ে থাকে, সেই জ্ঞান কখনোই বিষয়নিষ্ঠ হয় না, বরং জ্ঞান ও জ্ঞাতার সামাজিক অবস্থান নির্ভর সচেতনতা থেকেই গড়ে ওঠে প্রকৃত বিষয়নিষ্ঠতার বোধ। সুতরাং প্রথম কাজ হল অবস্থানকে চিহ্নিত করা, কারণ কোন্ অবস্থান সাপেক্ষে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া কার্যকরী হচ্ছে সেদিকে গুরুত্ব না দিলে বা সচেতন না থাকলে তথ্য তথা সত্য বিকৃতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যে নীতির বিরোধিতা করে তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্বেষণের প্রক্রিয়া শুরু হয় তা হল “জোর যার মূলুক তার” (might makes right)।^১

হার্ডিং জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে যে ধরনের বিষয়নিষ্ঠতার কথা বলেছেন তা ক্ষমতামূলক প্রেক্ষিত থেকে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাঁর মতে সর্বোচ্চ বিষয়নিষ্ঠতা এবং সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা সমার্থক নয়, যদিও ধ্রুপদী চিন্তা-ভাবনায় তাই মনে করা হয়। বিষয়নিষ্ঠতা অপরিহার্য কিনা তা দর্শনের জগতে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত একটি বিষয়। এক্ষেত্রে মূল্য-নিরপেক্ষতার নাম করে যা চলে তা হল পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাত। বরং নারীবাদী প্রেক্ষিত থেকে কোনো অনুসন্ধান, তা যতই রাজনৈতিক বলে মনে হোক না কেন, তুলনামূলকভাবে অধিক সত্য ও কম তথ্য বিকৃত জ্ঞান দান করতে পারবে।

^১ Sandra Harding, ““Strong Objectivity”: A Response to the New Objectivity Question”, in *Synthese*, Vol. 104, No. 3, p. 332.

সেক্ষেত্রে নারীর জীবন প্রেক্ষিত থেকে উঠে আসা জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া সকলের জন্য হিতকর হবে বলেই মনে করা হয়।

চরমপন্থী নারীবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক হিসাবে এইস্থলে প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে স্যান্ড্রা হার্ডিং-এর মত সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হার্ডিং তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যালোচনা শুরু করেছেন এক গভীর জিজ্ঞাসা থেকে, তা হল – জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত মাত্রই কি তা হয় বিষয়নিষ্ঠ হবে, না হলে প্রেক্ষিত সাপেক্ষ হবে? এই প্রশ্নে হার্ডিং মনে করেন যে, উপরোক্ত দুটি চূড়ান্ত অবস্থানের মধ্যবর্তী কোনো অবস্থান গ্রহণ করাটাই জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে। তাঁর মতে চিরাচরিত জ্ঞানতত্ত্বে এযাবৎ জ্ঞানের বিষয়নিষ্ঠতার ধর্মটিকে যেভাবে মূল্যায়িত করা হয়েছে, তা নারীবাদী দৃষ্টিকোণ সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। দর্শনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিষয়নিষ্ঠতার ধর্মটিকে ব্যবহার করা হয়ে এসেছে একটি আদর্শ হিসাবে। এই আদর্শ লাভ করা যায় একমাত্র বিচ্ছিন্ন প্রেক্ষিত থেকে। সেক্ষেত্রে জ্ঞাতার কোনো অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি যেমন বিবেচ্য নয়, একইভাবে জ্ঞেয় বিষয়ের পরিস্থিতি বা প্রাসঙ্গিকতাও বিচার্য নয়। এইভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, নিরালম্ব প্রেক্ষিত থেকে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হবে, এবং বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করতে পারবে বলেই মনে করা হয়। যদিও হার্ডিং মনে করেন এই জাতীয় প্রেক্ষিত বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

হার্ডিং-এর বক্তব্য হল পরিস্থিতি, দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান বা প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি সম্পূর্ণত পরিহার করে কোনো বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন সম্ভব নয়। এই প্রশ্নে তিনি ‘সবল বিষয়নিষ্ঠতা’ (strong objectivity)^৪-এর ধারণাটির প্রবর্তন করেছেন। তাঁর মতে সবল বিষয়নিষ্ঠতা হল বিষয়নিষ্ঠতা সর্বোচ্চকরণের একটা উপায়, যেখানে জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানের বিষয়ী উভয়কেই সম মাত্রায় বিচারের দাবি জানানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ সবল বিষয়নিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়কে একই কোণীপাথরে ফেলে বিচার করা। তাহলে বিষয়নিষ্ঠতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

^৪ Ibid, p. 346.

এই প্রসঙ্গে হার্ডিং এর বক্তব্য হল, বিষয়নিষ্ঠতা মাত্রই তা প্রসঙ্গ সংবেদনশীল, ক্ষমতার রাজনীতির প্রসঙ্গ এখানে আবশ্যিক উপাদান হিসাবে অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। সেগুলিকে যদি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে অস্বীকার করা হয়, তাহলে যে বিষয়নিষ্ঠতার ধারণা পাওয়া যাবে সেটিকে হার্ডিং ‘দুর্বল বিষয়নিষ্ঠতা’ (weak objectivity) হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। তিনি মনে করেন, এইপ্রকার বিষয়নিষ্ঠতায় যে ধরনের নিরপেক্ষ অবস্থান, বিমূর্ত দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের দাবি জানানো হয় তা জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে একেবারেই অনুপযোগী। হার্ডিং-এর মতে সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য ও ক্রমোচ্চ স্তরায়নের বাস্তব পরিস্থিতিতে দুর্বল বিষয়নিষ্ঠতা কার্যত অর্থহীন। যেকোনো অবস্থান সাপেক্ষে জ্ঞানলাভ করলেই চূড়ান্ত বিষয়নিষ্ঠতা লাভ করা যাবে এমনটা অবশ্য হার্ডিং মনে করেন না। তাঁর মতে যেহেতু ক্ষমতা ও রাজনীতির অনুষ্ণ জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে আবশ্যিকভাবে অঙ্গীভূত হয়ে থাকে, তাই বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কোনো কোনো সামাজিক অবস্থান সবল বিষয়নিষ্ঠতার পক্ষে উপযোগী, আবার কোনো কোনো সামাজিক অবস্থান দুর্বল বিষয়নিষ্ঠতার উপযোগী। সেক্ষেত্রে জাগতিক বিষয় সম্পর্কে সত্যানুসন্ধান চালাতে হলে তা সর্বদাই ক্ষমতাহীন প্রেক্ষিত থেকে শুরু করা প্রয়োজন। কারণ তা বাস্তবের সঙ্গে বহুলাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে ক্ষমতাবান মানুষের ক্ষমতার আফ্রালনে সত্য চাপা পড়ে যেতে পারে বা বিকৃত হতে পারে। তাই ক্ষমতামালা প্রেক্ষিত থেকে উঠে আসা সত্যের প্রতি আস্থা রাখা সম্ভব নয়। হার্ডিং মনে করেন, পূর্ব অস্তিত্বশীল বিষয়নিষ্ঠতার ধারণাটি বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তার মধ্যে থেকেও বিষয়নিষ্ঠতার কোনো সাধারণ ধর্মের বোধ হয় না, তথাপি মূলস্রোতের দার্শনিকগণ মনে করেন, মূল্য-নিরপেক্ষতা (value-neutrality) বজায় রাখতে হলে উক্ত বিষয়নিষ্ঠতা অপরিহার্য।

হার্ডিং মনে করেন, বিষয়নিষ্ঠতার নামে মূলস্রোতে যেভাবে তথ্য বিকৃতি ঘটে তার অনিবার্য ফলস্বরূপ প্রান্তিক গোষ্ঠীর শোষণ ও অবদমনের প্রেক্ষাপট রচিত হয়। ফলে যা নিরপেক্ষ, স্বাভাবিক ও সার্বজনীন বলে মনে হয় তা প্রকৃতপক্ষে বিকৃত জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের মূল্যবোধগুলিকেও হার্ডিং নিরপেক্ষ

বলে মনে করেন না। তাঁর মতানুসারে বিষয়নিষ্ঠতা বৃদ্ধি করার অর্থ এই নয় যে সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে। সবল বিষয়নিষ্ঠতার ধারণাটি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে হার্ডিং দাবি করে থাকেন যে, বিষয়নিষ্ঠতার সঙ্গে নিরপেক্ষতার কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। সুতরাং নিরপেক্ষতা অবলম্বন না করেও বিষয়নিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যে বিষয়নিষ্ঠতা নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে থাকে, সেইপ্রকার বিষয়নিষ্ঠতাকে হার্ডিং দুর্বল বিষয়নিষ্ঠতা রূপে চিহ্নিত করেছেন।

নিরপেক্ষতার উপর ভর করে গড়ে ওঠা বিষয়নিষ্ঠতার ধারণাটির সঙ্গে ক্ষমতার রাজনীতি কীভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে হার্ডিং বিজ্ঞানের রাজনীতিকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে বিজ্ঞানে দুই ধরনের রাজনীতি⁵ দেখতে পাওয়া যায়, একটিকে বলা হয় প্রকাশ্য (overt) রাজনীতি অপরটি হল গোপন (intrusive) রাজনীতি। প্রকাশ্য রাজনীতি প্রভাব বাইরের জগত থেকে বিজ্ঞানের উপর প্রযুক্ত হয়। মূলত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থপূরণ-এর উদ্দেশ্যে এই ধরনের রাজনীতি দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান পরিচালিত হয় কিছু স্বার্থাশ্বেষী গোষ্ঠীর দ্বারা। ক্ষমতার জোরে এই ধরনের রাজনীতি বিজ্ঞানের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই রাজনীতির আবশ্যিক অঙ্গ হল বিশেষ গবেষণা খাতে আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেওয়া, গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত জনসম্মুখে প্রচারের সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদি, যদিও বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রকাশ্য রাজনীতির দ্বারা বিজ্ঞান কখনোই কলুষিত হয় না। নারীবাদীরা মনে করেন এইরকম প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যার ফলে বিজ্ঞান নিরপেক্ষতা নির্ভর বিষয়নিষ্ঠতার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে না।

এছাড়াও বিজ্ঞানের আরও একপ্রকার রাজনীতি দেখতে পাওয়া যায়, যা হল গোপন রাজনীতি। এইপ্রকার রাজনীতি বিজ্ঞানের মধ্যেই নিহিত থাকে; বাইরে থেকে আরোপিত হয় না। এইপ্রকার রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রয়োগ প্রযোজ্য নয়। অবদমনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অগ্রাধিকার, গবেষণা কৌশল, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান-

⁵ Ibid, pp. 334-6.

এর ভাষার মধ্য দিয়ে তা কার্যকরী হয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রাজনীতি বলবৎ হয়। হার্ডিং মনে করেন, নিরপেক্ষতারূপে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকার অবলম্বনে এইজাতীয় রাজনীতির অস্তিত্বকে চিহ্নিত করতে পারা সম্ভব নয়। তার জন্য বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে থেকে বিচার-বিশ্লেষণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা আবশ্যিক। হার্ডিং-এর বক্তব্য হলো বিজ্ঞানচর্চায় অঙ্গীভূত হয়ে থাকা রাজনীতিটিকে চিহ্নিত করতে না পারলে বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞানলাভ সম্ভব হবে না, ক্ষমতার রাজনীতির দ্বারা জ্ঞান বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

বিজ্ঞানে রাজনীতির অনুষ্ণ কীভাবে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝা যেতে পারে। জীববিজ্ঞানে ‘জেনেটিক মেকানিসম’ সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যুগপৎ প্রচলিত আছে, একটি হলো ‘দ্য মাস্টার মলিকিউল’ এবং অপরটি হল ‘দ্য স্টেডি স্টেট কনসেপ্ট’। প্রথম ব্যাখ্যাটিকে মলিকিউল-এর মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাস স্বীকার করা হয়। সেক্ষেত্রে একটি মাস্টার মলিকিউলকে জেনেটিক মেকানিসিমের অন্যান্য মলিকিউলগুলি অনুসরণ করে চলে। অপরদিকে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির ক্ষেত্রে মলিকিউলের মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তরভেদ স্বীকার করা হয় না। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী জেনেটিক মেকানিজম-এর মলিকিউলগুলি চিরগতিশীল ও স্বনির্ভর। এক্ষেত্রে কোনো মলিকিউলের বৈশিষ্ট্য অপর কোনো প্রধান মলিকিউলের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তারা পরস্পর পরিপূরক। এই দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে বিজ্ঞানের জগতে প্রথম ব্যাখ্যাটি অর্থাৎ উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাসের ব্যাখ্যাটি অধিক প্রচলিত, এবং জনপ্রিয়। এর কারণ হল ক্ষমতার অনুপ্রবেশ। প্রথম ব্যাখ্যাটি পিতৃতান্ত্রিক প্রগতির ভাবনাটিকে গ্রহণ করে বলে তা অধিক জনপ্রিয়, কারণ তা ক্ষমতামূলক প্রেক্ষিতের ভাবনাটিকে অনুসরণ করে থাকে। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি নারীবাদী আদর্শের অনুগামী হওয়ার কারণে সেখানে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ধারণাটি ব্যক্ত হয়।^৬ ফলে তার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে কোনো একটি ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার পিছনে বিজ্ঞানের আভ্যন্তরীণ সমর্থন থাকা বা না থাকা যেমন একটি কারণ, আবার আর্থিক

^৬ শেফালী মৈত্র, “বিজ্ঞান চর্চা ও নারীবাদ”, *ভারতের সমাজ ও ভারতের নারী*, সম্পাদক : পবিত্র সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৯০।

অনুদান না পাওয়া, নানান স্বার্থাশ্বেষী গোষ্ঠীর চাপ ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ চূড়ান্ত বিষয়নিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিজ্ঞানের জগতেও প্রকাশ্য ও গোপনীয় উভয় প্রকার রাজনীতি যুক্ত হয়ে থাকে। এই কারণেই হার্ডিং মনে করেন নিরপেক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং বিষয়নিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়া এক কথা নয়। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার উপর ভর করে থাকা বিষয়নিষ্ঠতাকে তিনি দুর্বল বিষয়নিষ্ঠতা দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেন। তাঁর মতে দুর্বল বিষয়নিষ্ঠতার দ্বারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অঙ্গীভূত হয়ে থাকা ক্ষমতার রাজনীতিকে চিহ্নিত করতে পারাটা সম্ভব নয়, এই কারণেই প্রয়োজন সবল বিষয়নিষ্ঠতা। হার্ডিং অবস্থান নির্ভর জ্ঞানতত্ত্বের মধ্য দিয়েই সবল বিষয়নিষ্ঠতাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এমন জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট রচনা করতে চান, যেখানে প্রান্তবাসীর প্রেক্ষিত থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কেন্দ্র-প্রাপ্ত নির্বিশেষে সকলের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে।

অবিকৃত এবং অধিক মাত্রায় সত্যাস্থেষণের নিমিত্ত হার্ডিং প্রান্তিক অবস্থান থেকে জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শুরু হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন। যদিও বিনাবিচারে তিনি যেকোনো প্রান্তিক অবস্থানকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করেন না। যেহেতু জ্ঞাতা সর্বদাই সামাজিকভাবে অবস্থিত, তাই তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞান উভয় প্রেক্ষিত সম্পর্কে সাবধানতা এবং সচেতনতা অবলম্বনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিষয়নিষ্ঠতা লাভের দাবি জানিয়ে থাকেন। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তু, কোনো প্রেক্ষিতই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি জ্ঞাতার আত্মনমনীয় (reflexivity)^১ নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যেখানে জ্ঞাতা জ্ঞানলাভের প্রেক্ষিতে সর্বদাই তার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে চলবে। এই আত্মিক ব্যাখ্যা হবে একাধারে বিচারমূলক বা সমালোচনামূলক, কার্য-কারণমূলক, বিজ্ঞানসম্মত এবং সামাজিক। এক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রেক্ষিতগুলিতে বিবেচনার উপর জোর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা সাপেক্ষতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চান, বরং তাঁরা জ্ঞানলাভের এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চান যেখানে চূড়ান্ত সাপেক্ষতা প্রশয় পাবে না। আবার তথাকথিত নিরপেক্ষতা অবলম্বনে বিষয়নিষ্ঠতা লাভ করার সম্ভাবনাও থাকবে না। এর মধ্যবর্তী অবস্থানই হল সবল বিষয়নিষ্ঠতা

^১ Sandra Harding, 1993, pp. 71-4.

সর্বোচ্চকরণের উপায়। সাপেক্ষ প্রেক্ষিতের অনুমোদন অপরিহার্য হলেও হার্ডিং-এর সবল বিষয়নিষ্ঠতার ধারণাটি বিষয়নিষ্ঠতা বিরোধী কোনো ধারণা নয়, বরং হল মূলস্রোতের বিষয়নিষ্ঠতার বিরোধী অবস্থান।

নীতিবিদ্যা :

নৈতিকতা সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল - নৈতিক বিচারের কর্তা কে ? ধ্রুপদী নীতিশাস্ত্রগুলিতে নৈতিক বিচারের কর্তা কে হবে, বা কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে একজন ব্যক্তির নৈতিক বিচারের অধিকার জন্মায়, সে বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। এককথায় সবাই স্বীকার করেন যে, স্ব-নিয়ন্ত্রিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই নৈতিক বিচারের কর্তা হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য এবং এইপ্রকার ব্যক্তির নৈর্ব্যক্তিক আদর্শই নৈতিক বিচারের পরাকাষ্ঠা। কালক্রমে দর্শনের জগতে নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিকদের বিশেষে করে চরমপন্থী নারীবাদীদের আগমনে এই একই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হল যে - নৈতিক বিচারের কর্তা কে ? এইস্থলে প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্নের আঙ্গিকটি জ্ঞানাত্মক হলেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রশ্নের আঙ্গিকটি কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক। প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্নটির মাধ্যমে জানতে চাওয়া হচ্ছে যে - নৈতিক বিচারের কর্তারূপে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে ? অপরপক্ষে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে জানতে চাওয়া হচ্ছে, যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নৈতিক বিচারের কর্তারূপে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, সে কি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেকোনো একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, অথবা একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, নাকি একজন প্রাপ্তবয়স্কা নারী ?

এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে ফ্রয়েড (Sigmund Freud, 1856-1939) প্রদত্ত তত্ত্ব কাঠামোর সঙ্গে নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিক তথা মনোবিদ ক্যারল গিলিগান (Carol Gilligan, 1936-)-এর মতের বৈপরীত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বিচারের মধ্য দিয়ে, নৈতিক প্রেক্ষাপটে নারীসুলভ গুণাবলীর অবদান ও সেগুলির গুরুত্বকে তুলে ধরে তৎপ্রযত্নে রচিত বিকল্প নৈতিক তত্ত্বের ধারণাটিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হবে।

আমরা জানি ফ্রয়েড সরাসরি কোনো নৈতিক তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন না। মানুষের যৌন বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যে তত্ত্ব তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, নৈতিকতা প্রসঙ্গে তাঁর অভিপ্রায় কী হতে পারে। নৈতিকতা সম্পর্কিত ফ্রয়েডীয় মতবাদকে যদি সঠিক মাত্রায় অনুধাবন করতে হয় তাহলে যৌন-বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তত্ত্বটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

জানা যায় যে, নানা রকমের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ প্রণালীর উপর নির্ভর করে এবং অসংখ্য রোগীর চিকিৎসার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ফ্রয়েড শৈশব কামের^৪ তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই তত্ত্বটিতে তিনি শিশুর যৌন বিকাশের স্তর বা পর্যায়গুলিকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। ফ্রয়েড শিশুর যৌন বিকাশের স্তরসমূহের যে মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ প্রদান করেছেন তার মধ্যে প্রথম স্তরটি হল মুখকামের স্তর (Oral Erotic Stage)। শিশু জন্মকাল থেকে শুরু করে দেড় বৎসর কাল পর্যন্ত মুখকামের স্তরটিতে অবস্থান করে। এই স্তরে মাতৃস্তন্য পান করার মধ্য দিয়ে শিশুর মনে তথা শরীরে সর্বাপেক্ষা সুখানুভূতির সঞ্চার হয়ে থাকে। জীবনরক্ষার প্রাথমিক উপাদান হিসাবে বা শারীরিক পুষ্টিলাভের প্রয়োজনে মাতৃস্তন্যপানের ক্রিয়াটি অপরিহার্য হলেও, এই চোষণ ক্রিয়াটিকে কেন্দ্র করে শিশুর মনে অপরিমিত কামসুখেরও অনুভব হয়ে থাকে। মুখ, ওষ্ঠ ও জিহ্বাকে ব্যবহারের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই কামসুখের প্রক্রিয়াটিকে শিশুর যৌন বিকাশের মুখকামের প্রারম্ভিক স্তররূপে চিহ্নিত করা হয়। এই স্তরের পরবর্তী পর্যায়ে যখন ধীরে ধীরে শিশুর দাঁত উঠতে শুরু করে, তখন সে কোনোকিছুকে কামড় দিয়ে বা চর্বনক্রিয়ার মাধ্যমে তার সুখলাভের প্রক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করতে চায়। শিশুর এই ধরনের প্রবণতাকে তার মুখকামের ধর্ষকামী (Sadistic) পর্যায় হিসাবে অভিহিত করা হয়।

দেড় বৎসর সময়কালের সমাপ্তিতে শিশুর কামসুখ তার পায়ুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। শিশুর জীবনের এই স্তরের ব্যাপ্তি দেড় থেকে তিন বৎসর কাল পর্যন্ত। এটি শিশুর যৌন বিকাশের দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরে মলত্যাগের মধ্য দিয়েই শিশুর শরীরে

^৪ Sigmund Freud, *Three Essays on The Theory of Sexuality*, Trans. by A.A. Brill, 1920, globalgrevebooks.com, 2021, pp. 27-55.

তথা মনে সুখকর অনুভূতির উদ্বেক হয়ে থাকে। যৌন বিকাশের এই স্তরটিকে ফ্রয়েড পায়ুকামের স্তর (Aural Erotic Stage) নামে চিহ্নিত করেছেন। পায়ুকামের স্তরটিতে নিজের শরীরে মল ও মলের গন্ধ শিশুর আগ্রহের বস্তুরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। এমনকি মলত্যাগ অপেক্ষা ওই বর্জ্য পদার্থটিকে শরীরের মধ্যে ধারণ করে রাখার মধ্য দিয়েও শিশু কামসুখের অনুভূতি লাভ করে। শিশুর এইপ্রকার প্রবণতাকে বলা হয় পায়ুকামের ধর্ষকামী পর্যায়। মুখকামের স্তরে শুরু হওয়া শিশুর ধর্ষকামী প্রবণতা পায়ুকামের স্তরে আরও প্রকটিত হয়ে ওঠে।

পায়ুকামের স্তর অতিক্রম করে শিশু যৌন বিকাশের তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করে। এই স্তরটি শৈল্পিক স্তর (Phallic Stage) নামে পরিচিত। শিশু তিন থেকে ছয় বৎসর সময়কাল পর্যন্ত এই স্তরে অবস্থান করে। শৈল্পিক স্তরে নিজের যৌনাঙ্গই হল শিশুর যৌন আকর্ষণের মূল কেন্দ্র। প্রায় সব শিশুই এই সময়ে নিজেকে যৌন অনুসন্ধান নিয়োজিত রাখে। ফ্রয়েডের মতে, শৈল্পিক স্তরে প্রাথমিকভাবে মেয়ে এবং ছেলে উভয় শিশুর মনে একটি বন্ধমূল ধারণা গড়ে ওঠে যে, তাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ যৌনাঙ্গ আছে। এক্ষেত্রে মেয়ে শিশুরা তাদের ভগাঙ্গুরকেই শিল্প বলে মনে করে। পুরুষ যৌনাঙ্গহীনতার জ্ঞান তাদের তখনও পর্যন্ত হয় না। শিশুরা মনে করে যে, তাদের কারোর যৌনাঙ্গ ছোটো এবং কারোর বড়।

এই স্তরে পুরুষ শিশু নিজের যৌনাঙ্গ হস্তদ্বারা স্পর্শের মধ্য দিয়ে কামসুখের অনুভূতি লাভ করে। যদিও যে নারী শিশুর কোনোপ্রকার যৌনাঙ্গমূলক ক্রিয়া এইস্তরে প্রকাশিত হয় না। নারীর যৌনাঙ্গের স্বরূপটি দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিশুর কাছে অজানাই থেকে যায়। ফ্রয়েড দাবি করেন যে - অতঃপর শৈল্পিক দশায় ধীরে ধীরে শিশুর যৌনতার বিকাশ যতই পরিণতি লাভের দিকে অগ্রসর হয়, ততই পুরুষ এবং নারী শিশুর বিকাশ ভিন্নধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। শিশুরা ক্রমে ক্রমে নারী এবং পুরুষ যৌনাঙ্গের পার্থক্যকে বুঝতে পারে, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে নারী শিশুর মনে শিল্পহীনতার বোধ উপস্থিত হয়। এর পরবর্তী সময় থেকেই নারীর জীবনধারা একপ্রকার জটিলতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে।

শৈল্পিক দশায় নিজের যৌনাঙ্গের উদ্দীপনা বা উত্তেজনার মাধ্যমে পুরুষ শিশুর মনে যে সুখকর অনুভূতির উদ্বেক হয়, সেইপ্রকার যৌন সুখানুভূতি লাভের বিষয়টির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে থাকে তার মায়ের শরীরের উপস্থিতি। এইস্থলে পুরুষাঙ্গের অধিকারী রূপে পুরুষ শিশুর মনে এক অহংবোধের উদ্ভব হয়, এবং পর্যবেক্ষণ ও কল্পনা দিয়ে শারীরিকভাবে সে মায়ের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বাবার শারীরিক সক্ষমতা ও তাঁর কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ শিশুর সদ্য বিকশিত পৌরুষের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মায়ের উপর অধিকার কয়েম করার জন্য পুরুষ শিশু তার বাবার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরণ করতে থাকে। শিশুর যৌন বিকাশের এই স্তরটিকে ফ্রয়েড 'ঐদিপাস দ্বন্দ্ব' (Oedipus Complex)-এর স্তর নামে অভিহিত করেছেন। এরপর যখন শিশুকে তার যৌনানুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য শিল্পচ্ছেদ (castration)-এর ভীতি প্রদর্শন করানো হয়, তখন শিল্পহীন মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব তার মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে থাকে। এর ফলে শিশু তার শৈশব জীবনের যৌনতাকে অবদমিত করে ঐদিপাস দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়।

শৈশব কামের দ্বন্দ্ব থেকে পুরুষ শিশু সহজে নিষ্কৃতি লাভ করলেও নারী শিশুর ক্ষেত্রে এইপ্রকার দ্বন্দ্বগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। শিল্পহীনতার জ্ঞান হওয়ার পর নারী শিশু তার মায়ের প্রতি সমস্তপ্রকার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে, এবং এই শিল্পহীনতার কারণস্বরূপ সে তার মাকে দায়ী করে। কেননা সে বুঝতে পারে যে, মা তার মতই শিল্পহীন। ফলে তার মনে হয় যে, মায়ের শিল্পহীনতাই বোধহয় তার শিল্পহীনতার প্রতি কারণ। এই সময়ে নারী শিশু তার কামনা-বাসনা, প্রেম-ভালোবাসা ও যৌন আকর্ষণের মাধ্যমে বাবার প্রতি নিজের অধিকার কয়েম করতে প্রয়াসী হয়। বাবা যেহেতু শিল্পের অধিকারী, তাই সে ওই শিল্পযুক্ত মানুষটির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মায়ের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব পোষণ করতে থাকে, এবং মনের গভীরে বাবার থেকে একটি পুরুষ সন্তান লাভ করে হীনমন্যতা থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা লালন করে। নারী শিশু যখন তার এই চাহিদার অবাস্তবতাকে অনুভব

করতে পারে, তখন সে ক্রমে ক্রমে বাবার প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করে পুনরায় মায়ের সঙ্গে একাত্মতার সম্পর্কটিকে গড়ে তুলতে বাধ্য হয়।

প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যিক যে, ফ্রয়েড শিশুশিক্ষেদের ভীতিটিকেই ঈদিপাস দ্বন্দ্বের অবসানের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে পুরুষ শিশু শিশুশিক্ষেদের ভয়ে তার শৈশবের সমস্তপ্রকার যৌন কামনা-বাসনাগুলিকে পরিহার করে ঈদিপাস দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারলেও, নারী শিশু যেহেতু প্রকৃতই শিশুহীন, তাই তার কোনোপ্রকার শিশুশিক্ষেদের ভীতিও থাকে না। সুতরাং একদিকে শিশুর উৎকর্ষতা স্বীকার করে নিয়ে সেই শিশুর প্রতি যৌন আকর্ষণ, এবং অন্যদিকে মায়ের প্রতি ভালোবাসা বোধ, এই দুই চাহিদাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্বের সমাধান করতে সে অপারগ। নারী শিশুর শৈশব জীবনে সংঘটিত এইপ্রকার দ্বন্দ্বকে কোনো কোনো মনোবিদ 'ইলেক্ট্রা দ্বন্দ্ব' (Electra Complex) হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ফ্রয়েড মনে করেন ঈদিপাস দ্বন্দ্বের স্তরটি মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রতি এক চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। ঈদিপাস স্তরের মানসিক দ্বন্দ্ব, ভীতি, শাস্তি পাওয়ার আশঙ্কা ইত্যাদির ফলেই সৃষ্টি হয় 'অধিশাস্তা' (super-ego), যা মানুষের নৈতিক বোধ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর থেকে সহজেই অনুমান করতে পারা যায় যে, শিশুর ঈদিপাস দ্বন্দ্বের সফল সমাধান হওয়া বা না হওয়ার উপর নির্ভর করে, তার নৈতিক বিচার বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পারদর্শিতা। সুতরাং ফ্রয়েডকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, যেহেতু পুরুষ শিশু তার ঈদিপাস দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু সমাধান করতে সক্ষম, তাই সে নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে পারদর্শী। অপরদিকে নারী শিশু তার ঈদিপাস দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাতে না পারায়, সুদূরপ্রসারী ফলাফলস্বরূপ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সে চিরকালই দ্বিধাগ্রস্ত বা অপরিণত থেকে যায়।

ঈদিপাস স্তরের মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে এবং শৈশব জীবনের সমস্ত প্রকার যৌনানুভবিশিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অবদমনের মধ্য দিয়ে শিশু অনুপক্রম স্তরে প্রবেশ করে। ঈদিপাস স্তরের পরবর্তী সময় থেকে বয়ঃসন্ধিকালের (Puberty Period) মধ্যবর্তী সময়ই অনুপক্রম স্তর (Latency Period) নামে সূচিত।

এটি শিশুর শৈশব বিকাশের চতুর্থ স্তর। অনুপক্রম স্তরে উপনীত হওয়ার পর শিশুর সমস্তপ্রকার কামনা-বাসনা, ভালোলাগা বা ভালোবাসার বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা যৌন সুখানুভূতিগুলির স্মৃতি অবদমিত হয়ে যায়। ফ্রয়েড এই স্তরটিকে শিশুর জীবনের স্তিমিত কাল এবং শৈশব স্মৃতিভ্রংশের কারণরূপে উল্লেখ করেছেন। এই সময়ে শিশুদের মধ্যে বিপরীত যৌনতা বিশিষ্ট মানুষজনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে সম যৌনতাবিশিষ্ট মানুষজনের প্রতি অধিক আকর্ষণ বোধ করার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়।

অনুপক্রমকালের সমাপ্তি এবং যৌবনের সূচনা পর্বকেই বয়ঃসন্ধিকাল বলে। অনুপক্রম স্তর অতিক্রম করে শিশু যখন বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হয়, তখন থেকেই তার যৌনক্রিয়া, যৌনাঙ্গকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হতে শুরু করে। যৌবনের এই প্রারম্ভকাল থেকেই কামশক্তির উপস্থ স্তরের (Genital stage) সূচনা হয়ে থাকে। এই স্তরটি হল মানুষের জীবন বিকাশের পঞ্চম পর্যায় এবং যৌনতা বিকাশের চতুর্থ পর্যায়। এই স্তরেই মানুষের যৌনতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে থাকে। উপস্থ স্তরটিতে কোনো মানুষ তার অধিকাংশ কামশক্তিকেই স্বাভাবিক যৌনানুষ্টিয়িক ক্রিয়া তথা সন্তান উৎপাদনের কাজে ব্যয় করে।

মানুষের যৌন-জীবনের পরিণতির বিবিধ স্তরগুলিকে ফ্রয়েড প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে একটি হল শৈশব-কামের স্তর এবং অপরটি হল যৌবন-কামের স্তর। মানুষের জন্মের পর থেকে অর্থাৎ মুখকামের স্তর থেকে আরম্ভ করে যথাক্রমে পায়ুকামের স্তর ও শৈল্পিক স্তর পর্যন্ত সময়কালকে শৈশব-কামের স্তর বা ‘প্রাক্‌উপস্থ স্তর’ (Pre-Genital Stage) বলা হয়ে থাকে। অতঃপর অনুপক্রম স্তর ব্যতীত অবশিষ্ট পরবর্তী সময়টি হল ব্যক্তির যৌবন-কামের স্তর বা ‘উপস্থ স্তর’ (Genital Stage)। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাক্‌উপস্থ স্তরগুলির মধ্য দিয়ে মানুষের কামশক্তি (Libido) বিকশিত হয়, এবং ক্রমশ তা পরিণতি লাভের দিকে অগ্রসর হয়। তাই লৈঙ্গিক স্তর’-এর স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে ‘প্রাক্‌ উপস্থ’ স্তরের যৌনতার বিবর্তনের ধারাটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ফ্রয়েডের মতানুযায়ী

কোনো মানুষ যখন ‘উপস্থ স্তর’-এ উপনীত হয়, তখন তার পূর্বের ‘প্রাক্‌উপস্থ’ যৌন সুখানুভূতিগুলি বিনষ্টতো হয়ই না, উপরন্তু সেগুলি পরিণত স্তরের স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুখানুভূতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। উপস্থ স্তরের স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলি, যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি ‘প্রাক্‌উপস্থ’ স্তরের মুখকাম, পায়ুকাম প্রভৃতি পর্যায়ের যৌন-সুখানুভূতিগুলির সঞ্চার করে থাকে।

মানুষের জীবনধারার গঠন বা যৌন-বিকাশের যে স্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল, সেই স্তরগুলি যে সর্বদাই ক্রমিক পর্যায়ে বিকশিত হবে তা নয়। এই স্তর-বিন্যাসের কোনো স্পষ্ট সীমারেখা ফ্রয়েড প্রদান করেননি। এক্ষেত্রে কোনো একটি স্তর বিকাশের পূর্বে অন্য আর একটি স্তরের বিকাশ আরম্ভ হয়ে যেতে পারে, এমনকি একাধিক স্তরের বিকাশ একসঙ্গেও আরম্ভ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো শিশু যখন মুখকামের স্তর অতিক্রম করে পায়ুকামের স্তরে প্রবেশ করছে, তখন এমন হতেই পারে যে, ওই শিশুটি তার উভয় অঙ্গের দ্বারা উৎপন্ন সুখ একইসঙ্গে ভোগ করছে। যদিও মনে রাখা দরকার যে, ক্রমিক পর্যায়ে না ঘটলেও মানুষের জীবনের স্বাভাবিকতার জন্য উক্ত স্তরগুলির বিকাশ অত্যন্ত আবশ্যিক। জীবনের প্রতিটি স্তরের বিকাশ যথাযথ না হলে অস্বাভাবিক আচরণ এবং বিকৃত কামের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে ফ্রয়েডের অভিমত। এমনকি এটাও দেখা যায় যে, পরিণত যৌবনেও কোনো কোনো ব্যক্তি শৈশব-কামের সুখানুভূতি লাভ করতে চায়। সুতরাং মানুষ জীবনের অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রবাহকে রোধ করার জন্য প্রতিটি স্তরের বিকাশ অপরিহার্য।^৯

পূর্বোক্ত আলোচনায় মানুষের শৈশব ও যৌন বিকাশের বিভিন্ন স্তর বিন্যাসের যে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-কাঠামোর উপস্থাপনা করা হল, তা দর্শন তথা মনোবিদ্যার জগতে একটি বহুল আলোচিত ও সমালোচিত অধ্যায়রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। উক্ত তত্ত্ব-কাঠামোটি দর্শন তথা মনোবিদ্যার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করলেও তা সমালোচকদের দৃষ্টি থেকে রেহাই পায়নি। নারীবাদী দার্শনিক, এমনকি মূলস্রোতের

^৯ পুস্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড : মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৭০-২।

ধ্রুপদী দার্শনিকবৃন্দও ফ্রয়েডের ওই তত্ত্ব-কাঠামো প্রসঙ্গে সহমত ছিলেন না। আলোচ্যস্থলে নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিক তথা মনোবিদ ক্যারল গিলিগানের মত সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ফ্রয়েড প্রদত্ত সমগ্র তত্ত্ব-কাঠামোটির বিরুদ্ধে গিলিগান সাক্ষাৎভাবে কোনোপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করেছেন কিনা সেই বিষয়ে উপযুক্ত কোনো প্রমাণ নারীবাদী শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ফ্রয়েড সৃজিত তত্ত্ব-কাঠামোটির মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত নারী-পুরুষের নৈতিক বিচার ক্ষমতার মূল্যায়ন করে, যখন পুরুষকে নৈতিক বিচার বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পরিণত এবং নারীকে অপরিণত বলে মনে করা হয়, তখন গিলিগান বিরুদ্ধ মত পোষণ করে বলেন যে - ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-কাঠামোর এইপ্রকার ব্যাখ্যা স্পষ্টতই লিঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট এবং পিতৃতন্ত্রের মদতপুষ্ট।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-কাঠামোর বিরুদ্ধে গিলিগানের উক্তপ্রকার বিরোধিতার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। গিলিগান যখন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত তখন তাঁর সহকর্মী লরেন্স কোলবার্গ (Lawrence Kohlberg, 1927-1987)-এর সঙ্গে যৌথভাবে বয়ঃসন্ধিকালের কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কোনো একটি সমস্যার সমাধানকল্পে ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া মতামতের ভিত্তিতে তাদের নৈতিক বিচার ক্ষমতার মূল্যায়ন করা। এক্ষেত্রে কাদের নৈতিক বিচার কতোটা পরিণত সেই বিয়টিকে কেন্দ্র করে কোলবার্গ ও গিলিগানের মূল্যায়নের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক বিচার ক্ষমতার মূল্যায়নের জন্য কোলবার্গ ও গিলিগান যে সমস্যাগুলি তাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তার মধ্যে একটি হল, - হাইনজ্ নামে এক ভদ্রলোকের স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ, স্ত্রীর জন্য ওষুধ কেনার সামর্থ্য তার নেই, এবং দোকানদার ওষুধের দাম কমাতেও রাজী নয়। এখন প্রশ্ন হল, এমত পরিস্থিতিতে হাইনজের পক্ষে ওষুধ চুরি করাটা কি নীতিসঙ্গত হবে? লক্ষ করা গেল যে, প্রদত্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ছাত্ররা প্রথমেই বিচার করতে লাগলো যে কোন্ কোন্ নৈতিক আদর্শের সংঘাতের ফলে উক্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা

একাধিক নৈতিক অনুজ্ঞার অবতারণা করল - যেমন 'চুরি করা উচিত নয়', 'জীবহত্যা করা উচিত নয়', 'সর্বদা মানুষের জীবন রক্ষা করা উচিত' ইত্যাদি। অবশেষে ছাত্ররা প্রদত্ত সমস্যাটিকে কোনো বিশেষ সমস্যা হিসাবে না দেখে সেটিকে একটি সাধারণ দ্বিকল্পানুমানের (dilemma) আকারে সাজিয়ে ফেলল। তাদের মনে হল যে, 'সৎপথে চলা' এবং 'জীবন রক্ষা করা' - এই দুটি নৈতিক আদর্শের সংঘাতের ফলেই উক্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর তারা যুক্তির সাহায্যে তুল্যমূল্য বিচার করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, উক্ত দুটি অনুজ্ঞার মধ্যে জীবনরক্ষা করার অনুজ্ঞাটি অধিকতর ইষ্টপ্রদায়ী। সুতরাং স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য হাইনজের ওষুধ চুরি করাটা অনৈতিক হবে না। অপরপক্ষে ছাত্রীরা প্রদত্ত সমস্যাটির নানা ধরনের সম্ভাব্য সমাধানের কথা ভাবতে লাগলো। কেউ ভাবতে লাগলো যে, হাইনজ যদি ওষুধ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে হাজতে যায়, তাহলে তার অসুস্থ স্ত্রীকে পরিচর্যা করার জন্য আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। আবার কেউ পরামর্শ দিল যে, দোকানদারের কাছে ওষুধের দাম কম নেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা যেতে পারে। কেউ চিন্তা করতে থাকল যে, সকলের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করেও ওষুধের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা যায়। ছাত্রীরা নানা ধরনের পরিস্থিতি এবং নানা মত তথা নানা পথের সন্ধান দিলেও নির্দিষ্ট কোনো সমাধানের সপক্ষে নিজেদের রায় মূলতুবি রাখল।^{১০}

উপরোক্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক কোলবার্গ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, নৈতিক বিচার বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্ররা অধিক পরিণত। এইপ্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণস্বরূপ কোলবার্গ বলেন যে, যেহেতু ছাত্ররা বিমূর্ত তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েই প্রদত্ত সমস্যার সমাধান করেছে, তাই তুলনামূলকভাবে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ছাত্রী অপেক্ষা, ছাত্ররাই অধিক পারদর্শিতার বা পরিণত মনস্কতার পরিচয় দিয়েছে। ছাত্রীরা এক্ষেত্রে তত্ত্বরহিত চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে উক্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার ফলে, তাদের নৈতিক বিচারকে তিনি অপরিণত এবং দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে করেছেন।

^{১০} Carol Gilligan, et.al., *Mapping the Moral Domain*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, pp. 132-3.

বলাই বাহুল্য ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কোলবার্গ-এর গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে গিলিগান সহমত ছিলেন না।^{১১} তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া সমাধানের পার্থক্যকে পৃথকভাবে মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে লক্ষ করেন যে, সমস্ত ছাত্র প্রদত্ত সমাধানের মধ্যে যেমন একপ্রকার সাদৃশ্য আছে, ঠিক তেমনই সমস্ত ছাত্রী প্রদত্ত সমাধানের মধ্যেও একপ্রকার সাদৃশ্য বিদ্যমান। ছাত্রদের সমাধানের সাদৃশ্য হল তারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী, অপরপক্ষে ছাত্রীদের সমাধানের সাদৃশ্য হল তারা সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের অনুগামী। এইরূপ সাদৃশ্যের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কোনো নৈতিক বিচার লিঙ্গ অনপেক্ষতার দাবি রাখতে পারে না। গিলিগানের বক্তব্য হল, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সৃজিত লিঙ্গ পার্থক্যের প্রতিফলন তাদের নৈতিক বিচার ক্ষমতা এবং গৃহীত নৈতিক সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করে থাকে। গিলিগান মনে করেন যে, এযাবৎকাল ধরে নারীর নৈতিক বিচারধারাকে অপরিণত এবং পুরুষের নৈতিক বিচারধারাকে পরিণত বলে মনে করার পশ্চাতে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার লিঙ্গ রাজনীতির প্রভাব। এক্ষেত্রে বিমূর্ত তাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে নৈতিক বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করার ফলেই, ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক বিচার ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি বলেই গিলিগান মনে করেন। সেই কারণে তিনি নারীর নৈতিক বিচার ধারার সঠিক মূল্যায়নের জন্য পৃথক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

গিলিগানের মতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিণত পুরুষ তাঁর সৃজিত লিঙ্গ ধর্মকে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করে, পরিণত নারী তার লিঙ্গ ধর্মকে অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কারণ, একজন পুরুষ নিজের লিঙ্গ ধর্ম রক্ষার দায়বদ্ধতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, বয়ঃসন্ধিকাল থেকে ক্রমশ চেষ্টা করতে থাকে সমস্ত প্রকার সম্পর্কের ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে, যা কিনা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বপ্রয়োগে পটুত্ব অর্জন করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। অপরপক্ষে একজন নারী তার সৃজিত লিঙ্গ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, বয়ঃসন্ধিকাল থেকে নিজেকে প্রস্তুত করতে

^{১১} Ibid, pp. 23-4.

থাকে মাতৃত্বের ভূমিকা পালনের জন্য, এবং বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কের সার্থকতার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলে নিজের আত্মপরিচয়। তাই সে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বসাধনার জন্য অনুকূল পরিবেশ পায় না এবং চায়ও না। কারণ নারী তার সম্পর্কিত সত্তাটিকে লালন-পালন করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছে যে, কোনো সমস্যাকে নিছক নৈর্ব্যক্তিক বা বিমূর্ত তত্ত্বের নিরিখে বিচার করাটা প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিমতা বা যান্ত্রিকতার নামান্তর।

নারী যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিসরের মধ্যে থেকে নৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে নেয়, তাই সে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তটিকে মানবিক করে তুলতে প্রয়াসী হয়, এবং তার জন্য সে নির্বাচন করে নানা ধরনের বিকল্প পস্থা। অন্যদিকে পুরুষ যাবতীয় নৈতিক সমস্যাকে একটি একরৈখিক বিমূর্ত তত্ত্ব-কাঠামোর নিরিখে বিচার করে ন্যায্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অধিক আগ্রহী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নারীর লক্ষ্য হল নৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে যাপনের অনুষ্ণ সাপেক্ষে মানবিক করে তোলা, যেখানে আকারসর্বস্ব নিয়ম-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে উপাদানভিত্তিক বিভিন্নতাকে গ্রহণ করা সম্ভব হবে। অপরপক্ষে পুরুষের লক্ষ্য হল নৈতিক সিদ্ধান্তটির মাধ্যমে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা। ফলে এইস্থলে ন্যায্যতা ও মানবিকতার দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে গিলিগান মনে করেন যে, কোলবার্গ ভিন্নতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, একটি মানদণ্ডকে ধ্রুবসত্যরূপে স্বীকার করে নিয়ে, তার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা একমুখী, এবং নারীর প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে অন্তত একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-কাঠামো প্রসঙ্গে গিলিগানের বিরূপ মনোভাব পোষণের প্রেক্ষাপটটি কী ছিল। প্রাসঙ্গিকতার দিকে লক্ষ রেখে এখন ফ্রয়েডের সঙ্গে গিলিগানের মতপার্থক্যের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা আবশ্যিক।

ফ্রয়েড ও গিলিগান উভয়ই ছিলেন মনোবিদ। কোনো মানুষের শৈশব অবস্থা থেকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্ত তার 'ব্যক্তিক-সত্তা' কীভাবে গড়ে ওঠে এবং সেই অনুষ্ণে তার মানসিক বিকাশ কীভাবে সাধিত হয়ে থাকে, সে বিষয়ে উভয়ই তাঁদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। পার্থক্য শুধুমাত্র এই যে, ফ্রয়েড নারী-পুরুষ উভয় শিশুর 'ব্যক্তিক-সত্তা' গঠন এবং 'মানসিক-বিকাশ'-এর ধারাকে ব্যাখ্যা করেছেন যৌন-

পার্থক্যের ভিত্তিতে, কিন্তু গিলিগান লিঙ্গ পার্থক্যকেই নারী-পুরুষের ‘ব্যক্তিক-সত্তা’ গঠন এবং ‘মানসিক-বিকাশ’-এর কারণ বলে মনে করেছেন।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-কাঠামোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পুরুষকে ভাবকোটির সদস্যরূপে গণ্য করে সেই সাপেক্ষে নারীকে অভাবকোটিতে স্থান দেওয়া, এবং তার ভিত্তিতে নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করা। গিলিগান নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে স্বীকার করে নিলেও তিনি নারীকে অভাবযুক্ত হিসাবে দেখতে চান না। তাঁর মতে নারীর গুণাগুণ স্বভাবতই পুরুষের থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে যদি একটি বিশেষ মানদণ্ডকে আদর্শ বলে ধরে নিয়ে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি কার্যকরী করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ক্ষমতার রাজনীতিটি প্রকট হয়ে ওঠে। গিলিগানের মতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোতে নারী ও পুরুষের শৈশব অবস্থা থেকে পরিণত হওয়ার যাত্রাপথটি ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতাপ্রসূত। বিশেষত বয়ঃসন্ধিকালে এই অভিজ্ঞতার বৈপরীত্যও বিভিন্ন ধারায় বিধৃত। এক্ষেত্রে একজন পুরুষ বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হওয়ার পর নিজের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে, পরিবার তথা অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিধি অতিক্রম করে স্ব-রচিত জগৎ নির্মাণ করে। শৈশব অবস্থা থেকে পুরুষ শিশুর সঙ্গে তার মায়ের যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেই সম্পর্ক থেকে সে মুক্তি চায়, এবং তার জন্য নির্বাচন করে বিকল্প জীবন প্রণালী। হার্শম্যানকে অনুসরণ করে পুরুষদের জীবন গঠনের এইপ্রকার কৌশলকে গিলিগান ‘এক্সিট’ বা ‘নিষ্ক্রমণ’ প্রক্রিয়ার তুল্য বলে মনে করেছেন।^{১২}

অপরদিকে একজন নারী বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হওয়ার পর নিজের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় গঠনের তাগিদ অনুভব করে না, কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে পারিবারিক বৃত্তের বাইরে গিয়ে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। সেই কারণে নিজেকে পরিণত করে তোলার জন্য নারী শিশু তার মায়ের সঙ্গে নির্ভরশীলতার সম্পর্কটিকে অস্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করে না।

^{১২} Ibid, pp. 141-5.

উপরন্তু সে চায় নিজেকে মায়ের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করতে। এক্ষেত্রে নিষ্ক্রমণের কৌশল অবলম্বন না করে, নারী বেছে নেয় ‘ভয়েস’ বা ‘স্বরক্ষেপ’ এর প্রক্রিয়া। বিভিন্ন সম্পর্কগুলির চৌহদ্দির ভিতর থেকেই সে নিজের স্বরকে প্রতিষ্ঠা করে। হার্শম্যানকে অনুসরণ করে নারীর আত্মপরিচয় গঠনের উক্ত কৌশলকেই গিলিগান ‘ভয়েস’^{১০} বা ‘স্বরক্ষেপ’-এর প্রক্রিয়া নামে অভিহিত করে থাকেন।

সাধারণত মনে করা হয় যে যারা ‘এক্সিট’ বা ‘নিষ্ক্রমণ’-এর পন্থা নির্বাচন করে তারা অধিক পরিণত তথা স্বতন্ত্র, এবং যার ‘ভয়েস’ বা ‘স্বরক্ষেপ’ এর পন্থাকে নির্বাচন করে তারা অপেক্ষাকৃত কম পরিণত বা স্বতন্ত্রহীন। গিলিগান মনে করেন যে, সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও নিজের স্বতন্ত্র স্বর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করার জন্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাটা আবশ্যিক নয়। তাঁর মতে নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে সৃজিত হয় মানুষের ‘ব্যক্তিক-সত্তা’। সুতরাং সমস্তপ্রকার সম্পর্ককে ছিন্ন করে কোনো মানুষের ‘ব্যক্তিক-সত্তা’ গড়ে উঠতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গিলিগান পূর্ব-নির্ধারিত বা পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো বা কোনো ধারণার অনুষ্ঙ্গকে স্বীকার করেন না। সেই কারণে তিনি ধ্রুপদী ‘ব্যক্তিক-সত্তা’র আদর্শটিকেও অগ্রাহ্য করেছেন।

ধ্রুপদী মতাদর্শে ‘ব্যক্তিক-সত্তা’ বলতে মূলত আণবিক সত্তাকেই বোঝানো হয়ে থাকে, এবং এই মতানুসারে আরও মনে করা হয় যে, প্রতিটি ব্যক্তি যেমন একটি স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন সত্তা বা আণবিক সত্তার অধিকারী, ঠিক তেমনই তার মধ্যে সম্পর্কের বোধও থাকে, যদিও তা প্রয়োজনভিত্তিক। যাপনের প্রতিটি মুহূর্তে ব্যক্তিকে এই দুটি বিপরীত অবস্থানের মধ্য থেকে একটিকে নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কখনোই তার এই দুটি ভিন্ন অবস্থানকে একত্রে লালন-পালন করতে পারবে না। কারণ মনে করা হয়, এই দুটি অবস্থানের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ বর্তমান। ফলে একটি, অপরটিকে অগ্রাহ্য করেই প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে সে হয় স্বার্থচিন্তায় মগ্ন থাকে, অথবা

^{১০} “Voice is a new key for understanding the psychological, Social and cultural order-”, Carol Gilligan, *In a Different Voice*, Harvard University Press, Cambridge, 1993, p. XVI.

পরার্থভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে নিজের ‘ব্যক্তিক-সত্তা’ গঠনের জন্য ‘নিষ্ক্রমণ’ ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই বলেই ধ্রুপদী মতাদর্শীগণ মনে করেন।

গিলিগান এই প্রসঙ্গে ভিন্ন মতের উপস্থাপনা করে বলেন যে - যদি দুটি ভিন্ন সত্তার মধ্যে বিচ্ছেদ্য সম্পর্কের পরিবর্তে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করা হয়, তাহলে নিষ্ক্রমণের পস্থা অবলম্বন না করেও স্বরক্ষণের মাধ্যমে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব। তাই গিলিগান মনে করেন যে, সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকে নৈতিক বিচার সম্পন্ন করা বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারাটা নারীর অপরিণত মনস্কতার মাপকাঠি নয়, বরং এইজাতীয় নৈতিক অবস্থান পূর্ণাঙ্গ ‘ব্যক্তিক-সত্তা’র পরিচায়ক।

গিলিগান যেহেতু সম্পর্কিত সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাই তাঁর কাছে ‘ব্যক্তিক-সত্তা’ গঠনের অর্থ হল নিজের সম্পর্কিত সত্তাটিকে গড়ে তোলা। মূলস্রোতে মনে করা হয় যে, স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা অর্জন করতে গেল বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই প্রয়োজন, কারণ বিচ্ছিন্ন অবস্থান না থাকলে স্বাধীনতা উপভোগ করা সম্ভব নয়।^{১৪}

গিলিগান মনে করেন যে, সর্বদা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বনির্ভর আচরণ অনুষ্ঠিত করলেই স্বাধীনতা লাভ করা যাবে এমন নয়। আবার স্বাধীনতা লাভ করা ও সম্পর্কিত থাকার মধ্যে স্বরূপত কোনো বিরোধও নেই। এর অর্থ হল সম্পর্কের মধ্যে অবস্থান করে নিজের স্বাধীন স্বর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও স্বাধীনতা উপভোগ করা সম্ভব। ফলে স্বাধীনতার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কোনো আবশ্যিক যোগাযোগ নেই, সম্পর্কের মধ্যে থেকেও স্বাধীন হওয়া যায়। ধ্রুপদী নৈতিকতার পরিসরে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্যকে, কিন্তু গিলিগান ‘স্বাধীনতা’ বলতে বোঝেন ‘স্বাধীন স্বর’ প্রতিষ্ঠিত করতে পারার ক্ষমতাকে।

আলোচ্যস্থলে প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন হল - সম্পর্কের অনুষণকে মূলস্রোতের দার্শনিকরাও অগ্রাহ্য বা অস্বীকার তো করেননি, তাহলে গিলিগানের অভিমত সম্পর্কিত সত্তার বিশেষত্ব কী? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের পূর্বে মনে রাখা প্রয়োজন যে,

^{১৪} “The individualism defined by the ideal of the autonomous self reflects the value that has been placed on detachment- in moral thinking,...”, Carol Gilligan at. al., 2001, p. 6.

নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে গিলিগান চাইছেন নৈতিক বিচারের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তে একটি মানবিক রূপ ফুটে উঠুক, এবং এর জন্য প্রয়োজন একপ্রকার একাত্মতার বোধ যা কোনো বিচ্ছিন্ন অবস্থান থেকে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একমাত্র সম্পর্কিত সত্তার লালন-পালনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারে এইপ্রকার একাত্মতার বোধ। সম্পর্কিত সত্তা হল এমন এক সত্তা যা সর্বদাই কোনো না কোনো সম্পর্কে অবস্থান করে, এবং সম্পর্ক বহির্ভূত কোনো বিচ্ছিন্ন অবস্থান তার থাকে না। এইভাবে সম্পর্কিত থাকার মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে তার জীবনের অভিব্যক্তি। এখানে সম্পর্কিত হওয়া বলতে কোন সৃজিত সম্পর্ককে বোঝানো হয়নি। কারণ সৃজিত সম্পর্কগুলি এক বা একাধিক বিশেষ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত চুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠে, এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে চুক্তির অবসান ঘটিয়ে সম্পর্কটিও বিনষ্ট হয়ে যায়। মূলস্রোতের তাত্ত্বিকরা এইপ্রকার চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের কথাই স্বীকার করেন। যেমন জন রলস (John Rawls, 1921-2002)-এর মতে সম্পর্কমাত্রই তা হয় চুক্তিভিত্তিক, অথবা উচ্চ-নীচ স্তরবিশিষ্ট।¹⁵ যদিও সম্পর্কিত সত্তার এইরূপ বৈশিষ্ট্য গিলিগান সমর্থিত নয়।

গিলিগান স্বীকৃত সম্পর্কিত সত্তার ক্ষেত্রে সম্পর্কিত হওয়া বলতে বোঝায় একপ্রকার মানসিক অবস্থান বা মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে¹⁶ যা কিনা লিঙ্গ ধর্মপ্রসূত, এবং সেটি থাকার জন্যই একজন ব্যক্তি নিজেকে সর্বদা অপরাপর ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করে। স্ব-অপর ভেদবিশিষ্ট বিচ্ছিন্নতার বোধ এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এইজাতীয় সম্পর্কিত সত্তাবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি এক সম্পর্ক ছেড়ে অন্য সম্পর্কে গমন করলেও, কোনো না কোনো সম্পর্কে অবস্থান করাটা তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। কারণ সম্পর্কটিকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্য দিয়ে সে নিজে বেঁচে থাকে, এবং অন্যকেও বাঁচিয়ে রাখে। ফলত সম্পর্কগুলি এখানে একমুখী নয়, এগুলি হল একপ্রকার উভয়মুখী সম্পর্ক, যেখানে উভয়ই মনে করে যে, সম্পর্কটিই হল তাদের ধারক ও বাহক, এবং এইভাবে সম্পর্কিত থাকার মধ্য দিয়েই তারা খুঁজে পায় তাদের শারীরিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক বিকাশের পথ। গিলিগান চিরকালীন বা অপরিবর্তনীয়

¹⁵ শেফালী মৈত্র, ২০০৭, পৃ. ১৩১।

¹⁶ "I explore the psychological grounds for non violent human relations." Carol Gilligan, 1993, p. XIX.

কোনো সম্পর্কের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে একে-অপরের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কগুলি গড়ে ওঠে, এবং প্রয়োজন হলে স্বরক্ষণের মাধ্যমে সম্পর্কগুলির পরিবর্তন বা পরিমার্জনও সম্ভব।

উপরোক্ত সম্পর্কিত সত্তার অনুষণে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের যে পরিচয় পাওয়া গেল তার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে সম্পর্ক বলতে কোনো সংযোগাবস্থাকে নির্দেশ করা হয়নি। কারণ ‘সংযোগ’ সম্পর্কে সম্পর্কিত দুটি সত্তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সম্পর্কের বিনাশ হলেও, এক্ষেত্রে সম্বন্ধীরূপ সত্তাগুলির বিনাশ হয় না। এইস্থলে যে ধরনের সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হল ‘সমবায়’রূপ একপ্রকার সম্পর্ক, যেখানে সম্পর্কটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়, এবং সম্পর্কের বিচ্ছেদ মাত্রই তা বিনাশের নামান্তর। এইজাতীয় সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তির যেমনভাবেই হোক না কেন সম্পর্কটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সদা তৎপর। তারা সম্পর্কের পরিবর্তন চাইলেও সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কিত সত্তার যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল তার ভিত্তিতে আরও একটি প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায় যে, সম্পর্কিত সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কি কোনোপ্রকার স্বার্থবুদ্ধি থাকে না, নাকি তারা সর্বদাই পরার্থভাবনায় অনুপ্রাণিত, এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি ভাবটা সঙ্গত নয়। কারণ সর্বদাই কোনো না কোনো সম্পর্কে অবস্থান করার অর্থ এই নয় যে, তাদের কোনোপ্রকার স্বার্থবুদ্ধি থাকে না। সর্বদা সম্পর্কে যারা অবস্থান করেন তাদেরও স্বার্থবুদ্ধি, চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা সবই থাকে, কিন্তু তার সমস্তটাই গড়ে ওঠে সম্পর্কটিকে ভিত্তি করে। সম্পর্কিত সত্তার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে না থেকেও নিজের স্বার্থ এবং স্বাভাব্য উভয়ই বজায় রাখা সম্ভব। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কখনোই নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অন্যকে আঘাত বা তার প্রতি কোনো বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করেন না। কারণ এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে অন্যকে আঘাত করার অর্থ নিজেকে আঘাত দেওয়া। তাই সে ততটাই চায় যতটা সম্পর্কটিকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্য দিয়ে পাওয়া সম্ভব। ফলে প্রত্যেকের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা ভারসাম্য

বজায় থাকে - কোনো অবস্থাতেই বিবাদ বা দ্বন্দ্বিকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না। সম্পর্কিত সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যেহেতু উচ্চ-নীচ স্তরভেদ বা দ্বিস্তরীয় মনস্তত্ত্বের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না, তাই তারা পারস্পরিক সহানুভূতি বা সহমর্মিতার সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। এতদতিরিক্তভাবে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে একপ্রকার ‘সমভাব’ বা ‘Co-Feeling’^{১৭}-এর সম্পর্ক, যা সর্বপ্রকার ভেদাভেদ বিরহিত এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। গিলিগান ‘সমভাব’-এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্কের মাধ্যমেই বিকল্প নৈতিক তত্ত্ব রচনার পথ প্রশস্ত করেছেন, যেখানে যুক্তির পরিবর্তে স্থান পেয়েছে আবেগ ও অনুভূতি, ন্যায্যতার স্থান দখল করেছে মানবিকতা, সাম্যতা ও সমরূপিতার পরিবর্তে এসেছে বিভিন্নতা তথা বিষমরূপিতা এবং নৈর্ব্যক্তিকতার আসন অধিকার করেছে ব্যক্তিসাপেক্ষতা। এইপ্রকার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নৈতিক তত্ত্ব নারীবাদী দর্শনের ইতিবৃত্তে ‘দরদী নীতিতত্ত্ব’ (care ethics)^{১৮} রূপে খ্যাত। দরদী নীতিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ‘দরদ’ হল একটি নৈতিক সদগুণ যা ‘সমভাব’ বা ‘অন্যোন্ম-ভাব’-এর সমতুল। নিরালস্য প্রেক্ষিতকে অগ্রাহ্য করে, যাপনের অনুষ্ণকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নৈতিক প্রেক্ষাপটে সার্বজনীন নিয়ম-নীতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের দোলাচলকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত করার মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে উক্ত নৈতিক তত্ত্বের রূপরেখা।

মনে রাখা আবশ্যিক যে, গিলিগান দরদী নীতিতত্ত্বের একমাত্র প্রবক্তা নন। নারীবাদী নৈতিকতার পরিসরে দরদ ভিত্তিক ভিন্নধর্মী নীতিতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গেলেও, প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে বর্তমান আলোচনায় মূলত গিলিগান প্রবর্তিত দরদী নীতিতত্ত্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে যে, এইরূপ বিকল্প নীতিতত্ত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি কী, এবং সেগুলি মূলস্রোত অপেক্ষা কেনই বা ভিন্নতর? গিলিগান প্রদত্ত দরদী নৈতিকতার অনুষ্ণে ‘দরদ’ বলতে একধরনের নৈতিক আবেগ বা অনুভূতিকেই বোঝান হয়ে থাকে। অপরের প্রতি ‘দরদ’ প্রদর্শন করা, বা দরদী হওয়া এই নৈতিকতার অন্যতম একটি লক্ষ্য। অবশ্যই উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে দরদ

^{১৭} Carol Gilligan, at.al., 2001, p. 122-6.

^{১৮} Carol Gilligan, 1993, p. XIX.

প্রদর্শনের অর্থ সম্বেহ প্রশয় প্রদান করা নয়। নৈতিকতার প্রেক্ষিতে ‘দরদ’ বলতে বোঝায় অপরের সঙ্গে বা কোনো একটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে, সংবেদনশীল মনোভাবের ভিত্তিতে, কোনো আচরণকে আবেগ-অনুভূতিপূর্বক বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, উক্ত বিচার্য বিষয় সম্পর্কে মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এইজাতীয় বিচার কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো বা নিয়ম-নীতি নির্ভর নয়, এটি একান্তই নৈতিক কর্তার অনুভূতিজাত এক প্রক্রিয়া।

মূলস্রোতের নৈতিকতার সার্বজনীনতার ধারণাটিকে গিলিগান তাঁর দরদী নীতিতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে বর্জন করেছেন। তিনি মনে করেন, মূলস্রোতের নৈতিকতায় সার্বজনীনতারূপ বৈশিষ্ট্যটি গড়ে উঠেছে সমরূপিতার উপর ভর করে। সেক্ষেত্রে সমরূপিতার ভিত্তিতে গৃহীত সার্বজনীন নিয়ম-নীতির সৌজন্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী মানুষজন নির্বাসিত হয় প্রান্তিক অবস্থানে, ফলে সমাজে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষই নৈতিকতার পরিধির বাইরে চলে যায়। মূলস্রোতে মনে করা হয় যে, নৈতিকতা কেবলমাত্র সুস্থ-স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত প্রযুক্ত। তাই নৈতিক নিয়ম-নীতি গঠন ও তার প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার পায় তথাকথিত সুস্থ-স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রেক্ষিতে, এবং অবশিষ্ট অবহেলিত ব্যক্তির নৈতিক নিয়ম গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, বিচার-বহির্ভূত অবস্থানেই থেকে যায়। এক্ষেত্রে যৌক্তিকতা সাবালকত্বের নিদর্শনরূপে গৃহীত হওয়ার ফলে যাবতীয় নিয়ম-নীতি হয় যুক্তিনির্ভর। ফলস্বরূপ মানুষের যাপনের অভিজ্ঞতাগুলির জটিলতা ও বিভিন্নতাগুলি সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞার কবলে পতিত হয়, এবং নৈতিক অনুভূতিগুলি কার্যত মূল্যহীন হয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে গিলিগান মনে করেন যে মূলস্রোতের নৈতিকতায় বিভিন্নতাগুলিকে একটি সার্বিক কাঠামোযুক্ত ন্যায়নিষ্ঠতার আওতায় আনার দাবি জানানো হলেও, সেক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে একধরনের উচ্চ-নীচ স্তরবিশিষ্ট মানসিকতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাই গিলিগান বিভিন্নতাগুলিকে নৈতিক বিচারের আওতাধীন করার লক্ষ্যে, সার্বিক নিয়ম-নীতির অস্তিত্বকে দরদী নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

দরদী নৈতিকতায় দরদভিত্তিক ক্রিয়া বা আচরণগুলি নিয়ম-নীতি নির্ভর না হলেও, সেগুলিকে সার্বজনীন হিসাবে দাবি করা হয়ে থাকে। কারণ বাস্তবে দরদের একটি সার্বিক চাহিদা আছে বলেই দরদী নীতিতাত্ত্বিকরা মনে করেন। তাঁদের বক্তব্য হল সবাই যদি নিজের ক্রিয়া বা আচরণের উদ্দেশ্যরূপে দরদকে গ্রহণ করে, তাহলে নৈতিকতার পরিমণ্ডলে দরদের একটি সার্বিক রূপের প্রকাশ পরিলক্ষিত হবে। পাশাপাশি এইস্থলে স্বার্থপরতার পরিবর্তে একধরনের স্ব-অভিমুখী চিন্তা-ভাবনাও থাকবে, কারণ সবাই দরদের মাধ্যমে একে-অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে এমন এক জগৎ গঠনের প্রতি মনোযোগী হবে যা প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে বসবাসের অনুকূল। এক্ষেত্রে সকলেই অপরের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বার্থটিকেও রক্ষা করতে পারবে। প্রতিটি মানুষ যেহেতু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং তাদের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস সমস্ত কিছুই ভিন্ন ভিন্ন, তাই অন্যকে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বোঝাটাও আবশ্যিক। এইপ্রকার পারস্পরিক বোঝাপড়া একে-অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে বলেই দরদী নীতিতাত্ত্বিকদের অভিমত।

গিলিগান নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-শিশু, এবং সুস্থ-স্বাভাবিক থেকে শুরু করে অসুস্থ-অস্বাভাবিক, অর্থাৎ সকল মানুষজনকে নৈতিকতার পরিধিতে স্থান দেওয়ার লক্ষ্যে, নারীসুলভ গুণগুলিকে ভিত্তিমূলে স্থাপন করার মধ্য দিয়েই দরদী নীতিতত্ত্বরূপ বিকল্প নীতিতত্ত্ব গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। নৈতিকতা বলতে ঠিক কী বোঝায় সেই বিষয়ে একটা ধারণাগত পরিবর্তন তিনি চাইছেন, এবং একইসঙ্গে নৈতিক বিচারের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের দাবিও জানিয়েছেন। এইপ্রসঙ্গে গিলিগান নারীর যাপনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা ‘ভিন্নস্বর’ (different voice)-এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই ভিন্নস্বরের মাধ্যমেই সকল ব্যক্তি একে-অপরের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নিজেদের সম্পর্কিত সত্তাটিকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং সম্পর্কের সুস্বাস্থ্যটিকেও বজায় রাখতে পারবে বলেই তাঁর অভিমত। নারীর যাপনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই ‘ভিন্নস্বর’ কোনো সৃজিত স্বর নয়। এটি একপ্রকার আভ্যন্তরীণ অনুভূতি, যা সংযুক্তি তথা সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

ভিন্নস্বরের কোনো অভিন্ন প্রকার গিলিগান প্রদান করেননি। তাঁর মতে এই স্বর একান্তই ব্যক্তিসাপেক্ষ, যা নির্মিত হয় ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে এবং প্রযুক্ত হয় ‘বলা-শোনা’ (Oral Aural)¹⁹ পরম্পরার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নিজস্ব উপলব্ধিগুলিকে সঠিকমাত্রায় অনুধাবন করলেই হবে না, সেগুলিকে যথাযথ স্বরক্ষেপের মধ্য দিয়ে অন্যের কাছে শ্রাব্য করে তুলতে হবে। এইভাবে পারস্পরিক বক্তব্যকে মনোযোগ সহকারে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একে-অপরের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারলে প্রশস্ত হবে দরদী নৈতিকতার পথ।

মূলস্রোতের নৈতিকতায় পারস্পরিক পরামর্শদানের বিষয়টিকে অহেতুক বলে মনে করা হয়। যদিও দরদী নৈতিকতা ‘পরামর্শমূলক’ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একজন নৈতিক কর্তা বিচ্ছিন্ন অবস্থান থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। তিনি সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ গ্রহণপূর্বক বিচার-বিবেচনার মাধ্যমেই নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। এইস্থলে পরামর্শ গ্রহণের মধ্য দিয়েই কোনো ব্যক্তি অপরাপর ব্যক্তিকে গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সম্পর্কের মধ্যেই মর্যাদার অধিষ্ঠান। দরদী নৈতিকতায় বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে কাউকে মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে করা হয়। এক্ষেত্রে পারস্পরিক কথোপকথন বা পরামর্শদানের বিষয়ে কেবলমাত্র অপরের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাই নয়, এক্ষেত্রে অপরের সম্ভাব্য বক্তব্য অথবা না বলা বাণীগুলিকেও শোনার বা বোঝার চেষ্টা করা হয়। সেই কারণেই দরদী নৈতিকতা বহুলাংশেই কল্পনাপ্রবণ হয়ে থাকে।

ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচনা করা হয় বলে দরদী নৈতিকতায় নৈতিক বিচার সর্বদাই পরিস্থিতিনির্ভর। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কগুলি কীভাবে ব্যাখ্যাত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে নৈতিক বিচারের সিদ্ধান্ত। অপরের সাপেক্ষ প্রেক্ষিত তথা পরিস্থিতিগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা এইজাতীয় নৈতিকতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

¹⁹ Ibid, p. XVII-XVIII.

সেই কারণে দরদী নৈতিকতায় কোনো একটি কাজের জন্য একক কর্তাকে সাক্ষাৎভাবে দায়ী করা হয় না। কোন্ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সে ওই কাজটি করেছে, বা কাজটি করার পিছনে কোনোরকম বাধ্যবাধকতা ছিল কিনা, সেইসব বিষয়গুলিও এই নৈতিকতায় বিচারের আবশ্যিক মাত্রা হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে।

মূলস্রোতের নৈতিকতায়, কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে সেই কাজের দায় একান্তভাবে কর্তার উপরেই বর্তায়। কারণ এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, স্বাধীন ব্যক্তিকৃত ঐচ্ছিক ক্রিয়াই নৈতিক বিচারের বিষয়রূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য, এবং সেই কাজের ভাল-মন্দের দায়ভার ওই কর্তাকেই বহন করতে হবে। মূলস্রোতে, নিজের প্রতি ভালোবাসা থাকাটা একটি সার্বিক নীতি হিসাবে বিবেচিত। কারণ বাস্তবে প্রতিটি মানুষই চায় নিজেকে ভালোবাসতে। সুতরাং এই সার্বিক নীতিটিকে লঙ্ঘন করে যদি কেউ আত্মহত্যা করতে চায়, তাহলে সেটি একটি অনৈতিক ক্রিয়ারূপে গণ্য হবে, এবং স্বাভাবিকভাবেই এই কাজের দায় কর্তার উপরেই বর্তাবে। এক্ষেত্রে অনৈতিক কাজের জন্য কর্তাকে দায়ী করা হলেও, ওই ব্যক্তিকৃত কর্মের দ্বারা তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির কোনোরূপ ক্ষতিসাধন হল কিনা, সে বিষয়ে কোনো দৃষ্টিপাত করা হয় না। অপরপক্ষে দরদী নৈতিকতার পরিসরে কোনো কৃতকর্মের দায় সাক্ষাৎভাবে কর্তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না। এইস্থলে নৈতিক বিচারের বিষয়রূপে নিছক কর্তাকে গ্রহণ করা হয় না, সম্পর্কগুলিও এক্ষেত্রে নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। সম্পর্কিত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করার জন্যই দরদী নীতিতত্ত্বে কোনো কাজের জন্য এককভাবে কোনো কর্তাকে দায়ী করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নৈতিক কর্তার কোনো আচরণের দ্বারা সম্পর্কগুলি কতটা প্রভাবিত হল, তা দরদী নৈতিকতার অন্যতম বিচার্য একটি বিষয়। কারণ মনে করা হয় যে, সম্পর্কগুলির সুস্বাস্থ্য বজায় থাকলেই ওই সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

দরদী নৈতিকতায় ব্যক্তিকৃত ক্রিয়া বা আচরণের ভালো-মন্দ বিচারের কোনো আবশ্যিক বা পর্যাপ্ত মানদণ্ড নেই। কর্তার নিজের উপরেই অর্পিত থাকে তার কাজের

ভালো-মন্দ বিচারের দায়ভার। সুতরাং এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতিভিত্তিক বাহ্য নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই, আছে কেবল স্ব-নিয়ন্ত্রণের ধারণা।

গিলিগান যেহেতু পূর্বতসিদ্ধ কোনো কাঠামো বা প্রকার স্বীকার করেন না, তাই তাঁর মতে সামাজিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে নির্মিত হবে নৈতিক সত্তা তথা নৈতিক-জগৎ। সেই কারণেই দরদী নৈতিকতার লক্ষ্য যে ধরনের নৈতিক জগৎ, তা পূর্ব অস্তিত্বশীল কোনো জগৎ নয়। সম্পর্কিত সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দরদী ক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই রচিত হবে উক্ত নৈতিক জগৎ গঠনের আখ্যান। দরদী নৈতিকতায় দরদের সার্বিক চাহিদার কথা স্বীকার করা হলেও, সকলকে ভালোবাসার বা সকলের প্রতি দরদ প্রদর্শনের দাবি জানানো হয় না। অর্থাৎ সার্বিক ভালোবাসার ধারণাটিকে এক্ষেত্রে খারিজ করে দেওয়া হয়। সম্পর্কের পরিসরে আমরা যাদের সঙ্গে যুক্ত হই বা যারা আমাদের যাপনের প্রেক্ষাপটের অঙ্গীভূত হয়ে থাকে, তাদের প্রতি দরদ প্রদর্শনের কথাই বলা হয়। কারণ এক্ষেত্রে আমরা এমন এক নৈতিক-জগৎ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ যেখানে আমরা সবাই একে-অপরের প্রতি যথাসম্ভব দরদী হব। উপরন্তু গিলিগান মনে করেন যে, ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে আবশ্যিকভাবে দরদ নাও থাকতে পারে। ব্যবহারিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে বিভিন্ন মানুষজন প্রকৃত দরদী আচরণ না করে, নিজেদের সাপেক্ষ ভালোবাসাগুলি অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে তার চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করে থাকে। তাই গিলিগানের অভিমত হল - ভালোবাসার সম্পর্কের দ্বারা আমরা যখন অন্যের সঙ্গে যুক্ত হই, তখন সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা যেন অন্যের জন্য অনুভব না করে, অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে অনুভব করতে পারি। অর্থাৎ একে-অপরের মধ্যে সম্ভাবের ভিত্তিতেই যেন গড়ে ওঠে ভালোবাসার সম্পর্ক।

দরদী নৈতিকতার ধারণাগত কাঠামোটি সম্পর্কিত সত্তার আনুষঙ্গিক প্রেক্ষিতগুলির ভিত্তিতে গড়ে ওঠার ফলে এই নৈতিকতার পরিসরে দ্ব্যর্থকতা বা অস্পষ্টতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই নীতিতত্ত্ব সুনির্দিষ্ট কাঠামোযুক্ত বা নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি নির্ভর না হওয়ায়, যখন বিষমরূপী সাপেক্ষ বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে কোনো নৈতিক বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়, বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

হয়, তখন সেই নৈতিক বিচারের প্রক্রিয়া বা গৃহীত সিদ্ধান্তে অস্পষ্টতার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কারণ পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিভেদে সাপেক্ষ বিষয়গুলি ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বিচার এবং সিদ্ধান্তের ধরণগুলিও পরিবর্তিত হতে থাকে, ফলে অস্পষ্টতাগুলিকে দূর করা সম্ভবপর হয় না। মূলস্রোতে এইজাতীয় অস্পষ্টতাগুলিকে অক্ষমতার সূচক হিসাবে গণ্য করা হলেও, গিলিগান নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে অস্পষ্টতা তথা অনেকার্থতাকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

গিলিগানের মতানুসারে দরদী নীতিতত্ত্ব নারীসুলভ গুণাবলীর ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাক্ষিত 'শুভজীবন' গঠনের ক্ষেত্রে উপযোগী এবং সামগ্রিকভাবে হিতসাধক। তাই তিনি ধ্রুপদী নৈতিকতার বিমূর্ত যৌক্তিকতাকে নৈতিক প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। বিমূর্ত যৌক্তিক আদর্শের ভিত্তিতে গৃহীত শুভ জীবনের ধারণাটিকে তিনি আকারসর্বস্ব বলে দাবি করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃত 'শুভ জীবন' প্রদান করাটা যদি নৈতিকতার লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে দরদী ক্রিয়াগুলিই হল সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য উপায়। কারণ দরদের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তির যাপনের অনুষ্ণ এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিগুলিকে পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয়, ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ 'শুভ জীবন' গঠনের অনুকূল পরিবেশ রচনার পথও প্রশস্ত হয়ে থাকে।

গিলিগান বিমূর্ত নিরপেক্ষ যুক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও, সাপেক্ষ যুক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন, যা সকল মানুষের মধ্যে নানারূপে বিদ্যমান। তিনি দরদ এবং সাপেক্ষ যুক্তিকে একে-অপরের পরিপূরকরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃতিগতভাবে মানুষের যাপনের অভিজ্ঞতাগুলি খণ্ডিত নয় প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেমন আবেগ-অনুভূতি-দরদ ইত্যাদির উপস্থিতি লক্ষ করা যায় ঠিক তেমনই যুক্তির উপস্থিতিও অনস্বীকার্য। মানুষ তার সত্তার এই দুই গুণের সংযুক্ত সহাবস্থানকে পৃথক করতে পারে না, বা একটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে অপরটিকে অবহেলা করতে পারে না। এইপ্রসঙ্গে গিলিগানের বক্তব্য হল বহুধা বিস্তৃত নৈতিক দ্বন্দ্বগুলির সমাধান বিমূর্ত সার্বিক নীতির দ্বারা সম্ভব নয়, এবং বিভিন্নপ্রকার সামাজিক ও নৈতিক পরিস্থিতিগুলি বিচারের জন্য

সার্বিক নিয়ম যথোপযুক্ত নয়। তাঁর মতে একটি নৈতিক বিচার তখনই সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, যখন তা যুক্তি এবং আবেগের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের পরিমণ্ডলে গৃহীত হবে। এইস্থলে অবশ্য উল্লেখ্য যে গিলিগান প্রবর্তিত দরদী নৈতিকতায় যুক্তি বলতে যেমন বিমূর্ত যুক্তিকে বোঝানো হয় না, একইভাবে আবেগ বা অনুভূতি বলতে যেকোনো ধরনের আবেগ বা অনুভূতিকেও বোঝান হয় না। এক্ষেত্রে যুক্তি বলতে যেমন সাপেক্ষ যুক্তিই গিলিগানের অভিমত, ঠিক তেমনই আবেগ বা অনুভূতি বলতে ‘সমভাব’ একমাত্র অভিপ্রেত। এইপ্রকার ‘সমভাব’-এর স্বরূপ ভাষায় প্রকাশ করা একটি দুরূহ প্রচেষ্টামাত্র। একমাত্র অনুভূতিতেই এর উপস্থিতি ধরা পড়ে।

যুক্তিবিজ্ঞান :

চরমপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন, যুক্তির সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় আকারসর্বস্ব যুক্তিবিজ্ঞানের ধ্রুপদী ঘরানায়, যার প্রয়োগের ফলে কেন্দ্র থেকে বহির্ভূত হয়ে নারী প্রান্তিক অবস্থানে ঠাঁই পায়। এক্ষেত্রে নারীর যে বিবর্জন তা বিজ্ঞান বা দর্শনের থেকেও ভয়ঙ্কর। এযাবৎ মনে করা হত যে, যুক্তিবিজ্ঞান হল নিরপেক্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কিন্তু চরমপন্থী নারীবাদীরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন এহেন যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামো কীভাবে অবদমনমূলক সম্বন্ধের ভিত্তিতে আকারিত হতে পারে। যদিও অধিকাংশ নারীবাদী ধ্রুপদী আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেও, তাঁরা যুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার স্বপক্ষে কোনো দাবি সচরাচর উত্থাপন করেন না। অনেক নারীবাদী আবার যুক্তির প্রয়োগ কৌশলের পরিবর্তন বা বিকল্প অনুসন্ধানের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত কম সমস্যাপূর্ণ যুক্তির ব্যবহারকে সমর্থন করেন – একমাত্র যুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা পরিত্যাগ এবং প্রত্যাখ্যানমূলক চিন্তা-ভাবনা গ্রহণ করে থাকেন। কারণ তাঁরা মনে করেন যুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, তা আকার গত হোক বা না হোক – সর্বদাই সীমাহীন বিমূর্তকরণ এবং অপরের উপর প্রভুত্ব কায়েমের এক নির্ভরযোগ্য পরিসর রচিত হয়ে থাকে।

আমরা জানি, ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞান দ্বি-মাত্রিক কাঠামোবিশিষ্ট, যেখানে একটি মাত্রা অপরটির নিষেধকে সূচিত করে। এইপ্রকার নিষেধ (negation)-এর মাধ্যমে ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞানের অবদমনমূলক চরিত্রটি প্রকট হয়ে ওঠে। নারীবাদী চিন্তাবিদ ভ্যাল প্লামউড (Val Plumwood, 1939-2008) মনে করেন যে, এই অবদমন কেবলমাত্র নারীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীও এর শিকার হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের অবদমনমূলক চিন্তন কাঠামোর মধ্যে থেকে শুধুমাত্র পুরুষ-প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে তা নয়, প্রভুত্বকামী মনোভাবের পরিচয়ও প্রকাশ পায়।^{২০} ফলে দ্বি-মাত্রিক কাঠামোবিশিষ্ট যুক্তিবিজ্ঞানের সৌজন্যে পুরুষ অবতীর্ণ হয় প্রভুর ভূমিকায়। বিভাজন থেকে জন্ম নেয় দ্বৈততাবিশিষ্ট মনোভাব যার ফলে নারী ‘অপর’ (other) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। নিছক ভেদ অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু ভেদক যদি দ্বৈততার সূচক হয়, তাহলেই গড়ে ওঠে অপরের ধারণা, রচিত হয় নারীর শোষণ ও অবদানের প্রেক্ষাপট। সুতরাং দ্বৈততা, বিভেদ এবং অপর এই প্রত্যয়গুলির আমূল সংস্কার করাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। নারী তথা অপরাপর প্রান্তিক গোষ্ঠীর অবমূল্যায়নের কারণস্বরূপ যৌক্তিকভাবে গঠিত এই প্রত্যয়গুলিকে প্লামউড দোষদুষ্ট বলে চিহ্নিত করে থাকেন। কীভাবে বিভেদের ভিত্তিতে সামাজিক উচ্চ-নীচ স্তর বিন্যাসের অনুঘটকরূপ দ্বৈততার ধারণাটি নারীকে অভাবযুক্ত ‘অপর’ হিসাবে অবমূল্যায়িত করে থাকে, সেই ব্যাখ্যা দান করাই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য।

আধুনিক চিন্তাধারার যে সমস্ত দ্বৈততাবিশিষ্ট বিপরীত ধর্মযুক্ত যুগ্মর সন্ধান পাওয়া যায়, প্লামউড তার একটা সম্ভাব্য তালিকা প্রদান করেছেন। তালিকাটি হল^{২১} – সংস্কৃতি ও প্রকৃতি, যুক্তি ও প্রকৃতি, নারী ও পুরুষ, প্রভু ও ভূত্য, সামান্য ও বিশেষ, বিষয়ী ও বিষয়, মন ও দেহ, স্ব ও অপর, ইত্যাদি। এই যুগ্মগুলির ভিত্তিতে চূড়ান্ত বর্জনমূলক নীতি প্রয়োগ করে অপরের নির্মাণকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বৈধ করে তোলা হয়। এক্ষেত্রে যদি চিরাচরিত দ্বি-বিভাজনের তালিকাটির দিকে লক্ষ করা

^{২০} Val Plumwood, “The Politics of Reason : Towards a Feminist Logic”, in *Australasian Journal of Philosophy*, Vol. 71, No. 4, 1993, p. 442.

^{২১} Ibid, p. 443.

যায় তাহলে দেখা যাবে যে, পুরুষসুলভ গুণগুলি হয়ে উঠেছে অনপেক্ষ মানবধর্মের প্রতীক, এবং তার বিপরীত গুণগুলি সর্বদাই নারীর সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ হিসাবেই প্রতিকায়িত হয়ে চলেছে। ফলত নারীর শোষণ ও অবদমনের কারণ এই নয় যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সে অপর, বরং দ্বৈততাবিশিষ্ট অপরের ধারণাটি নারীকে প্রান্তিক অবস্থানে নিমজ্জিত করে, যেখানে নারী কেবল অপর নয়, সে দ্বৈততাবিশিষ্ট, অভাবযুক্ত, নিষেধমূলক, অধীনস্থ অপর। যুক্তির অধিকার থেকে নারী বঞ্চিত হয়ে আবেগসর্বস্ব অনুভূতিপ্রবণ শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্লামউড মনে করেন, দ্বি-মাত্রিক বিভাজন (dichotomy)-এর সঙ্গে দ্বৈততা (dualism)-এর পার্থক্যকরণ^{২২} আবশ্যিক। তাঁর মতে দ্বি-বিভাজন বলতে দুই ধরনের বস্তু বা বিষয়ের মধ্যকার বিভেদকে বোঝা যেতে পারে। ফলত দ্বি-বিভাজন হল প্রচলিত বিভেদ বা পার্থক্য। দ্বৈততা হল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভেদ। সেক্ষেত্রে প্রচলিত বিভেদের সঙ্গে যুক্ত হয় বিশেষ প্রকারের ধারণাগত কাঠামো, যার মাধ্যমে সামাজিক উচ্চ-নীচ স্তরভেদ ও অস্বীকৃত নির্ভরশীলতার সম্পর্কটির দ্বারা অভাবযুক্ত বা নিষেধাত্মক অপর-এর নির্মাণ যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সাধারণ দ্বি-বিভাজন অতিরিক্তভাবে দ্বৈততাবিশিষ্ট দ্বি-বিভাজন পদ্ধতিগতভাবে অপরকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করে থাকে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিটি দ্বি-বিভাজন আবশ্যিকভাবে দ্বৈততায় পর্যবসিত হয় তা কিন্তু নয়।

যুক্তিপ্রয়োগের যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলি দ্বৈততার সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে থাকে, প্লামউড তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন^{২৩}, সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল -

পশ্চাৎসরণ (Backgrounding) : দ্বৈততাবিশিষ্ট চিন্তনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল পুরুষকে সম্মুখপটে রেখে পশ্চাৎপটে নারীর স্থান সুনির্দিষ্ট করা। এক্ষেত্রে পুরুষকে দেখা যায় প্রভুর ভূমিকায় এবং নারী হয়ে যায় অপর। প্রভুর অবদমনমূলক মনোভাবের

^{২২} “It is essential to distinguish between dualism and dichotomy”, Ibid, p. 446.

^{২৩} Ibid, pp. 447-52.

জন্য প্রভুর সঙ্গে অপরের অপ্রতিরোধ্য দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ প্রভু সর্বদাই অপরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এই নির্ভরশীলতার সম্পর্কটিকে সে অস্বীকার করে চলে। নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে ব্যবহার করা, এবং অপরের সেবার উপর ভরসা করা সত্ত্বেও তাকে নিজের জীবনে অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করতে প্রভু নানা কৌশল অবলম্বন করে। এমনকি অপরের বাস্তবতাগুলিও অস্বীকৃত হয়ে পড়ে। প্রভু নিজের এবং অপরের কার্যকলাপের মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাসকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করে, যার জোরে প্রভু সম্মুখপট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অপরের নির্বাসন ঘটে পশ্চাৎপটে। যদিও প্লামউড মনে করেন, উক্ত প্রভুত্বকামী মনোভাব প্রকৃতপক্ষে ভ্রমাত্মক, কারণ প্রভুর পরিচয় সর্বদাই অপর বা ভৃত্য সাপেক্ষেই নির্মিত হয়। একইভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রান্ত আছে বলেই কেন্দ্র নির্মিত হয়। প্রান্ত না থাকলে প্রেক্ষাপট বিযুক্ত কেন্দ্র আর কেন্দ্র থাকতে পারবে না। এছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে বেঁচে থাকার জন্য বা নানান দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রেও অপরের উপর প্রভুর নির্ভরশীলতা অনস্বীকার্য, কিন্তু বাস্তবে অপরের অবদান ও তার ভূমিকা ক্রমাগত অস্বীকৃত হওয়ার ফলে ‘অপর’ দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে যায়।

চূড়ান্ত বর্জন বা অতি বিচ্ছেদ (Radical Exclusion) : দ্বৈততাবিশিষ্ট মনোভাবের ফলস্বরূপ অপরকে শুধুমাত্র নিজের থেকে ভিন্ন হিসাবে দেখা হয় তাই নয়, তাকে নিকৃষ্টরূপে গণ্য করা হয়। এইস্থলে যে ভিন্নতা প্রতিপাদিত হয় তা নেহাত বিভেদ নয়, তা হলো চূড়ান্ত বর্জনমূলক বিভেদ। একইভাবে এখানে পৃথকীকরণ বলতে বুঝতে হবে অতি-বিচ্ছেদমূলক অবস্থানকে। এইপ্রকার চূড়ান্ত বর্জন ও অতি-বিচ্ছেদই হল দ্বৈততার প্রধান নির্দেশক। সাধারণত বিভেদ বা পার্থক্য বলতে বোঝায় ভিন্নতাকে যেখানে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম কোনো একপক্ষে উপস্থিত থাকে, অন্য পক্ষে থাকে না। দ্বৈততার ধারণাটি এমন সরলীকৃত পার্থক্যের ভিত্তিতে রচিত নয়। সেক্ষেত্রে প্রভু সর্বোচ্চ বিচ্ছেদ অর্জন করার জন্য বিভেদের মাত্রা ও গুরুত্ব বৃদ্ধির উপর জোর দিয়ে সেগুলিকে অতিরঞ্জিত করে তোলে, এবং তার ফলস্বরূপ অপরের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিও অবজ্ঞার কবলে পতিত হয়। চূড়ান্ত বর্জনমূলক নীতির আদর্শ হল

অপরকে কেবল ‘অপর’ হিসাবে না দেখে ‘নিকৃষ্ট অপর’ হিসাবে দেখা। সেই কারণে অবদমিত এবং অবদমনকারীর মধ্যে ন্যূনতম ধারাবাহিকতাকেও অস্বীকার করা হয়। এমনকি ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভ্রান্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও থাকে না। দ্বৈততাবিশিষ্ট যেকোনো নির্মাণের মূল লক্ষ হল মেরুকরণকে প্রতিষ্ঠা করা। ফলত দ্বৈততার ক্ষেত্রগুলিতে অপর-এর সঙ্গে সর্বোচ্চ দূরত্ব বা অতি-বিচ্ছেদ বজায় রাখা জরুরি হয়ে পড়ে।

প্লামউড মনে করেন, সমাজে লিঙ্গ ধর্মের মেরুকরণের ক্ষেত্রেও দ্বৈততাবিশিষ্ট নির্মাণের পরিচয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়ে ওঠে। যেকোনো দ্বৈততাবিশিষ্ট নির্মাণের বৈশিষ্ট্য হল একপক্ষকে উৎকৃষ্ট হিসাবে গণ্য করে, অপরপক্ষকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করা। নারী ও পুরুষের লিঙ্গ ধর্মের মধ্যেও দ্বৈততাবিশিষ্ট বিভাজন করা হয় বলে, সেক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, নারীর লিঙ্গ ধর্মগুলি স্বভাবতই গৃহীত হয় পুরুষের লিঙ্গ ধর্মের পরিপূরক বিন্যাস হিসাবে। যেমন, পুরুষ যদি সক্রিয়, বৌদ্ধিক, অহমকেন্দ্রিক, প্রতিযোগী এবং অবদমনকারীরূপে গণ্য হয়, তাহলে নারী হবে নিষ্ক্রিয়, অনুভূতিপ্রবণ, পরকেন্দ্রিক, প্রতিপালনকারী এবং অধীনস্থ। সুতরাং দেখা গেল যে, নারী ও পুরুষের সমাজ আরোপিত লিঙ্গ ধর্মগুলি পরস্পর বিরোধী, যদিও নারীবাদীরা দ্বৈততাবিশিষ্ট মেরুকরণের ভিত্তিতে বিন্যস্ত বিভাজনকে মিথ্যা বলে দাবি করেন, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেগুলিকে কম বিরোধী শব্দের দ্যোতনায় প্রকাশ করা সম্ভব বলেই তাঁদের অভিমত। নারী-পুরুষের লিঙ্গ ধর্মকে তাঁরা পরস্পর বিরুদ্ধ হিসাবে না দেখে, সমাপতিত বৈশিষ্ট্য হিসাবে তুলে ধরতে চান।

সম্বন্ধ সূচক সংজ্ঞা (Relational Definition) : দ্বৈততাবিশিষ্ট নির্মাণের একটি বৈশিষ্ট্য হল সেখানে প্রভুর লক্ষণ নির্ধারিত হয় অপরের সঙ্গে তার সম্বন্ধের ভিত্তিতে। যেহেতু প্রভুর সঙ্গে অপরের যে সম্বন্ধ তা বর্জনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত, ফলত দ্বৈততাবিশিষ্ট যুগ্মের মধ্যে প্রভুর স্থান উচ্চকোটিতে এবং অপরের স্থান নিম্নকোটিতে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে নিম্নকোটির সদস্যরা সর্বদাই উচ্চকোটির সদস্যদের অভাব বা নিষেধ যুক্ত হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়। উচ্চকোটির সদস্যরা দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের

জন্য নিম্নকোটির সদস্যদের উপর নির্ভর করে থাকলেও, সেই নির্ভরশীলতার সম্পর্কটি স্বীকৃত হয় না। এই সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিকতা বা সাম্যতার কোনো স্থান নেই, আছে কেবল ক্ষমতার আঞ্চালন। ক্ষমতার জোরে প্রভুর গুণধর্ম মুখ্য স্থান অধিকার করে, এবং সেগুলি সমাজে মূল্যবান বলে সমাদৃত হয়। এইস্থলে অপর সংজ্ঞায়িত হয় প্রভুর গুণাবলীর নিষেধ বা অভাবযুক্ত হিসাবে, এবং তার অবমূল্যায়ন ঘটে।

বিষয়করণ (Instrumentalism) : আপাতভাবে দ্বৈততাবিশিষ্ট নির্মাণের প্রেক্ষিতে অবদমিত এবং অবদমনকারী উভয়ের স্বার্থ চরিতার্থ হয়ে থাকে এমনটাই মনে করা হয়, যদিও বাস্তবে নিম্নকোটিতে অবস্থিত অপর উচ্চকোটিতে অবস্থিত প্রভুর লক্ষ্যপূরণের নিমিত্ত নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে অপরকে শুধুমাত্র প্রভুর উদ্দেশ্যসাধনের মাধ্যম বা উপায়রূপে দেখা হয়। অপরকে শুধুমাত্র উপায় হিসাবে গণ্য করার মধ্যে দিয়েই তার বিষয়করণ ঘটে যায়। সামাজিক স্তরবিন্যাসের দৌলতে নিম্নকোটিতে স্থান পাওয়া অপর এক লক্ষ্যহীন সত্তায় পর্যবসিত হয়। প্রভুর লক্ষ্যপূরণের উপায়রূপে তারা আংশিক সার্থকতা লাভ করে, নিজের লক্ষ্য বা লক্ষ্যপূরণ-এর প্রসঙ্গই এদের ক্ষেত্রে ওঠে না। উচ্চকোটির সদস্যরা স্বতঃমূল্যে মূল্যবান, কিন্তু নিম্নকোটির সদস্যদের কোনো স্বতঃমূল্য থাকতে পারে বলে স্বীকার করা হয় না। তারা শুধুই প্রভুর ব্যবহারযোগ্য সম্পদ। উচ্চকোটির সদস্যদের উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয় অপরের আত্মপরিচয়। প্রভুর প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত অপর-এর আছে কেবল সহায়ক মূল্য, নেই কোনো কর্তৃত্বের অধিকার।

সমরূপীকরণ (Homogenisation) : দ্বৈততাবিশিষ্ট মেরুকরণ ছাড়াও অবদমনমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রয়োজনীয় একটি বৈশিষ্ট্য হল সমরূপীকরণ। এই বৈশিষ্ট্যটির মাধ্যমে নিম্নকোটির অবদমিত ও নিকৃষ্ট সদস্যদের পারস্পরিক বিভেদ বা পার্থক্যগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে। সেই কারণে প্রভুর দৃষ্টিতে অপর হল এক সমরূপী গোষ্ঠী। উক্ত সমরূপীকরণ প্রক্রিয়াটির সঙ্গে চূড়ান্ত বর্জনমূলক প্রক্রিয়া, সাধনযোগ্যতা এবং সম্বন্ধসূচক সংজ্ঞা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে থাকে, যা একান্তভাবে প্রভুত্বকামী প্রেক্ষিতের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য। এই প্রেক্ষিত থেকে

কোনোরকম বৈচিত্র বা বিভিন্নতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। উক্ত সমরূপিতা বিশেষের পরিবর্তে সার্বিকতাকে প্রতিষ্ঠা করে। উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাসের বাস্তব পরিস্থিতিতে যখন সমরূপিতা গৃহীত হয় তখন যারা সমরূপী নয় অর্থাৎ অপর, তাদেরকে অবশিষ্ট হিসাবে গণ্য করা হয়।

দ্বৈততার ধারণাগত কাঠামো কীভাবে মেরুকরণকে প্রশয় দেয় তার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা উপরোক্ত যৌক্তিক বিন্যাসের ক্ষেত্রগুলি থেকেই পাওয়া যেতে পারে। দ্বৈততাবিশিষ্ট চিন্তার মাধ্যমে সর্বদাই সমাজে উচ্চকোটিতে অধিষ্ঠিত প্রভুর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি সুরক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রে প্রভুর প্রেক্ষিত এমনভাবে গঠিত এবং অভিব্যক্ত হয় যেখানে অপরকে তার স্বরূপে চিনতে পারাটা প্রভুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়েই রচিত হয় অস্বীকৃত নির্ভরশীলতার আখ্যান।

প্লামউড মনে করেন, আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের বিশেষ নমুনাই দ্বৈততাবিশিষ্ট অপরের ধারণা গঠনের প্রতি কারণ। যদিও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞানে অন্যান্য ধরনের যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামোর সন্ধানও পাওয়া যায়, যেখানে অপরের নির্মাণ দ্বৈততাবিশিষ্ট বা নিষেধমূলক নয়।

ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞানে ‘~p’-কে ব্যাখ্যা করা হয় এমন এক জগৎ হিসাবে যা কখনোই ‘p’ নয়। ‘p’ ছাড়া অবশিষ্ট সবকিছুই ‘~p’ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমস্যা হল সেক্ষেত্রে ‘~p’-এর স্ব-নির্ভর বা সদর্থক পরিচয় কখনোই ব্যক্ত না। ‘~p’-এর নির্দিষ্টকরণ সম্পূর্ণভাবে ‘p’-এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এখানে ‘অপর’ বা ‘নারী’ হল এই ‘~p’ যার কোনো স্ব-নির্ভরতা নেই। ‘~p’ সর্বদাই ‘p’-এর অভাবযুক্ত গুণাবলীর আধার। লিঙ্গ, শ্রেণী, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে কেন্দ্র-প্রান্ত বিভাজনে প্রকাশ পায় ‘p’ এবং ‘~p’-এর সম্পর্কের প্রতিফলন। ‘p’ যেহেতু মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী, তাই তার স্থান কেন্দ্রে, এবং ‘~p’ যেহেতু গৌণ ভূমিকা পালন করে, তাই সে সর্বদাই প্রান্তবাসী। ‘~p’ যেহেতু ‘p’-এর অভাবযুক্ত বা বিপরীত গুণের অধিকারী, তাই তারা কখনোই স্বতন্ত্রকর্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, ‘~p’-এর সত্তা সর্বদাই অন্য সাপেক্ষ।

প্লামউড ধ্রুপদী যুক্তিবৈজ্ঞানিকে সাক্ষাৎভাবে নারীর অবদমন বা শোষণের কারণ হিসাবে দোষদুষ্ট করতে চান না। এমনও মনে করেন না যে, যুক্তিবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিবর্তন হলেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। তাঁর দৃষ্টিতে সমস্যার মূল কারণ হল দ্বৈততাবিশিষ্ট অপরের ধারণা। সুতরাং এর থেকে মুক্তি না পেলে অপর বা নারীর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হবে না। এই কারণে প্লামউড বিভেদের ধারণাকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু বিভেদের বিন্যাস যেন উচ্চ-নীচ স্তরবিশিষ্ট না হয় সেই ব্যাপারে সমাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। দ্বৈততাবিশিষ্ট বিভেদের যে বিন্যাস বা সম্বন্ধ তার পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর বিশ্বাস, যে সম্পর্কের মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তরভেদ নেই, সেই সম্পর্ক হয়ে উঠবে সংযুক্ত সহাবস্থানের সম্পর্ক। ফলত ‘p’ এবং ‘~p’-এর মধ্যে গড়ে উঠবে এক ধরনের সংযোগের সম্পর্ক, যেখানে ‘~p’ ‘অপর’, কিন্তু ‘p’-এর অভাবযুক্ত নয়। যদি লিঙ্গ প্রেক্ষিত সাপেক্ষে ভাবা হয়, তাহলে বলতে হবে নারী, পুরুষের ‘অপর’, কিন্তু সে পুরুষসুলভ গুণাবলীর অভাবযুক্ত নয়। উচ্চ-নীচ স্তরভেদ নেই এমন বিভেদ বা পার্থক্যের ধারণা গড়ে তুলতে গেলে তার বৈশিষ্ট্য কীরূপ হওয়া উচিত প্লামউড সেই সম্পর্কিত কয়েকটি গঠনগত রূপরেখা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। যদিও তিনি এটিকে বিকল্প যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামো হিসাবে দাবি করেন না। প্লামউড প্রদত্ত উক্ত গঠনমূলক কর্মসূচির আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল - দ্বৈততাবিশিষ্ট নির্মাণের সকল বিপরীত বিন্যাসগুলিকে সমন্বিত করা।²⁴ যেমন -

১. বিভেদের ফলে যে সমস্ত গুণাবলীর পশ্চাৎসরণ ঘটেছিল, সেগুলিকে সম্মুখপটে স্থান দেওয়া এবং সেই সঙ্গে অস্বীকৃত নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে স্বীকৃতি জানানো।
২. বিভেদের মধ্যে সংহতি স্থাপন করে এক অখন্ড দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, এবং সমাপতিত অংশগুলিকে অস্বীকার না করে পুনরুদ্ধার করা।
৩. উচ্চ-নীচ উভয় কোটিতে অবস্থিত সত্তার স্বরূপ পুনরায় বিবেচনা করা, এবং অবদমিত গোষ্ঠীর ভাষা ও ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করা।

²⁸ Ibid, p. 456.

৪. অপরকে প্রয়োজনের কেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি দেওয়া, তাকে মূল্য দেওয়া এবং তার প্রচেষ্টাকে সম্মান জানানো। কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্রভাবে তার প্রয়োজন ও লক্ষ্যপূরণের অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়া।
৫. অপরকে অবশিষ্ট সমরূপী প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসাবে না দেখে, তার বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি জানানো।

প্লামউড মনে করেন, এইপ্রকার উচ্চ-নীচ স্তরহীন বিভেদের ধারণা যদি গড়ে তোলা যায়, তাহলে দ্বৈততাবিশিষ্ট যুগ্মের মধ্যকার পার্থক্যকে দূর করা সম্ভব হবে। তাঁর মতে দ্বৈততাবিশিষ্ট যৌক্তিক কাঠামো অনুসরণ করা, অর্থাৎ দ্বৈততাবিশিষ্ট ‘অপর’ বা ধ্রুপদী নিষেধ-এর ধারণা যুক্তিবিজ্ঞানের কোনো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ‘প্রসঙ্গোচিত যুক্তিবিজ্ঞান’ (relevant logic)^{২৫}-এর ধারণাটি উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছেন। এই যুক্তিবিজ্ঞানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এখানে অপরের ধারণাটি চূড়ান্ত বর্জনমূলক যৌক্তিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেটি প্রসঙ্গায়িত স্ব-নির্ভর নীতির ভিত্তিতে রচিত। সেক্ষেত্রে ‘ $\sim p$ ’ এমন কোনো জগৎ নয়, যা সর্বদাই ‘p’ এর অভাবযুক্ত গুণাবলীর আশ্রয়। বরং তা হল প্রসঙ্গায়িত স্ব-নির্ভর সত্তা। ফলত ‘p’ এবং ‘ $\sim p$ ’ এখানে নিটোল দুটি বর্গ নয়। একইভাবে প্রসঙ্গায়িত নিষেধ-এর ভিত্তিতে যে অপর-এর নির্মাণ সম্ভব হবে তা ক্রমোচ্চ স্তরায়নের অভাবকে প্রতিষ্ঠা করবে। এইজাতীয় যুক্তিবিজ্ঞানকে প্লামউড ‘পারস্পরিক যুক্তিবিজ্ঞান’ (logic of mutuality) নামে অভিহিত করেছেন, যেখানে কেন্দ্র ও প্রান্ত এবং স্ব ও অপরের মধ্যে পারস্পরিকতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। একে-অপরের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্জনমূলক মনোভাব দূর করা সম্ভব হবে। এই বিকল্প যুক্তিবিজ্ঞানের প্রতিস্থাপন নীতি ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞান অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী যা অন্যের স্ব-নির্ভরতা ও অনন্যতাকে স্বীকৃতি দান করে থাকে।

প্লামউডের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ক্রমোচ্চ স্তরায়ন মুক্ত নিষেধের ধারণা প্রবর্তন করতে চাইছেন। যুক্তিবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে দ্বৈততাবিশিষ্ট অবদমনমূলক যুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে, তিনি প্রসঙ্গায়িত যুক্তিবিজ্ঞান প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছেন

^{২৫} Ibid, pp. 58-9.

ঠিকই, কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞান বর্জন করার পক্ষপাতী নন। যে যুক্তিবিজ্ঞান অবদমনমূলক বা অপরকে অবমূল্যায়িত করে এবং উচ্চ-নীচ স্তরভেদ প্রতিষ্ঠা করে, প্লামউড সেই যুক্তিবিজ্ঞান পরিবর্তনের দাবি জানান।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে লক্ষ করা যায় যে, চরমপন্থী নারীবাদীরা যেহেতু আধিবিদ্যক অবস্থানে মানুষের যৌন ও লিঙ্গ পরিচয় অতিরিক্ত কোনো অনপেক্ষ মানবধর্ম স্বীকার করেন না, তার প্রতিফলন স্বরূপ তাঁদের সমগ্র দার্শনিক তন্ত্রে সাপেক্ষ প্রেক্ষিত প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অনপেক্ষ কোনো গুণধর্মের স্বীকৃতি না থাকায় চরমপন্থী নারীবাদীরা সাপেক্ষতা অবলম্বনে চরম বিষয়নিষ্ঠতা লাভের দাবি জানিয়ে থাকেন। কারণ প্রেক্ষিত সচেতন অবস্থান থেকেই প্রকৃত বিষয়নিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব বলেই তাঁদের অভিমত। নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে তাঁরা দরদভিত্তিক সাপেক্ষ গুণাগুণকে স্বীকার্য সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। কারণ মনে করা হয়, প্রত্যেকের সাপেক্ষ প্রেক্ষিত গৃহীত হলে তবেই নৈতিক তত্ত্ব সর্বসাধারণের জন্য উপযোগী হয়ে উঠবে। যুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রসঙ্গ এবং পারস্পরিকতা ধারণাটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকেন। সর্বস্তরে সাপেক্ষ প্রেক্ষিত অবলম্বনে রচিত চরমপন্থী নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র, ধ্রুপদী ধ্যান-ধারণা বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে ভাবনা-চিন্তার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তিক-সত্তা নির্মাণ-এর আখ্যান ও দার্শনিক তত্ত্ব

দার্শনিক অনুসন্ধানের অন্যতম মুখ্য প্রশ্নটি হল জগত ও জীবের স্বরূপ কী ? সেই কারণে নানা শাখা-প্রশাখা সমন্বিত দর্শনশাস্ত্র তথা দার্শনিক তত্ত্ব-এর প্রকৃতি সম্পর্কিত যেকোনো আলোচনার পূর্বে সত্তার স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা অত্যাৱশ্যক হয়ে পড়ে। মূলস্রোতের ধ্রুপদী আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে সত্তার স্বরূপ সম্পর্কিত যে আধিবিদ্যক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই বিষয়ক কোনো আলোচনা এই প্রসঙ্গে অপেক্ষিত নয়। এইস্থলে আলোচ্য বিষয় হলো ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপ সম্পর্কিত নারীবাদী আখ্যান। যেখানে সত্তার স্বরূপ নিছক কোনো তাত্ত্বিক চিন্তার দ্বারা নির্ধারিত নয়। তা নির্মিত হয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে। তাই আলোচ্যস্থলে ব্যক্তিক-সত্তা বলতে নানান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সমন্বিত সত্তাকেই বুঝতে হবে। এইরূপ সত্তার সঙ্গে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত দার্শনিক তত্ত্বের প্রকৃতি কীভাবে পরস্পর অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করাই এই আলোচনার একমাত্র অভিপ্রায়। উক্ত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বের প্রকৃতি কীরূপ হতে পারে তা জেনে নেওয়া আবশ্যিক। কারণ মূলস্রোতের দার্শনিক তত্ত্বের প্রকৃতি সর্বজনবিদিত হলেও, নারীবাদী কোনো দার্শনিক তত্ত্ব এযাবৎ অস্তিত্বশীল নয়। দর্শনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ধ্রুপদী ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যপূর্ণ তত্ত্বগুলির সমন্বয়ে নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বের প্রকৃতি কীরূপ হতে পারে সেই সম্পর্কে ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

নারীবাদী তত্ত্ব-কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে কি নেই, সেটি এক ভিন্নতর প্রশ্ন। মনে রাখা প্রয়োজন, নারীসুলভ গুণগুলি যেহেতু মূলস্রোতের দার্শনিক তত্ত্ব বা তত্ত্ব-কাঠামোতে কোনোভাবেই গুরুত্ব পায় না, উপরন্তু পুরুষসুলভ গুণগুলি দৃষ্টান্তরূপে প্রতিস্থাপিত হয়, যেগুলি কিনা মেরুকরণ ও বিভেদ রচনার অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট যদি পুরুষসুলভ গুণের ভিত্তিতে রচিত হয়, তাহলে এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তা নারী তথা অপরাপর

প্রান্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বাধাস্বরূপ এক প্রাচীর নির্মাণ করবে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নারীর পক্ষে ব্যবহারোপযোগী দার্শনিক তন্ত্র-কাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। এই বিষয়ে অবশ্য নারীবাদীদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে, তথাপি এই গবেষণায় আমরা নারীবাদ-এর আভ্যন্তরীণ বাদানুবাদগুলি সরিয়ে রেখে নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় আগ্রহী। কারণ উক্ত প্রশ্নটির সঙ্গে দর্শন অপেক্ষা অধিক মাত্রায় জড়িয়ে আছে একটি রাজনৈতিক সমীকরণ। কারণ নারীবাদীরা মনে করেন, তন্ত্র মাত্রই ক্ষমতার মেরুকরণকে প্রশ্রয় দেয়। ক্ষমতার প্রসঙ্গ এলে সেখানে আবশ্যিকভাবে রাজনীতির অনুষ্ণ যুক্ত হয়ে যায়। নারীবাদীরা যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ক্ষমতার রাজনীতিটিকে চিহ্নিত করতে চান, তাই তাঁরা মুক্ত কণ্ঠে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান ঘোষণা করে থাকেন। এইস্থলে আলোচ্য বিষয় হল বিভিন্ন নারীবাদী চিন্তাধারার মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা সেই বিষয়ক অনুসন্ধান। কোনো তন্ত্রের বিন্যাস বা প্রকৃতি যাই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চিন্তার সঙ্গতি রক্ষা করা। কারণ সঙ্গতিপূর্ণ তন্ত্র-কাঠামো অনায়াসেই দার্শনিকতার অভিমুখে প্রসারিত হওয়ার যোগ্য। যেকোনো দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার পূর্ণাঙ্গ সুসংহত রূপ দার্শনিক তন্ত্রের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এইস্থলে নারীবাদীদের বিচিত্র চিন্তাধারাকে একত্রিত করে যদি সঙ্গতিপূর্ণ দার্শনিক তন্ত্র রচনা করা যায়, তাহলে নারীবাদও পূর্ণাঙ্গ দর্শনশাস্ত্রের রূপ ধারণ করতে পারবে।

নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে পূর্বালোচিত বিশেষ বিশেষ অধ্যায়গুলিতে বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সেক্ষেত্রে একক কোনো নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় না, যদিও ভিন্ন ঘরানায় বিভিন্ন নারীবাদী প্রবর্তিত তত্ত্বগুলিকে সমন্বিত করে এক ধরনের সমষ্টিগত (collective) বা জোটবদ্ধ (Coalition) দার্শনিক তন্ত্র গড়ে তোলাটা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য হলেও অসম্ভব বলে মনে হয় না। সুতরাং নারীবাদী দার্শনিক তন্ত্র হলো সংহতিপূর্ণ (integrity) সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে কোনো ক্রমোচ্চ

সুরায়ন বা থাকবন্দি বিন্যাস থাকবে না। এইজাতীয় তত্ত্ব প্রতিযোগিতামূলক (competitive) নয়, পারস্পরিক সহযোগিতার (co-operation) ভিত্তিতে রচিত। আমরা জানি যেকোনো দার্শনিক আলোচনার মূল লক্ষ্য তথা পদ্ধতি হলো পরমত খন্ডন ও স্বমত প্রতিষ্ঠা। স্বমত প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় যদি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বের সমষ্টিগত রূপটি তার সহযোগিতামূলক ভাবটিকে প্রকাশ করে থাকে। নারীবাদী চিন্তাধারার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব অপেক্ষা, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সঙ্গতি সাধন করা। ফলত যে বাস্তব তথ্যভিত্তির উপর নির্ভর করে কোনো তত্ত্ব রচিত হয়, সেই তথ্যভিত্তির পরিবর্তনে তত্ত্বের পরিবর্তন এবং তত্ত্বের পরিবর্তনে তত্ত্ব-কাঠামোর পরিবর্তনও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্ব স্থির (static) নয়, সর্বদাই গতিশীল (dynamic), এই তত্ত্ব চিরস্থায়ী নয় কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী - বহমানতা এর অপরিহার্য ধর্ম। এইজাতীয় তত্ত্বে কোনো আবেষ্টন (closure) থাকবে না, আদান-প্রদানের জন্য সর্বদাই খোলা মুখ রক্ষিত হবে।

আমরা জানি, লিঙ্গমাত্রাকে বিসর্জন দিয়ে কোনো নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্ব গড়ে উঠতে পারে না। তাই নারীবাদী যেকোনো দার্শনিক তত্ত্ব লিঙ্গ বর্জিত নয়, বরং লিঙ্গ বৈষম্য বর্জিত। লিঙ্গ প্রেক্ষিত গৃহীত হয়ে থাকে বলে নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বে সাপেক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম, কিন্তু সাপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক এমন কোনো উদ্দেশ্য সেক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। এই কারণে বিমূর্ত সার্বিকীকরণ অপেক্ষা, মূর্ত সাধারণীকরণ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থাকে।

এখন ব্যক্তিক সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কিত নারীবাদী মত জেনে নেওয়া আবশ্যিক। দর্শনের জগতে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গঠনগত স্বরূপের ভিত্তিতে মূলত দুই ধরনের সত্তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হল 'আণবিক সত্তা' এবং অপরটি হল 'সম্পর্কিত সত্তা'। আণবিক সত্তা হলো সেই সত্তা যা তার যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের বেড়া জাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে, এবং 'স্ব' ও 'অপর'-এর মধ্যে গড়ে তোলে স্পষ্ট সীমারেখা। দাবি করা হয় যে, এইপ্রকার

সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তির বিগুহ যুক্তির অধিকারী এবং তার দ্বারা গৃহীত সকল প্রকার সিদ্ধান্ত হয় যুক্তিনির্ভর। যুক্তিপ্রয়োগে পারদর্শী হওয়াটাই আণবিক সত্তার বিশেষ ধর্ম। কোনোপ্রকার বিষয়ীনিষ্ঠ আবেগ, বা অনুভূতির বন্ধনে সে আবদ্ধ নয়। সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন অবস্থান থেকেই সে লাভ করে স্বাভাব্য এবং স্বাধীনতা। প্রেক্ষিত সাপেক্ষতাকে বর্জন করে, বিষমরূপিতা বা বিভিন্নতাকে উপেক্ষা করে, বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনার দ্বারা সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সমরূপিতাকে প্রতিষ্ঠা করাই এইরূপ সত্তার একমাত্র লক্ষ্য।

আণবিক সত্তা বিশিষ্ট যে ‘আমি’, সেই ‘আমি’ হল ‘স্বগত সত্তা’। এই সত্তাবিশিষ্ট আমি’র সমস্ত চিন্তা-ভাবনা এবং যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ তার নিজের অবস্থানটিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। এইরূপ অবস্থান থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি একান্তই তার নিজস্ব যুক্তি নির্ভর। এর জন্য সে অপর কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো সাপেক্ষ প্রেক্ষিত নির্ভর নয়। আণবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে যেভাবে নিজেদের ব্যক্তিক সত্তাগুলিকে গড়ে তোলে, তার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি যেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলত এইপ্রকার বিভিন্ন সাপেক্ষ অবস্থানগুলির মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে, সেই লক্ষ্যে আণবিক সত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা অনুগত সামান্য ধর্ম অন্বেষণ এর প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা কিনা সকল বিচ্ছিন্ন সত্তার মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। বিগুহ যুক্তিই হল সেই অনুগত সামান্য ধর্ম যা আণবিক সত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ অবস্থান ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। উক্ত অনুগত সামান্য ধর্মের ভিত্তিতেই গৃহীত হয় সঙ্গতিপূর্ণ সার্বিক দার্শনিক তত্ত্ব তথা তন্ত্র-কাঠামো, যার ফলে দার্শনিকতার প্রেক্ষাপটে বিভিন্নতাগুলির প্রতিফলন ঘটে না বা ঘটা সম্ভব হয় না।

অপরপক্ষে দর্শনের জগতে সম্পর্কিত সত্তা বলতে বোঝায় সেই সত্তা, যা সর্বদাই কোনো না কোনো সম্পর্কে অবস্থান করে; সম্পর্ক বিচ্ছিন্নভাবে কোনো অবস্থান তার থাকে না। ‘স্ব’-‘অপর’ ভেদবিশিষ্ট বিচ্ছিন্নতার বোধ এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এইপ্রকার সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তির সর্বদাই একে-অপরের মধ্যে সম্পর্কটিকে লালন-পালনের মধ্য দিয়ে নিজেরা বেঁচে থাকে, অন্যদেরকেও বাঁচিয়ে রাখে। কারণ এই অবস্থান থেকে মনে করা

হয় যে, সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত থাকে জীবনের সার্থকতা এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশের সম্ভাবনা। সম্পর্কিত সত্তাবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি এক সম্পর্ক ত্যাগ করলেও অপরাপর কোনো না কোনো সম্পর্কে সে অঙ্গগ্ভাবে জড়িয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সম্পর্কটি কখনোই একমুখী নয়, তা সর্বদাই উভয়মুখী এক সম্পর্ক। যেখানে উভয়ই মনে করে যে, এইভাবে সম্পর্কিত থাকার মধ্য দিয়েই তারা খুঁজে পাবে তাদের বেঁচে থাকার রসদ। তাই তারা যেন-তেন-প্রকারে এই সম্পর্কটিকে রক্ষা করতে সদা তৎপর। এইরূপ সম্পর্ক সৃজিত কোনো সম্পর্ক নয়, কারণ সৃজিত সম্পর্কগুলি প্রয়োজনের স্বার্থে চুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠে। সম্পর্কিত সত্তার অনুষঙ্গে সম্পর্কটি হল এমন এক নিবিড় বন্ধন যেখানে বিচ্ছেদ মাত্রই তা বিনাশের নামান্তর; সম্পর্কের বিনাশ মানেই হল সত্তার বিনাশ।

এইপ্রকার সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বার্থ-বুদ্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা সবই থাকে, কিন্তু তার সবটাই আবর্তিত হয় সম্পর্কটিকে ভিত্তি করে। ফলে দ্বন্দ্বিকতার পরিস্থিতি কখনোই সৃষ্টি হয় না, যদিও সম্পর্কের মধ্যে দোলাচল অবশ্যই থাকতে পারে। এখানে কোনো ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে না থেকেও বজায় রাখে স্বার্থ, লাভ করে স্বাতন্ত্র্য, ভোগ করে স্বাধীনতা। এটি এমন একপ্রকার আত্মিক সম্পর্ক যেখানে সহানুভূতি, সহমর্মিতার কোনো স্থান নেই। কারণ নারীবাদীরা মনে করেন সহানুভূতি বা সহমর্মিতার মধ্যেও ‘স্ব’-‘অপর’ ভেদ বর্তমান থাকে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক ‘সমভাব’ হল এই সম্পর্কের সঞ্জীবনী, এখানে সবাই পরস্পরের অপর, কিন্তু কেউ কারোর পর নয়। এই সত্তা বিশুদ্ধ যুক্তির অধিকারী নয়। আবেগ, অনুভূতি, সংবেদনশীলতাই হল এর বিশেষ গুণ। সমরূপিতার পরিবর্তে বিষমরূপিতা, একরূপতার পরিবর্তে বিভিন্নতা, অনপেক্ষতার পরিবর্তে প্রেক্ষিত সাপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতার পরিবর্তে ব্যক্তি সাপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা, এবং বিমূর্ততার পরিবর্তে মূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই উক্তপ্রকার সম্পর্কিত সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাজিত লক্ষ্য।

পূর্বলোচিত অধ্যায়গুলির ভিত্তিতে এখন দেখে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিটি দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ কীভাবে সম্পর্কিত হতে পারে। একথা

পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে যে মূলস্রোতে সুগঠিত দার্শনিক তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও, ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপের সঙ্গে তা কীভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে সেই বিষয়ক কোনো আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্যদিকে নারীবাদে ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কিত সুচিন্তিত মতাদর্শ থাকলেও, নেই কোনো সুগঠিত দার্শনিক তত্ত্বের অস্তিত্ব। বিভিন্ন অধ্যায়গুলিতে এপর্যন্ত যে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে লক্ষ করা গিয়েছে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক তত্ত্ব রচিত হতে পারে, এবং সুসংহত ও সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তা কীভাবে দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে সমৃদ্ধ করে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির দিকে লক্ষ রেখে এইস্থলে দেখে নেওয়া প্রয়োজন বিভিন্ন অধ্যায়গুলিতে আলোচিত দার্শনিক তত্ত্বগুলির আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য কীরূপ হতে পারে। কারণ তার ভিত্তিতে বুঝে নেওয়া সম্ভব হবে যে, ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় কি না, কিংবা এদের মধ্যে যোগসূত্র আদৌ কীভাবে স্থাপিত হতে পারে।

কান্ট প্রদত্ত দার্শনিক তত্ত্বের পরিসরে জ্ঞানতাত্ত্বিক পর্যালোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ করা গিয়েছে উপাদান গ্রহণ থেকে শুরু করে জ্ঞানের বিষয় গঠন এবং বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটিতে কোথাও জ্ঞাতা সাপেক্ষ প্রেক্ষিত অনুপ্রবেশের কোনোরকম সম্ভাবনা নেই। কান্ট জ্ঞানের উপাদান গ্রহণে মনের সক্রিয়তা স্বীকার করলেও, সেক্ষেত্রে সক্রিয়তা বলতে তিনি স্বতঃস্ফূর্ততাকে বুঝিয়েছেন। জ্ঞান গঠনে মনের কোনও সচেতন ক্রিয়া তিনি সমর্থন করেন না। দেশ ও কালের দ্বারা উপাদান গ্রহণ ও তাতে বৌদ্ধিক প্রকার প্রযুক্ত হওয়া এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় কোনো ক্ষেত্রেই জ্ঞাতার কোনো সচেতনতা স্বীকৃত নয়। কারণ কান্ট মনে করেন, জ্ঞান মাত্রই অনিবার্য এবং সার্বিক। জ্ঞানের তথ্য ভিত্তি থাকতে পারে, কিন্তু তা বিষয়নিষ্ঠ তথ্য, বিষয়ীনিষ্ঠ নয়। কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে জ্ঞানক্রিয়া সম্পন্ন হোক এমনটা তিনি স্বীকার করেন না, কারণ তিনি মনে করেন, ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, অর্থাৎ বিষয়ীনিষ্ঠ হতে পারে, সুতরাং সেক্ষেত্রে সাপেক্ষতার সম্ভাবনা থেকে যায়। কান্ট দাবি করেন, যে সমস্ত জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা জ্ঞাতা জ্ঞানলাভ করে সেগুলি পূর্ব অস্তিত্বশীল আকার ও প্রকার, এখানে

জ্ঞাতার বা তার সাপেক্ষ পরিচয়ের কোনো ভূমিকা থাকে না। জ্ঞাতার কোনো সাপেক্ষ পরিচয় ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। সুতরাং সাপেক্ষ প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্নভাবেই জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। তা না হলে বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞানলাভের দাবি ত্যাগ করতে হবে। কান্ট যে আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তা হলো ‘অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞান’। উক্ত অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞান সার্বিক ও অনিবার্য; তাই তা বিষয়নিষ্ঠ। সুতরাং কান্টের জ্ঞানতত্ত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল অনিবার্যতা, সার্বিকতা ও বিষয়নিষ্ঠতা।

অন্যদিকে, আধিবিদ্যক বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কান্ট খারিজ করে দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, আধিবিদ্যক বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়াতীত, তার সম্পর্কে চিন্তা করা গেলেও, সেগুলি কখনোই জ্ঞানপদবাচ্য নয়। কান্ট প্রকৃত জ্ঞান বলতে বুঝতেন যা পূর্বতসিদ্ধ এবং সংশ্লেষক; অধিবিদ্যক বিষয়সমূহ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই উৎপন্ন হতে পারে না বলে তাঁর অভিমত। তা সত্ত্বেও মানুষ কেন আধিবিদ্যক চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে কেন, তার কারণস্বরূপ কান্ট ‘অতীন্দ্রিয় ভ্রান্তি’-কেই দায়ী করেছেন। যে জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা মানুষের মন আধিবিদ্যক বিষয়সমূহকে জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তা হল শুদ্ধ প্রজ্ঞা। এই শুদ্ধ প্রজ্ঞা সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ, সুতরাং তা বিষয়নিষ্ঠ। তাঁর মতে আধিবিদ্যক বিষয়সমূহ হল প্রজ্ঞাপ্রসূত ধারণা। মানববুদ্ধির সহজাত স্বাভাবিক ধর্ম হল আধিবিদ্যক বিষয়রূপ শর্তহীন, অসীম, নিরপেক্ষ, অখন্ড জ্ঞানের অন্বেষণ করা। কোনো সাপেক্ষ প্রেক্ষিত থেকে এই ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়, কারণ সাপেক্ষ প্রেক্ষিত মাত্রই তা আবশ্যিকভাবে শর্তাধীন। সুতরাং অধিবিদ্যা সম্পর্কিত কান্টের বক্তব্য থেকেও জ্ঞানতত্ত্বের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একইভাবে নৈতিক প্রেক্ষাপটেও কান্ট বিষয়নিষ্ঠ নৈতিক নিয়মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে নৈতিক নিয়মগুলি হল নিঃশর্ত আদেশ, যা বিষয়নিষ্ঠ কর্মনীতির গ্রহণযোগ্যতা বিচার করার মানদণ্ডস্বরূপ। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তির বিষয়নিষ্ঠ কর্মনীতি বিষয়নিষ্ঠ নৈতিক নিয়মে পরিণত হওয়ার যোগ্য তাকে হতে হবে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক প্রজ্ঞার অধিকারী। এইপ্রকার ব্যক্তি যখন নৈর্ব্যক্তিকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

নিরাসক্ত কামনা-বাসনা বিরহিত বিষয়নিষ্ঠ অবস্থান থেকে তার বিষয়ীনিষ্ঠ কর্মনীতিগুলিকে যৌক্তিক বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্ব-বিরোধহীনভাবে সার্বিকীকরণ করতে সমর্থ হবে, তখনই তা পরিণত হবে বিষয়নিষ্ঠ নৈতিক নিয়মে। এইপ্রকার বিষয়নিষ্ঠ নৈতিক নিয়মই হল অনুজ্ঞা। সুতরাং কান্ট প্রদত্ত নৈতিকতার প্রসঙ্গেও বিমূর্ততা, নৈর্ব্যক্তিকতা, বিষয়নিষ্ঠতা, ও সার্বিকীকরণ রূপ বৈশিষ্ট্যগুলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

যুক্তিবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে কান্ট ‘অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞান’-এর কথা বলেছেন। জ্ঞানতত্ত্বে আলোচিত বৌদ্ধিক প্রকারের যথার্থতা নিরূপণ কীভাবে সম্ভব সেই সম্পর্কিত আলোচনা এই অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞানের বিষয়। বৌদ্ধিক প্রকারগুলি হল পূর্বতসিদ্ধ প্রকার; সেগুলি বিষয়নিষ্ঠ, সার্বিক ও অনিবার্য, মনের স্বভাব থেকে স্বতঃই উৎপন্ন ও প্রযুক্ত হয়।

কান্ট প্রবর্তিত সমগ্র দার্শনিক তত্ত্বে লক্ষ করা যায় যে, তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক, আধিবিদ্যক এবং যুক্তিবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে শুদ্ধ প্রজ্ঞার ভূমিকাকে অপরিহার্য বলে মনে করেছেন। আবার নৈতিকতার পরিসরে শুদ্ধ ব্যবহারিক প্রজ্ঞার ভূমিকাকে অনস্বীকার্য বলে মনে করেছেন। শুদ্ধ প্রজ্ঞার স্বীকৃতি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত সমগ্র দার্শনিক তত্ত্বে বিষয়নিষ্ঠতা, বিমূর্ততা, সার্বিকতা, অনিবার্যতা ও নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যা একমাত্র বিচ্ছিন্ন প্রেক্ষিত থেকে লাভ করা সম্ভব। শুদ্ধ প্রজ্ঞা হল সমরূপী সামান্য ধর্ম, যা সবার মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকৃতপক্ষে আণবিক সত্তার ইঙ্গিতবাহী। সুতরাং কান্ট প্রদত্ত দার্শনিক তত্ত্বের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যদি ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপের যোগসূত্র স্থাপন করতে হয়, তাহলে সেই সত্তা অবশ্যই আণবিক সত্তা। কারণ আণবিক সত্তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের সঙ্গে কান্টের দার্শনিক তত্ত্বের প্রেক্ষিত থেকে উঠে আসা বৈশিষ্ট্যের এক আত্যন্তিক সাদৃশ্য বর্তমান।

হিউমের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়েছে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভ প্রসঙ্গে তিনি ইন্দ্রিয়ানুভবকেই একমাত্র উপায় হিসাবে স্বীকার

করে নিয়েছেন। ইন্ডিয়ানুভবের মাধ্যমে আমরা সাক্ষাৎভাবে ‘মুদ্রণ’ লাভ করি এবং তা থেকে গড়ে ওঠে ‘ধারণা’। হিউমের মতে উপাদান গ্রহণের সময় মন নিষ্ক্রিয় থাকে ফলে জ্ঞানের তথ্য ভিত্তিতে মনের নিজের থেকে কিছু দেওয়ার নেই। সুতরাং এখানে জ্ঞাতার কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। এমনকি ধারণা গঠনের সময় মনের সক্রিয়তা স্বীকৃত হলেও, তিনি মানবমনের সীমাহীন চিন্তন ক্ষমতাকে স্বীকার করেননি। মনের কাজ হল অনুষ্ণ নিয়ম অনুসরণ করে ধারণাগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত করা। এই অনুষ্ণ নিয়ম সার্বিক, বলাই বাহুল্য এগুলির প্রয়োগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হবে সেই জ্ঞানও বিষয়নিষ্ঠ এবং সার্বিক হবে। অনুষ্ণ নিয়মগুলির মধ্যে কার্য-কারণ নিয়মের উপর হিউম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই কার্য-কারণ নিয়ম হল বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি, যা মানুষের অভ্যাসজাত প্রত্যাশা থেকে গড়ে ওঠে। আমাদের সকল বিশ্বাস এর মূলে রয়েছে এই অভ্যাস, যা মনের সহজাত বা স্বাভাবিক প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্বাস গঠনের ব্যাপারেও মনের কোনো ভূমিকা তিনি স্বীকার করেন না। সুতরাং হিউমের জ্ঞানতত্ত্বে, জ্ঞাতাবিচ্ছিন্ন প্রেক্ষিতের উপস্থিতি থেকে সার্বিকতা এবং বিষয়নিষ্ঠতার রূপ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একইভাবে হিউম আধিবিদ্যক চর্চাকে অর্থহীন না বলার মধ্য দিয়ে বিমূর্ততাকে কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন, বিমূর্ত দর্শনচর্চা ‘সহজ ও স্পষ্ট’ দর্শনের ভিত্তি সুনিশ্চিত করে থাকে। বিশেষ ধরনের বিমূর্ত বিষয় চর্চাকে তিনি নিষ্ফল বলেছেন ঠিকই কিন্তু, সামগ্রিকভাবে বিমূর্ত দর্শনচর্চার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। হিউম কু-যুক্তির পরিবর্তে সু-যুক্তি অনুশীলনের উপর জোর দিয়েছেন। অধিবিদ্যক অনুসন্ধান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বিমূর্ততা ও যুক্তির প্রাধান্য প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন।

নৈতিকতা সম্পর্কিত হিউমের বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি মানুষের আবেগ বা অনুভূতিকে নৈতিকতার উৎসস্থল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু এই আবেগ কোনো ব্যক্তিসাপেক্ষ আবেগ নয়। এটি এমন আবেগ যা সব মানুষের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সেই কারণে তিনি ‘আত্মসুখবাদ’ পরিত্যাগ করে সামাজিক সুখকেই প্রাধান্য

দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে নৈতিকতা হল অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যভিত্তির উপর নির্ভর করে কোনো ব্যক্তিকৃত আচরণ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে অনুমোদন বা অননুমোদনের অনুভূতি গড়ে তোলা। এই প্রসঙ্গে তিনি নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক নিয়ম গঠনের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর নীতিতত্ত্বে পরসুখ, পরোপকারিতা, পরার্থপরতা, উপযোগিতা এবং ন্যায়নিষ্ঠতার ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে, এখানে স্বার্থবুদ্ধি বা সাপেক্ষতার কোনও স্থান নেই।

যুক্তিবিজ্ঞানকে হিউম ‘ধারণা সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান’ বলে মনে করেন। অন্যদিকে বাস্তব তথ্যভিত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা আরোহমূলক অনুমান থেকে যে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে তিনি সংশয়ী ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন সম্ভাব্যতা হলো অভিজ্ঞতাভিত্তিক আরোহ অনুমানের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। সেক্ষেত্রে তিনি সম্ভাব্যতাকে গাণিতিকভাবে উপস্থাপনা করেছেন, যার মধ্যে দিয়ে আরোহ অনুমানের বিষয়নিষ্ঠ ধর্ম প্রকাশ পায়। এছাড়াও ধ্রুপদী অবরোহ অনুমান অর্থাৎ যে অনুমানের ভিত্তি ধারণা সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান, তার বিমূর্ততা ও অনিবার্যতা বিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না।

সুতরাং হিউম অভিজ্ঞতাবাদী হলেও তাঁর সমগ্র দর্শন তন্ত্রে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এইরূপ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র আণবিক সত্তার বৈশিষ্ট্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। কারণ হিউমের জ্ঞানতত্ত্বে সার্বিক ও বিষয়নিষ্ঠ অনুষ্ণ নিয়মের দ্বারাই ধারণাগুলি সম্বন্ধযুক্ত হয়। অধিবিদ্যা প্রসঙ্গে তিনি বিমূর্ত যুক্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে খারিজ করেনি। নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে হিউম নৈর্ব্যক্তিক বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক নিয়মের অনুগামী। যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় তিনি আরোহমূলক সমস্যার কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সম্ভাব্যতার গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করে বিষয়নিষ্ঠতার পথ প্রশস্ত করেছেন।

উদারপন্থী নারীবাদীরা তাঁদের আধিবিদ্যক অবস্থানে অনপেক্ষ মানবধর্ম স্বীকার করেন। তাঁদের মতে মানুষ হল মূলত যৌক্তিক জীব, এই ‘যুক্তি’ সর্বদাই অনপেক্ষ, কখনোই সাপেক্ষ নয়। তাঁরা মনে করেন তত্ত্ব সর্বদাই বিশুদ্ধ যুক্তির ভিত্তিতেই রচিত

হয়, ফলে তত্ত্ব কখনোই লিঙ্গ বৈষম্যের জন্ম দিতে পারে না, কিন্তু তথ্য ভিত্তি ও তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি সাপেক্ষতা অনুপ্রবেশ করে, তাহলে সেই তত্ত্ব বৈষম্যের কারণ হতে পারে। যদিও এটা তত্ত্বের দোষ নয়, প্রয়োগের অনবধানবশত এমনটা ঘটে থাকতে পারে। তাঁরা মনে করেন, তত্ত্বের প্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ যুক্তি যদি মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে, এবং নিয়ামক ভূমিকা বজায় রাখতে পারে তাহলে তা কখনোই বৈষম্যের সৃষ্টি করবে না। এইজাতীয় তত্ত্বে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উদারপন্থী নারীবাদীরা নারীর লিঙ্গ সমস্যা দূর করার আশা রাখেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে লিঙ্গ উত্তরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। আধিবিদ্যক অবস্থান থেকে তাঁদের আগ্রহের বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত কোনো পদার্থ নয়। তাঁরা জানতে চান জগতে লিঙ্গ প্রেক্ষিত অস্তিত্বশীল কিনা। উদারপন্থী নারীবাদী চিন্তাধারায় অনপেক্ষ মানবধর্মের স্বীকৃতি বিষয়নিষ্ঠতার প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করে।

জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে এঁরা বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞানলাভ-এর পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে তাঁদের কাছে অনুসন্ধানের বিষয় হল আপাত বিষয়নিষ্ঠতার আড়ালে কোনো বিষয়নিষ্ঠ প্রেক্ষিত জড়িয়ে থাকতে পারে কিনা। কারণ তাঁরা মনে করেন, বিষয়নিষ্ঠতার দাবি যদি ক্ষমতাশালী প্রেক্ষিত থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিষয়নিষ্ঠতার পরিবর্তে বিষয়করণতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে পুরুষের স্বার্থ সুরক্ষিত হলেও নারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এইজাতীয় বিষয়নিষ্ঠতাকে তাঁরা ‘পরিগৃহীত বিষয়নিষ্ঠতা’ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। এর বৈশিষ্ট্য হল, সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক, কিন্তু আপাত স্বাভাবিকতার অন্তরালে কোনো অস্বাভাবিক প্রেক্ষিত বিদ্যমান কিনা তার অনুসন্ধান জরুরী হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও উদারপন্থী নারীবাদীরা জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বিষয়নিষ্ঠতা প্রতিপাদনে যুক্তি তথা যৌক্তিক নীতির ভূমিকাকে অপরিহার্য বলে মনে করেন।

এই নারীবাদীদের নৈতিকতা সম্পর্কিত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা ন্যায্যনিষ্ঠ তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষক এবং নৈতিক প্রেক্ষাপটে কোনো না কোনোভাবে নৈর্ব্যক্তিকতার দাবিটিকে বহাল রাখতে চান। কারণ তাঁরা মনে করেন, নৈর্ব্যক্তিকতারূপ

বৈশিষ্ট্যটিকে অস্বীকার করলে ন্যায়নিষ্ঠতার আশাও ত্যাগ করতে হবে; ফলত সাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে, এবং সমাজ-সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণগুলির ন্যায্য বা যথাযথ বন্টন সম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁরা লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পুনর্বন্টনের নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মনে রাখা আবশ্যিক যে, উদারপন্থী নারীবাদীরা বিনাবিচারে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে ন্যায্যতা প্রতিপাদনের যথাযথ মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করবেন না। ফলত তাঁরা নৈর্ব্যক্তিকতার অন্ধ সমর্থক নন।

উদারপন্থী নারীবাদীরা ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞানের কাঠামো নিয়ে ভাবিত নন। দ্বি-মাত্রিক যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বি-বিভাজন নীতিটিকে তাঁরা সমস্যাপূর্ণ বলে মনে করে থাকেন। তাঁদের প্রশ্ন হল নির্দিষ্ট দুই কোটির মধ্যে কেন নারীসুলভ গুণগুলি সর্বদাই ‘~p’-তে অবস্থান করে এবং কেনই বা সেগুলি পুরুষ-সুলভ গুণের অভাবযুক্ত হিসাবে পরিগণিত হয়। দ্বি-বিভাজন নিয়ে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে বিধৃত দ্বৈততাবিশিষ্ট মনোভাবকে তাঁরা প্রশ্নবিদ্ধ করে থাকেন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, উদারপন্থী নারীবাদীরা যদিও সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান চান, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে লিঙ্গ সাপেক্ষ তত্ত্ব নির্মাণে তাঁরা আগ্রহী নন। আধিবিদ্যক অবস্থানে তাঁরা মানুষকে যৌক্তিক জীব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চান। জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে বিষয়নিষ্ঠতার দাবি তথা যুক্তির ভূমিকাকে অনস্বীকার্য বলে মনে করেন, এবং নৈতিকতার প্রেক্ষিতে নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শটিকে সুচিন্তিতভাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। দ্বি-মাত্রিক যুক্তিবিজ্ঞানকে উদারপন্থী নারীবাদীরা দোষদুষ্ট বলে মনে করেন না, কিন্তু দ্বৈততার ধারণাটিকে দূর করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উদারপন্থী নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বের প্রেক্ষিতে আণবিক সত্তার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। যদিও উদারপন্থী নারীবাদীরা ঘোষিতভাবেই আণবিক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু সত্তার গঠনগত স্বরূপের অনুষণে উদারপন্থী নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বের মেলবন্ধন রচনার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়।

চরমপন্থী নারীবাদীরা তাঁদের আধিবিদ্যক অবস্থানে কোনো অনপেক্ষ মানবধর্ম স্বীকার করেন না। তাঁরা মানুষকে যৌক্তিক জীব হিসাবে না দেখে তাকে অনুভূতিপ্রবণ

জীব হিসাবে দেখতে চান। সেই কারণে তত্ত্বের প্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ তথা বিমূর্ত যুক্তির ভূমিকাকে তাঁরা স্বীকৃতি দেন না। তাঁদের মতে লিঙ্গ বৈষম্য ধারণার স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত, তাই কোনো তত্ত্বের লিঙ্গ বর্জিত রূপরেখা প্রদান করার প্রচেষ্টা আবাস্তব। চরমপন্থী নারীবাদীরা অনপেক্ষতায় বিশ্বাস না রাখলেও সাম্যতা প্রতিষ্ঠায় আস্থা রাখেন। তাঁরা নারীর লিঙ্গ বৈষম্যের কারণস্বরূপ অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটির কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন, সুচিন্তিত প্রয়াসের ফলে সৃষ্টি হয়েছে বৈষম্যমূলক তত্ত্ব-কাঠামো; বিশুদ্ধ যুক্তিভিত্তিক নির্দোষ তত্ত্বের স্তর তাঁরা স্বীকার করেন না। সাপেক্ষতা অবলম্বনে তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বলেই চরমপন্থী নারীবাদীরা তাঁদের আধিবিদ্যক অবস্থানে সাপেক্ষ ধর্মকে, বিশেষত লিঙ্গ সাপেক্ষ ধর্মকে প্রাধান্য দিতে চান।

অনুরূপভাবে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে তাঁরা সাপেক্ষ প্রেক্ষিত সচেতন অবস্থান থেকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা স্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন, প্রেক্ষিত সচেতন অবস্থান সাপেক্ষে যদি জ্ঞান প্রদত্ত হয়, তাহলে সেই জ্ঞান অধিক বিষয়নিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে তাঁরা ‘সবল বিষয়নিষ্ঠতার’ ধারণাটির মাধ্যমে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে আপেক্ষিকতা ও বিষয়নিষ্ঠতা এই উভয় বৈশিষ্ট্যই অক্ষুণ্ন রাখতে চান ঠিকই, কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্যগুলির ধ্রুপদী ধ্যান-ধারণার বিনির্মাণে আগ্রহী। এইস্থলে তাঁরা ক্ষমতাহীন প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রেক্ষিত থেকে জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শুরু করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে চান। কারণ তাঁরা মনে করেন, ক্ষমতার আক্ষালনে তথ্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমনকি অন্যের অবস্থানকে অবহেলা বা আড়াল করার মানসিকতাও কার্যকরী হতে পারে। এক্ষেত্রে যারা ক্ষমতাহীন তারা নিজেদের প্রেক্ষিত এবং ক্ষমতামালীর প্রেক্ষিত – উভয় সম্পর্কে সচেতন। ফলে ক্ষমতাহীনের প্রেক্ষিত জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক সত্য বহনকারীরূপে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। ধ্রুপদী নিরপেক্ষতা বা বিষয়নিষ্ঠতার ধারণাটিকে চরমপন্থী নারীবাদী অবস্থান থেকে ‘দুর্বল বিষয়নিষ্ঠতা’ রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে চরমপন্থী নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ‘দরদ’রূপ সাপেক্ষ নৈতিক সদগুণের ভিত্তিতে তত্ত্ব রচনার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। এইজাতীয় নৈতিকতায় প্রত্যেকের সাপেক্ষ প্রেক্ষিত তত্ত্বের পরিসরে গ্রহণযোগ্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ধরে নেওয়া হয়, মানুষ মাত্রই অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, সুতরাং প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষিতগুলিকে বাদ দিয়ে সমরূপিতার ভিত্তিতে সার্বিক তত্ত্ব নির্মাণের কোনো বাস্তবতা থাকতে পারে বলে এই নারীবাদীরা মনে করেন না। নৈতিকতার প্রেক্ষিতে তাঁরা অনুভূতি, আবেগ, বিভিন্নতা, বিষমরূপিতা ও ব্যক্তি সাপেক্ষতার ভিত্তিতে সংবেদনশীল মনোভাব গ্রহণ করে মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহী। এইপ্রকার নৈতিক তত্ত্ব কোনো নিয়ম-নীতি নির্ভর নয়। যাপনের অনুষ্ণ ও অন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের দোলাচলকে এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যুক্তিবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে তাঁরা দ্বৈততাবিশিষ্ট যৌক্তিক কাঠামোকে দোষদুষ্ট বলে মনে করে থাকেন, এবং তার বিকল্প হিসাবে ‘প্রসঙ্গোচিত যুক্তিবিজ্ঞান’-এর ধারণা প্রবর্তন করেন। এটিকে আবার পারস্পরিকতার যুক্তিবিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে। এই যুক্তিবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল ধ্রুপদী যুক্তিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত নিষেধ-এর ধারণার আমূল সংস্কার, যেখানে নিষেধ ভিন্নতার প্রতীক, কিন্তু অভাবের দ্যোতনা সেখানে অনুপস্থিত। সদর্থক ও নঞর্থক কোটি এক্ষেত্রে সমরূপী নিটোল দুটি বর্গ নয়; পারস্পরিকতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে তাদের আত্মপরিচয়। ফলত বলা যেতে পারে যে, নারী এক্ষেত্রে পুরুষের থেকে ভিন্ন, কিন্তু অভাবযুক্ত ‘অপর’ নয়। ক্রমোচ্চ স্তরহীন বিভেদের স্বীকৃতি এই চিন্তাধারাকে অনন্যতা প্রদান করে থাকে।

চরমপন্থী নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে দেখা গেল যে, তাঁরা সর্বস্তরে সাপেক্ষতার দাবিটিকে অটুট রাখতে চান। তাঁরা মনে করেন, সাপেক্ষতার ভিত্তিতে গৃহীত তত্ত্ব সর্বদাই সর্বসাধারণের উপযোগী হয়ে থাকে। সম্পর্কের অনুষ্ণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিজ্ঞান প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা অপেক্ষ যুক্তির ভূমিকাকে খর্ব করে, সাপেক্ষ

ধর্মভিত্তিক তত্ত্ব রচনায় আগ্রহী। সম্পর্কিত সত্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি এইরূপ দার্শনিক তত্ত্বের পরিসরে অপরিহার্য।

প্রাণ্ডক্ত আলোচনায় জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিজ্ঞান সমন্বিত বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ কীভাবে সম্পর্কযুক্ত বা অনুষঙ্গবদ্ধ হতে পারে তা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ ও দার্শনিক তত্ত্ব যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত একথা অস্বীকার করার মতো কোনো সঙ্গত কারণ পরিলক্ষিত হয় না। সেক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছে যে কান্ট, হিউম, এবং উদারপন্থী নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিষয়নিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, সার্বিকীকরণ, সমরূপিতা, এবং বিমূর্ত যুক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য। এইরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দার্শনিক তত্ত্বের অনুষঙ্গে আণবিক সত্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি একান্ত কাম্য। কারণ সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায় আণবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ ধর্ম হল প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র অবস্থান, যা তাকে বিশুদ্ধ যুক্তির অধিকারী করে তোলে, এবং তার দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয় বিষয়নিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ, সার্বিক, সমরূপী, বিমূর্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় চরমপন্থী নারীবাদী দার্শনিক তত্ত্বের প্রেক্ষিতে, যেখানে বিশুদ্ধ বিমূর্ত যুক্তির পরিবর্তে স্থান পেয়েছে আবেগ-অনুভূতি, বিষয়নিষ্ঠতার পরিবর্তে বিষয়নিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতার পরিবর্তে প্রেক্ষিত সাপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতার পরিবর্তে ব্যক্তি সাপেক্ষতা, সার্বিকীকরণের পরিবর্তে বিশেষতা এবং সমরূপিতার পরিবর্তে বিষমরূপিতা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বের পরিসরে সম্পর্কিত সত্তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কারণ সম্পর্কিত সত্তা হল সেই সত্তা, যার কোনো বিচ্ছিন্ন অবস্থান নেই; আবেগ-অনুভূতি-সংবেদনশীলতাই এর বিশেষ ধর্ম। সেই কারণে এইপ্রকার সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি তার গৃহীত সিদ্ধান্তটিকে প্রেক্ষিত সাপেক্ষ অবস্থান থেকে মূর্ত ও মানবিক করে তুলতে প্রয়াসী হয়।

এপর্যন্ত ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বগুলি কীভাবে সম্পর্কিত বা অনুসৃত হতে পারে সেই বিষয়ক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশিষ্ট নারীবাদী চিন্তাধারা অনুসারে সত্তার গঠনগত স্বরূপের ভিত্তিতে দার্শনিক তত্ত্বের প্রকৃতি কী হওয়া উচিত, এবং মূলস্রোতের প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সত্তার গঠনগত স্বরূপ সম্পর্কে কী অনুমান করা যায়, সেই সম্পর্কিত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এইস্থলে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ ও দার্শনিক তত্ত্ব যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত একথা অস্বীকার করার কোনো সঙ্গত কারণ না থাকলেও, তা অনিবার্য কোনো সম্পর্ক কিনা সেই বিষয়ক প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। যেহেতু সত্তার স্বরূপ এবং দার্শনিক তত্ত্বের প্রকৃতি পরস্পর অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হওয়ার কোনো জোরালো ভিত্তি দর্শনশাস্ত্রে বিরল, সেহেতু সত্তার গঠনগত স্বরূপের সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের কোনো অনিবার্য সম্পর্ক সিদ্ধ না হলেও, অন্ততপক্ষে সতত সংযোগের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়ে এক ধরনের কার্য-কারণ সম্পর্কের আভাস অবশ্যই পাওয়া যায়। সুতরাং সত্তার গঠনগত স্বরূপ কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে তার ওপর নির্ভর করবে তদুপযুক্ত দার্শনিক তত্ত্বের প্রকৃতি।

ব্যক্তিক-সত্তার প্রেক্ষিতে যদি দার্শনিক তত্ত্বের সম্ভাব্য এবং বাস্তব রূপ নিয়ে আলোচনা করতে হয়, তাহলে সেই আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল প্রথমেই সত্তার বিভিন্ন স্বরূপ নির্ণয় করা বা সেটিকে বুঝবার প্রচেষ্টা করা। যদি আমরা দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব-কাঠামো এবং তত্ত্ব-কাঠামো বিশ্লেষণ করি, তাহলে বুঝতে পারবো যে, সেক্ষেত্রে সত্তার প্রেক্ষিতে গঠিত হওয়া দার্শনিক তত্ত্ব কীরূপ হবে বা হতে পারে এই বিষয়টি দার্শনিকতার পরিসরে সাধারণত একেবারেই গুরুত্ব পায় না, যদিও বা পায় তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে তা থেকে উত্তরণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অথচ দর্শনচর্চার প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, ও ধারা এগুলি লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, একপ্রকার সূত্র-সম্বন্ধ সেক্ষেত্রে স্থাপন করা যেতেই পারে। আমরা যদি ধ্রুপদী পাশ্চাত্য দর্শন অতিরিক্ত অধুনা গড়ে ওঠা নারীবাদী চিন্তাধারার দিকে আলোকপাত করি সেখানে অবশ্য উক্ত ইঙ্গিতটি আরোও স্পষ্ট। সেই ইঙ্গিতটি আশা জাগায় এবং একইসঙ্গে সাহসও যোগায় এটা খুঁজে দেখার যে, সেইরকম সূত্র-সম্বন্ধ দর্শনচর্চার ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে নেই

তো ? নারীবাদীদের কোনো সুপরিকল্পিত তত্ত্ব-কাঠামো বা কোনো সুসংহত তন্ত্র-কাঠামো, অথবা কোনো নির্দিষ্ট ধ্রুপদী ঘরানায় অবস্থান করার অস্মিতা হয়তো নেই। তবুও ব্যক্তিক-সত্তার গঠনগত স্বরূপ ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট কীভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে - নারীবাদীদের খুঁজে বের করা সেই সূত্রটি বর্তমান অনুসন্ধান কার্যের অন্যতম অনুপ্রেরণা।

গ্রন্থপঞ্জী

Beauvoir, Simon de, *The Ethics of Ambiguity*, trans. by Bernard Frechtman, Citadel Press, New York, 1976.

Beauvoir, Simon de, *The Second Sex*, Trans. and ed. by H. M. Parshley, Picador, London, 1988.

Beck, Lewis White, *A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason*, Chicago University Press, Chicago, 1966.

Bhasin, Kamala, *Understanding Gender*, Women Unlimited, New Delhi, 2000.

Bhasin, Kamala, *What is Patriarchy*, Women Unlimited, New Delhi, 1993.

Chatterjee Sinha, Atashee, *The Many Faces of Reason and Violence*, Papyrus, Kolkata, 2005.

Chanter, Tina, *Gender: Key Concepts in Philosophy*, Bloomsbury (First Published in India), 2016.

Collins, Patricia Hill, "It's All In the Family: Intersections of Gender, Race, and Nation", in *Hypatia*, Vol. 13, No. 3, pp. 62-82, 1998.

Copi, Irving M., and Cohen, Carl, *Introduction to Logic*, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, India, 2004.

Crenshaw, K., "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics", *The University of Chicago Legal Forum*, Vol. 140, pp. 139–167, 1989.

Elliott, Anthony, *Concept of the Self*, Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2001.

Fairfield, Paul, *Moral Selfhood in the Liberal Tradition: The Politics of Individuality*, University of Toronto Press, Canada, 2000.

Ferguson, Ann, "A Feminist Aspect Theory of the Self", in *Canadian Journal of Philosophy*, eds. by Ann Garry and Marilyn Pearsall, Vol. 17, No. 1:13, pp. 339-356, 1987.

Ferguson, Ann, "Twenty Years of Feminist Philosophy", in *Hypatia*, Vol. 9, No. 3, pp. 197-215, 1994.

Feyerabend, Paul, *Farewell to Reason*, Verso, London, 1987.

Foust, Mathew A., "Sex and Selfhood: What Feminist Philosophy can learn from Recent Ethnography in Ho Chi Minh City", in *Journal of International Women's Studies*, Vol. 14, No. 3, pp. 31-41, 2013.

Freud, Sigmund, *Three Essay on The Theory of Sexuality*, trans. by A. A. Brill, 1920, globalgreybooks.com, 2020.

Fricker, Miranda, and Hornsby, Jennifer, eds. *The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

Friedman, Marilyn, "Impartiality" in *A Companion to Feminist Philosophy*, eds. by Alison M. Jagger and Iris Marion Young, Blackwell Publishers Ltd., Massachusetts, London, pp. 393-401, 1998.

Gatens, Moira, *Imaginary Bodies*, Routledge, New York, 1996.

Garry, Ann, "Intersectionality, Metaphors, and the Multiplicity of Gender", in *Hypatia*, Vol. 26, No. 4, pp. 826-850, 2011.

Geetha, V., *Gender*, Stree, Kolkata, 2002.

Gilligan, Carol, "Hearing the Difference: Theorizing Connection", in *Hypatia*, Vol. 10, No. 2, pp. 120-127, 1995.

Gilligan, Carol, *In a Different Voice*, Harvard University Press, Cambridge, 1993.

Gilligan, Carol and et. al., eds. *Mapping the Moral Domain*, Harvard University Press, Cambridge, 1988.

Grosz, Elizabeth, *Volatile Bodies: Towards a Corporeal Feminism*, Indiana University Press, Bloomington, 1994.

Haraway, Donna, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Partial Perspective", in *Feminism and Science*, eds. by Evelyn Fox Keller and Helen E. Longino, Oxford University Press, Oxford, 1996.

Harding, Sandra, ““Strong Objectivity”: A Response to the New Objectivity Question”, in *Synthese*, Vol. 104, No. 3, pp. 331-349, 1995.

Harding, Sandra, *The Science Questions in Feminism*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1986.

Harding, Sandra, “Rethinking Standpoint Epistemology: What is “Strong Objectivity” ?”, in *Feminist Epistemologies*, eds. by L. Alcoff and E. Potter, Routledge, London, pp. 49-82, 1993.

Haslanger, Sally, “On Being Objective and Being Objectified” in *A Mind of One’s Own: Feminist Essays on Reason and Objectivity*, eds. by Louise M. Antony and Charlotte E. Witt, Routledge, New York, pp. 209-253, 2018.

Heinamaa, Sara, “Women-Nature, Product, Style? Rethinking the Foundations of Feminist Philosophy of Science”, in *Feminism, Science and the Philosophy of Science*, eds. by Lynn Hankinson Nelson and Jack Nelson, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 289-308, 1997.

Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, ed. by L. A. Selby-Bigge, Clarendon Press, Oxford, 1888.

Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, eds. by T. H. Green and T. H. Grose, Longmans Green and Co., London, 1878.

Hume, David, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, ed. by Tom L. Beauchamp, Oxford University Press, Oxford, 1999.

Hume, David, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, Intro. by J. N. Mohanty, Progressive Publishers, Calcutta, 1999.

Hume, David, *An Enquiry Concerning the Principles of Morals*, ed. by J. B. Schneewind, Hackett Publishing Company, Cambridge, 1983.

Jacobs, Jonathan A., *Ethics A-Z*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2005.

Jaggar, Alison M., and Young, Iris Marion, eds. *A Companion to Feminist Philosophy*, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2000.

Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, trans. by Norman Kemp Smith, Macmillan, London, 1953.

Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, trans. and eds. by Paul Guyer and Allen W. Wood, Cambridge University press, Cambridge, 1998.

Kant, Immanuel, *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, trans. by H. J. Paton, as *The Moral Law*, Hutchinson and co. Ltd., London, 1976.

Kant, Immanuel, *Logic*, trans. by Robert S. Hartman and Wolfgang Schwarz, Dover Publications, New York, 2017.

Kiss, Elizabeth, "Justice", in *A Companion to Feminist Philosophy*, eds. by Alison M. Jaggar and Iris Marion Young, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, pp. 487-499, 2000.

Koehn, Daryl, *Rethinking Feminist Ethics: Care, Trust and Empathy*, Routledge, London, 1998.

Kornar, Stephen, *Kant*, Penguin, London, 1953.

Langton, Rae H., "Beyond a Pragmatic Critique of Pure Reason", *Australasian Journal of Philosophy*, Vol. 71, No. 4, pp. 364-384, 1993.

Langton, Rae H., *Sexual Solipsism: Philosophical Essays on Pornography and Objectification*, Oxford University Press, Oxford, 1995.

Lloyd, Elizabeth A., "Objectivity and Double Standard for Feminist Epistemologies", in *Synthese*, Vol. 104, No. 3, pp. 351-381, 1995.

Lloyd, Genevieve, *The Man of Reason: "Male" and "Female" in Western Philosophy*, Routledge, London, 1993.

Lloyd, Genevieve, "The Man of Reason", *Metaphilosophy*, Vol. 10, No. 1, pp.18-37,1979.

Longino, Helen E., *Science as Social knowledge: Values and Objectivity In Scientific Enquiry*, Princeton University Press, Princeton, 1990.

Lozano, Betty Ruth, and Grijalva, Daniela Paredes, "Feminism Cannot be Single Because Women are Diverse: Contributions to a Decolonial Black Feminism Stemming from the Experience of Black Women of the Colombian Pacific", in *Hypatia*, Vol. 37, No. 3, pp. 523-543, 2022.

- Mackenzie, C., & Stoljar, N., eds. *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self*, Oxford University Press, New York, 2000.
- MacKinnon, Catherine A., *Feminism Unmodified*, Harvard University Press, London, 1987.
- McCarthy, Erin, *Ethics Embodied: Rethinking Selfhood Through Continental, Japanese and Feminist Philosophies*, Lexington Books, Maryland, 2010.
- Mckeon, Richard, ed. *Aristotle*, Modern Library, New York, 2001.
- McLaren, Margaret A., *Feminism, Foucault and Embodied Subjectivity*, State University Press, Albany, New York, 2002.
- Meyers, Diana T., “Who's There ? Selfhood, Self - Regard and Social Relations”, in *Hypatia*, Vol. 20, No. 4, pp. 200-215, 2005.
- Mill, John Stuart, *The Subjection of Women*, J. M. Dent & Sons Ltd., London, 1997.
- Moitra, Shefali, *Feminist Thought: Androcentrism , Communication, and Objectivity*, Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 2002.
- Musschinga, Albert W. and et. al. eds., *Personal and Moral Identity*, Kluwer Academic Publishers, (eBook)-Springer Science+Business Media Dordrecht, 2002.
- Nicholson, Linda, *Gender and History*, Columbia University Press, Columbia, 1986.
- Noddings, Nel, *Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education*, University of California Press, Berkeley, 1984.
- Nussbaum, Martha, “Objectification”, in *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 24, No. 4, pp. 249-291, 1995.
- Nye, Andrea, *Feminism and Modern Philosophy*, Routledge, New York, 2004.

Nye, Andrea, *Words of Power – A Feminist Reading of the History of Logic*, Routledge, New York, 1990.

Plumwood, Val, *Environmental Culture, The Ecological Crisis of Reason*, Routledge, London and New York, 2002.

Plumwood, Val, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London, 1993.

Plumwood, Val, “The Politics of Reason: Towards a Feminist Logic” in *Australasian Journal of Philosophy*, Vol. 71, No. 4, pp. 436-459, 1993.

Puri, Bindu, and Sievers, Heiko, eds. *Reason, Morality, and Beauty: Essays on the Philosophy of Immanuel Kant*, Oxford University Press, New Delhi, 2007.

Quine, W. V. O., “Two Dogmas of Empiricism”, in *The Philosophical Review*, Vol. 60, pp. 20-43, 1951.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.

Sen, Amartya, “Gender Inequality and Theories of Justice”, in *Women Culture and Development*, eds. by Martha Nussbaum and Jonathan Glover, Clarendon press , Oxford , pp. 259-273, 1995.

Sen, Pranab Kumar, *Reference and Truth*, ICPR in association with Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1991.

Skorupski, John, ed. *The Cambridge Companion to Mill*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Sterba, James P., ed. *Ethics: Classical Western Texts in Feminist and Multicultural Perspectives*, Oxford University Press, New York , 2000.

Stevenson, Leslie, and Haberman, David L., *Ten Theories of Human Nature*, Oxford University Press, New York, 2004.

Steyl, Steven, “The Virtue of Care”, in *Hypatia*, Vol. 34, No. 3, pp. 507-526, 2019.

Stone, Alison, *An Introduction to Feminist Philosophy*, Polity Press, Cambridge, 2007.

Sullivan, Roger J., *Immanuel Kant's Moral Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Tarver, Erin C., “New Forms of Subjectivity: Theorizing The Relational Self with Foucault and Alcoff”, in *Hypatia*, Vol. 26, No. 4, pp. 804-825, 2011.

Tong, Rosemarie, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, West View Press, Colorado, 2009.

Toole, Briana, “From Standpoint Epistemology to Epistemic Oppression”, in *Hypatia*, Vol. 34, No. 4, pp. 598-618, 2019.

Wollstonecraft, Mary, *Vindication of the Rights of Women*, ed. by M. Brody, Penguin, London, 1988.

চ্যাটার্জি সিনহা, অতসী, ও নস্কর, মনোজ, (সম্পা.) “নারীবাদের দর্শন”, বিশেষ সংখ্যা, *আলোচনা চক্র*, সম্পাদক: চিরঞ্জীব শূর, সংকলন: ৪৬, সংখ্যা: ১, পৃ. ৭-১৬৮, ২০১৯।

দাস, রাসবিহারী, *কান্টের দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৬।

বাগচী, নন্দিতা, ও চ্যাটার্জি সিনহা, অতসী, (সম্পা.) *দার্শনিক তত্ত্বায়নে নারীবাদ: ভিন্ন মননে বিচিত্র আলাপ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৭।

মৈত্র, পুষ্পা, ও মিত্র, মাধবেন্দ্রনাথ, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড: মনোসমীক্ষণের রূপরেখা*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭।

মৈত্র, শেফালী, *উজানী মেয়ে*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৩।

মৈত্র, শেফালী, *নৈতিকতা ও নারীবাদ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭।

সরকার, প্রয়াস, *জ্ঞান, সংশয়বাদ ও যুক্তিসিদ্ধি প্রসঙ্গে*, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৯।